সূচি



সূচি

দাগবসন্তী খেলা



সকাল সকালই বাড়ির থেকে বেরিয়ে পড়েছিল পৃথা। খুব দূরের পথ যদিও নয়, কাছেরও তো নয়। বালিগঞ্জ থেকে ট্রেন ধরলে চল্লিশ মিনিট। অবশ্য রেলকোম্পানির লিখিত সূচি যেমন। আদতে লাগে আরও বেশি। আজও লাগল। ঠিক আগের আগের স্টেশনটাতে শুধু শুধুই দশ মিনিটটাক থমকে রইল গাড়ি। কি, না ট্রেনে ট্রেনে কাটাকুটি হবে, ছেলেবেলার দাগবসন্তী খেলার মতন। ওপার থেকে আপ আসছে কুউউ দম বেঁধে বুকে। ডাউন রইল চোখ বুজে পড়ে। আপ এসে হাঁপ জিরোল খানিক। ফের ছুটল শ্বাস টেনে। শেষ দাগ সে পেরিয়ে গেলে তবে ডাউনের নড়ার পালা। এরকমই নিয়ম খেলাটারও। দৌড়তে দৌড়তে আপ হয়ে যাবে ডাউন। তখন ডাউন নতুন করে আপ হয়ে ছুটে আসে দান দিতে। আপ-ডাউনের এই খেলার মাঝেই কখন যে ঘড়ির কাঁটা দশের ঘর পার।

প্ল্যাটফর্মে পা রেখে পৃথা এদিক ওদিক তাকাল। ট্রেনটা তাকে ফেলে চলে যেতেই বুক জুড়ে আচমকা ভুবভুব ভয়। মাঘ সকালেও হাতের তেলো ঘামে বিজবিজ। সদ্য নামা ঝুড়ি, বস্তা আর কেজো হেটো মেয়েপুরুষ যে যার মতো ব্যস্ত সবাই। চোখ যদিও উলুক-ঝুলুক দামি মোড়কের পৃথার দিকে। ভাবটা এমন তুমি আবার কোনো পৃথিবী থেকে এলে হে সুন্দরি? ডানামেলা শিরীষ গাছের ছায়ায় তাড়ির হাঁড়ির পাহারাদার এক কানাবুড়ো। চোখ দ্যাখো তার, এদিকেই স্থির। পৃথা ঘুরে দাঁড়াল। যেদিকে তাকাও শুধু অচেনা মানুষ, অদেখা আকাশ আর অনাত্মীয় গাছগাছালি। ধোপ-দুরস্ত জনা

চার পাঁচও নেমেছিল বটে। ফোলিও হাতে প্যান্ট শার্ট, ঝোলা কাঁধে পাজামা পাঞ্জাবি। একে একে তারাও কখন স্টেশন-শেষের ঢালের আড়াল। কাঁচা পাকা স্টেশন ঘিরে মরচে লোহার ভাঙা বেড়া। বেড়া ছুঁয়ে এখান সেখান শিরীষ, শিমুল, কৃষ্ণচূড়া। তাদেরই এক গুড়ি ঘেঁসে আধবয়সি দুই মহিলা ঝগড়া করে চলেছে প্রাণভরে। বাপরে বাপ, কী তীক্ষ্ণ গলার আওয়াজ। পৃথা মিছিমিছিই সেদিকে এগোল। কার কাছে যে হদিস পাওয়া যায়? কানা বুড়োটাকেই ধরবে নাকি? একা একা ঠিকানা খোঁজা কি সহজ কাজ? তার ওপর সে ঠিকানা যদি হয় চেনা দেখা জগতটার বাইরে, এরকম এক ছবি-ছবি পৃথিবীর মেঠো রাস্তায়? যে রাস্তা গেছে তেপান্তরের মাঠের ভেতর দিয়ে! যে মাঠে শুধুই মাটির আঁচল কামড়ে ধরে হি হি হাসে শিশু ফসলের দল, বাতাস খোলাখুলি চুমু খায় গাছের শরীরে, হঠাৎ কোনো একলা পাখি হারিয়ে যায় প্রকাণ্ড আকাশটায়! ভাবতে ভাবতে আরও একটু এগোল পৃথা। এগোতে এগোতে ফিরে তাকাল শূন্য রেললাইনটার দিকে। যেন বালিগঞ্জের ট্রেন নয়, তার শেষ পরিজনটি একটু আগে ছেড়ে চলে গেছে তাকে। মেয়েটাকেই না হয় জোর করে সঙ্গে আনলে হত। কেউ একজন সঙ্গে থাকলেও অনেকখানি ভরসা পাওয়া যায়।

—কোথায় যাওয়া হবে গো দিদিমণি?

পৃথা ফিরে তাকাল। ময়লা ছেঁড়া মিলের শাড়ি যেমন তেমন, গায়ে মুখে শীতের খড়ি, কালোকুলো বাচ্চা কোলে বউটি খানিক দূরে তফাত রেখে দাঁড়িয়েছে। বোধহয় এক গাড়িতেই ছিল। এক কামরায় ছিল কি? পৃথা ভাবার চেষ্টা করল। গরিব গুরবো মানুষগুলোকে তার সব কেমন একরকম লাগে। রুখুশুখু চুল, ছেঁড়াফাটা চামড়া আর চোয়ালভাঙা মুখের খাঁজে খাঁজে খিদে। আলাদাভাবে ওদের কারুরই কোনো পরিচয় নেই। বিশেষ কোনো শ্রেণি বা গোষ্ঠীর জীবমাত্র যেন।

গায়ে পড়া বউটি কাছে এগোল, কখুন থিকে দেঁড়িয়ে আছ, তাই ভাবলম জিগিস করি। বিডু আপিস যেতি হলে কিন্তুন উদিকে যাও। সেই নাইনের ওপার....

যাক, একজনকে তবে পাওয়া গেছে। পৃথার শ্বাসপ্রশ্বাস সহজ হল। জংলা ছাপ পিওর সিল্কের আঁচল আলতোভাবে জড়িয়ে নিল কোমরে, নকশাপেড়ে উলের শাল ছড়িয়ে দিল বুকের ওপর, ঢাউস ভ্যানিটি ব্যাগখানা এহাত ওহাত, মনসাপুকুর গ্রামটা কোথায় বলতে পারো? সেই সাতবিবি না কি যেন ছাড়িয়ে যেতে হয়?

—ওমা, সে তো আমাদেরই গেরাম গো। সিখেনে কাদের ঘরে যাবেন তুমি?

পৃথা চোখ বুজল। নামটা ছাই আবার ভুলে গেছে। কী করে থাকবে মনে? কিছু কিছু মানুষ যে আছে যাদের কোন নাম থাকতে নেই। থাকলেও জানে না কেউ। যেমন আলতাবউ, বামুনদিদি কিংবা ঠাকুরমশাই। আদ্দিকালের পোস্টকার্ডে সেদিন নামটাকে দেখে বাড়িসুদ্ধ সবার তাই সে কী হাসি, ও বাবা, আলতাবউ-এর এমন একটা দাঁতকাঁপানো নাম ছিল নাকি! বজ্রবালা দাসী!

কথা বলতে বলতে এগিয়েছে ওরা। প্ল্যাটফর্মের ধুলো নাচিয়ে দোল দোল দুলছে হিমেল বাতাস। দোলনা দুলে একবার এদিকে আসে তো আবার ঘুরে সেই স্টেশনের ওপার, একেবারে ঝাঁকড়াচুলো গাছগুলোর মাথায়। তাদের ঝুঁটি ধরে নামিয়ে আনে রাশ রাশ শুকনো পাতার ঝাঁক।

—তা হ্যাঁ গো দিদি, তোমার মতন মানুষ হঠাৎ পানগোপালের ঘরে কেন গো?

—কে প্রাণগোপাল?

—তাও জানোনি? সেই যে তোমার বজোবুড়ির ছেলে।

জড়াতে জড়াতে বউটির চোখে ক্রমশ চাক বেঁধেছে কৌতূহল। এমন আজব ঘটনা বুঝি জন্মে একবারই ঘটে। কলকাতার বড়বাড়ির, বড়লোকের বউ সে কি না এসেছে একা একা গ্রামেগঞ্জে? তাও এক গরিব বুড়ির খোঁজে?

—তা হ্যাঁগো, বজোবুড়ি শুনিচি এককালে কলকেতাতে খুব যেত। অনেক ঘর যজমান ছিল সিখেনে। তা তখুন থিকে চেনা বুঝি?

—ঠিক ধরেছ। পৃথার ঠোঁটে আলগা হাসি, আলতাবউ আমাদের অনেকদিনের চেনা। সেই যখন ছোট আমি, এত্তটুকুন, তখন প্রায়ই যেত। কী সুন্দর যে গান গাইতে পারত। নখ কাটতে কাটতে গান, ঝামা ঘসতে ঘসতে গান, গুনগুন গান শুধু। এখন কেমন আছে গো সে?

—ভালো নেই গো দিদিমণি, মোটে ভালো নেই। একে বয়সের জোর কামড়, তার ওপর হাত গেছে, পা গেছে, কোমর গেছে। চোখেও তেমন দেখতি পায় না কো। যে ঠাঁয়ে খাওয়া, সিখেনেই গু মুত, সিখেনেই ঘুম।

—বলো কি? কেউ নেই তাকে দেখার?

—থাকবে নি কেন? সবই আছে। ছেলে, বউ, লাতি, লাতিন। তবে কেউ তেমন ফিরে চায় না। কারুর যদি মন হল তো দিনমানে একবার সাপসুরত করে দিল বুড়িকে। নইলে যেমন ছিল রইল পড়ে। বউ তো সাঁঝ সকাল গাল পাড়তেচে। শুধু শাউড়ির মরণকামনা। দশবার চাইলি তবে তেষ্টার জলটুকুন দেয়। তা শকুনির শাপে কি আর গোরু মরে গো দিদিমণি? সে যত গাল পাড়ে, পরমায়ু তত বাড়ে বজোবুড়ির।

—ছেলেটা কী করে? তোমাদের প্রাণগোপাল?

—সে আর কী বলবে? একে ঘরে অমন গনগনে বউ, তায় সোমসারে নিত্যি অভাব, নিত্যি যাতনা। পাঁচ পাঁচটা পেট হাঁ হাঁ জ্বলতেছে সব্বোসময়। মা মরলে তাও যদি কিছু সুরেহা হয়....। তার উপরি নেশা ভাং-এর বিরাম বিছরাম নেই তার। আতদিন তাড়ি মদ গিলে...

পৃথা ফোঁস করে শ্বাস ফেলল। বউটির ঠোঁটে দুঃখ কাঁপছে— জগতের এমনই রীত গো দিদি। যে কঁ্যাথায় একদিন জাড় কাটাতে, তাই যখন পুরোনো হল, ছুঁড়ে ফেল তাকে।

ঠিক কথা, ঠিক কথা। এই হল সাতকথার এক কথা। ছেঁড়া বাসির আদর নেই কোথাও, কোনোখানেই। তা সে গরিবের ঘরই বলো আর বড়লোকের। চুপচাপ হাঁটতে থাকে পৃথা। অনেকখানি চলে এসেছে তারা। স্টেশন থেকে নেমে বেশ খানিক হাঁটাপথ, খোয়া বাঁধানো। শেষে ডানদিকে মোড় নিলে ডিগডিগে মজা খাল একখানা। খালের মাথায় বাঁশের সাঁকো। সাঁকো বলতে গোটা তিনেক কাঁচা বাঁশ গায়ে গায়ে ফেলা। তার ওধারে, শরীরে শরীর জড়ামড়ি আদ্যিকালের দুই সন্ন্যাসী বটগাছ। জটার ভার যেখানে এলোমেলো, ঠিক তার নিচে নিঝুম দাঁড়িয়ে গোটা তিনেক ভ্যান-রিকশা।

—এখানে সাইকেল রিকশা পাওয়া যায় না?

—না গো দিদি, দরকারে নোক ভ্যানেই চাপে। তা হেঁটেই চলো না কেন? এমনকি আর পথ? সামনে হল মাকালতলা, তা বাদে কারখানার চক, তা পেরোলে সাতবিবি। তারপর মনসাপুকুর আর কতটুকুন?

—নারে বাবা, পাগল নাকি? পৃথা মাথা ঝাঁকাল, আমার মোটে হাঁটার অভ্যেস নেই। তাছাড়া ফিরতেও হবে তাড়াতাড়ি...

ভ্যান-রিকশায় পা ঝোলাতেই মনটা হঠাৎ খুশি খুশি। শেষ পর্যন্ত ঠিকানাটা খুঁজে পাওয়া গেল তাহলে। না হয় হল আলতাবউ আজ অথর্ব, তবু তাকে খুঁজে পাওয়াটাই যে ছিল আসল কাজ। একা একা জেদ দেখিয়ে আসবে বলে কম ঠাট্টা ছুঁড়েছিল সবাই! পৃথা যেন কোনো অসাধ্য কাজে হাত দিয়েছে।

রূপক তো শুনে হেসেই অস্থির, তুমি নাকি যাবে সুদূর গাঁয়ে? তাও আবার একাই? অ্যাবসার্ড।

—কেন? এমন কিছু হিল্লি-দিল্লি তো আর যাচ্ছি না। শহরতলি পেরিয়ে গেলে কতটুকুই বা পথ?

—তা অবশ্য দূর নয়। তবে তোমার যা নার্ভের জোর, একা এখনও শ্যামবাজারেই যেতে পারো না। ঘাবড়ে টাবড়ে একশা হও। সেই তুমি যাবে কোথায় ধেধধেড়ে মনসাপুকুর!

—কী আর করি বলো, তুমি যখন যাবেই না আমার সঙ্গে দোকা হতে।

—উপায় নেই। অফিসে এখন বেজায় চাপ। ফাইনাল অডিট, ব্যালান্সশিট ....একদিনও কামাই করার জো নেই।

পৃথা কথা বাড়ায়নি। জো বড় কথা নয়, ইচ্ছেও নেই কারুর। ভাইয়ার না, দাদাবউদির না, তার আরামপ্রিয় স্বামীটির তো নয়ই। এমনকী মুনিয়া যে মুনিয়া, তারও নয়। একটা সাতকালে ঠেকা ঝরঝরে বুড়ির অবুঝ খেয়ালে ঠেকনা দিতে কোন্ বোকা আর মাথা বাড়ায়? একমাত্র কাদা কাদা মনের পৃথা ছাড়া? একটুতে যার মন তলতল, বুকভরা গরম বাতাস, আর চোখ ছাপিয়ে লেবুর জল!

বউদি তো শুনে মুখ বেঁকিয়ে সারা, বলিহারি শখ যা হোক তোমার মায়ের। মানলাম ছেলের বিয়েতে নানারকম শখ আহ্লাদ করতে ইচ্ছে হয়, তা বলে...

দাদা হেসেছিল ঠোঁট চেপে, ভীমরতি, ভীমরতি, এ সব হল ভীমরতির লক্ষণ। কত বয়স হল রে মার? পঁচাত্তর পেরিয়েছে?

ভাইয়া তো আদৌ পাত্তাই দেয়নি, দূর, যত সব আবোল তাবোল ডিস্‌কাশন। কে কবে মরে হেজে পচে গেছে কবে...মাঝে মাঝে এমন সব উদ্ভট বায়না ধরে মা...

—বায়না ধরে তো রাখলেই পারিস। পৃথা না বলে পারেনি, এতদিন ধরে যে তোদের বায়নাই শুধু রেখে এসেছে তার একটা মাত্র ইচ্ছেটাকে এভাবে উড়িয়ে দিবি? মনে রাখিস তোর বিয়েটাই মার জীবনের শেষ কাজ। হয়তো....

—জ্ঞান দিস না তো দিদি। যা খুশি শখ হলেই হল? কোথায় পাবি তুই এখন সেই বামুনদিদিকে? কিংবা পইতেবুড়িকে? তারা তো কবেই পটোল তুলে...

—আরও আছে রে আরও আছে। দ্যাখ গিয়ে হয়ত আলতাবউই বেঁচে আছে এখনও। নয়তো ধূপওলি মাসি। মনে নেই তাকে? মাস পোহালেই ধূপের গোছা হাতে থেবড়ে বসত মেঝেতে....। বলতে বলতে পৃথার চোখে ঝিকঝিক হাসি, তারপর কী ঘোঁট, কী ঘোঁট। এর হাঁড়ি, ওর হাঁড়ি, তার হাঁড়ি....

—আর সেই বাসনওলিটা? ঠিক কেমন পটিয়ে-পাটিয়ে বাসন গছিয়ে যেত মাকে!

—আর ব্ল্যাকজাপান মেছুনিটা? কতবার যে পচা মাছ নিয়ে ঠকেছে মা। মনে আছে বাবা কত বকাবকি করত মাকে? রাগ করত...

—মা কিন্তু বদলায়নি তাতেও।

—চিরকালই একরকম। ভালোমানুষ, ফুল অফ সেন্টিমেন্টস।

—তবে?

—তবে কী?

—মার এই শেষ সেন্টিমেন্টটা বুঝব না আমরা? এমনকী আর ধনদৌলত চেয়েছে বল? সাধ হয়েছে ছোট ছেলের বিয়েতে এক সময়ের সব মানুষগুলোকে...

—তুই-ই তবে মেটা সে সাধ। আমাদের অত সময় নেই পাগলামিতে তাল দেওয়ার।

—বেশ তাই দেব। আমিই না হয় যাব আলতাবউ-এর খোঁজে....

—তাহলে আগে ভূশণ্ডির মাঠে গিয়ে খোঁজ করে দ্যাখ। একসঙ্গে সকলের ঠিকানাই পেয়ে যাবি সেখানে।

ভূশণ্ডির মাঠ নয়, ঠিকানা পাওয়া গেল মার কাছেই। মায়ের বিয়েতে পাওয়া মেহগনি আলমারি, তার ভেতরে চোরা খোপ, সেখান থেকে বেরিয়ে এল কাশ্মীরি কাজের গয়নার বাক্স। ডালা খুলতেই, ও মা গয়না কোথায়, এ তো দেখি শুধু কাগজ আর কাগজ! মখমলের কাসকেটটা বোঝাই কেবল পুরোনো চিঠি আর বিবর্ণ কাগজে।

মায়ের তখন ফোকলা গালে বালিকা হাসি,

—গয়না আর থাকবে কোত্থেকে? তোর বিয়েতে দিয়েছিলাম দশভরি, বউমাকে পাঁচ, তোর মেয়েকে দুই, মানিকের ছেলে দুই, কত রইল আর?

—সে তো তুমিই বলবে।

—হ্যাঁ রে হ্যাঁ, ছিল মোটে মটরমালা আর মকরমুখো বালা একজোড়া আর কটা আংটি। রেখেছিলাম ছোটর জন্য। তা ডিজাইন সব সেকেলে বলে এই তো সেদিন বউমা সেসব দিয়ে এল নতুন করে গড়াতে।

পৃথা তখন কথা বলবে কি, গলা ভেঙে কি যে টনটন ব্যথা তখন। চোখ ছাপিয়ে টিলটিল জল। চিরকাল মায়েরা বুঝি এভাবেই ভাগ করে দেয় নিজেদের। তারপর নিজের থাকে কি? থাকে গো থাকে। ওই তো গয়নার বাক্স আবার টইটম্বুর কেমন। কত লোকের যে ঠিকানা সেখানে—হারিয়ে যাওয়া, ফুরিয়ে যাওয়া, মিলিয়ে যাওয়া—বাবার চিঠিই দ্যাখো না কতগুলো। গোছায় গোছায় যত্নে বাঁধা। বিয়ের পর পর, সেই যখন মা বাপের বাড়ি, তখন লেখা। কিছু আরও পরে, কখনও সখনও। জমতে জমতে, জমতে জমতে, সুতো কাগজ সবই এখন হলুদ বরন। দূর পাগল, হলুদ কোথায়? হলুদ রঙ কোন্ ফাঁকে যে টুকরো টুকরো সোনা হয়ে গেছে—সাতনরি, সীতাহার, ব্রেসলেট, মানতাসা।

আলতাবউ-এর ঠিকানাও বেরোলো সেই অলঙ্কারের স্তূপ থেকে। পঁচিশ বছর আগে লেখা পাঁচ পয়সার পোস্টকার্ড একখানা। না হয় তাতে

বানান ভুল হাজার, হাতের লেখা কাকের ঠ্যাং, সবই এখন আবছা নীল মিনে করা কাজের মতো।

মা বলল, একবার দ্যাখ না গিয়ে পাস কি না তাকে। পইতেবুড়ি মারা গেছে কবেই। বামুনদি তো চলে গেল তোর বাবার যাওয়ার বছরেই। থাকলে আলতাবউই আছে...এই না বলে চোখ মুছল কিছুক্ষণ, খোঁজ পেলে বলিস একবার যেন আসে। এ বংশের সব কাজেই তো আসত একসময়—বিয়ে, শ্রাদ্ধ আঁতুড়তোলা। তারপর কত যুগ যে কোনো খোঁজ নেই আর। সেই যে কী এক রোগে ধরল তাকে, তারপর থেকেই...

রোগের পর থেকেই কি তবে আলতাবউ...! পৃথা নড়ে চড়ে বসল। ফাঁকা মাঠের সিঁথি ছিঁড়ে ছুটে চলেছে ভ্যান-রিকশা। মাকালতলা পেরিয়ে গেল। কারখানার চক পেরোব পেরোব। এবড়োখেবড়ো এঁটেল পথে মাঝে মধ্যেই ঝিকিড় মিকিড় ঝাঁকুনি। শুকনো মাটি এই উঁচু তো নিচু একহাত। শরীরটা হেলে পড়তেই পৃথা পাটাতন খামচে ধরল। অনভ্যস্ত পথে শরীর মন দুইই এখন সামাল দিতে ব্যস্ত। শরীর স্থির তো মন চঞ্চল। মন উদাস তো বেসামাল হাত, পা, কোমর। উদাসী চোখ আকাশ ছুঁল বারকয়েক। আকাশ যেন আকাশ নয়, মাথার ওপর মেলে ধরা ইয়া বড় ঝকঝকে নীল দৈত্যছাতা। তার নিচে আলগা পৃথিবীটা দুপুরবেলা একলা শোয়া খোলামেলা যুবতীর মতো শরীরের আড় ভাঙছে। পৃথা নতুন পৃথিবীর শরীরে চোখ বোলাল বারবার। মাঘবেলার সূর্যিরাজা যদিও বেশ নরম সরম, হাওয়া কিন্তু তলোয়ার, ঝকঝকে ধারালো। শালটাকে ভালোমতন সাপটে নিল গায়ে। মনসাপুকুরের রোগা বউ দিব্যি কেমন নির্বিকার। আঁচলখানা যেটুকুনি শীতের আড়াল। তার ভেতরে গুটিসুটি দুধের শিশু চুকুর চুকুর দুধ টানছে মাঝে মাঝে। সঙ্গে তার মায়ের মুখও চলছে অবিরাম। এতাল বেতাল কত কথা, বকবক বকবক। জানারও তার আছে কত কিছু, হাজার প্রশ্ন, লক্ষ কৌতূহল।

—হায় মা, তোমার মোটে একটা ছাওয়াল? তাও কি না মেয়ে? ছেলে হবেনি? নাকি অ্যাপ্রশন করেচ? তোমাদের কলকেতাতে তো শুনি দুটো হলেই সব... এই তো আমার ভাসুরপো বউ, যাদবপুরের দিকি থাকে, যেই না তিনটে নামল পেট থেকে, ওমনি ছুট, ওমনি ছুট। কী, না এবার কাটাতি হবে।

বিরক্তি নয় পৃথার মুখে মজার হাসি, তো তোমার মোট কটা গো?

—কোলেরটারে ধরলি পরে হয় মোট পাঁচ। তিন ছানা, দুই ছানি।

—আরও হবে?

—সে কথা কি কেউ বলতে পারে দিদি? সবই ভগমানের হাত। তবে গেরামেও এখুন হাওয়া ঢুকেছে গো। এই তো সেদিন কুমোর ঘরের নতুন বউটা... কী সাহস, কী সাহস,... কাউকে কিছু জানতি দিলে না পর্যন্ত....করলে কি না ভাতাররে সঙ্গে নে....মরে যাই কি লজ্জা....কথার ভেতর ঢুকতে ঢুকতে মনসাপুকুরের বউ কখন ধুপগুলি মাসি হয়ে গেছে। ভরা দুপুরে পা ছড়িয়ে বসেছে মেঝেতে, এক গালে টোপলা পান, আরেক গালে রাজ্যের কেচ্ছা কথা।

পৃথা হাসছে ঝিলিক ঝিলিক, স্বামী তোমার কী করে গো? জমি-জিরেত আছে কিছু?

—নাগো দিদি, তাইলে কি আর ভাবনা ছিল? ঘরে আমরা গুড় বানাই গো। নলেন গুড়, পাটালি গুড়। কারবার বলো কারবার, ওজগার তো ওজগার, তিন পুরুষের এই কাজ। ধরো জাড়ের মুখে ধারকর্জ করে বায়না নিলাম কিছু খেজুর গাছ। যখন যেমন খ্যামতা। তারপর অস নামাও, জাল দাও, পাক মারো...

বারে বা, বারে বা, পৃথার চোখে সত্যিকারের মুগ্ধতা, ছেলেপুলে, ঘরদোর সামলেও তুমি এত কিছু করো?

—তা করি গো দিদি। ভাতার আমার অস পেড়ি আনে, আমি জাল দিই। ছাওয়ালগুলোও খাটে সঙ্গে। এই তো এলাম চাম্পাহাটি থিকে, মহাজনের ঘরে পাটালি দিয়ে।

কথায় কথায় কথা বাড়ে, পথ ফুরোলে কথা ফুরোয়। তারপরই জল টলটল এত্ত বড় দিঘি একখানা। তারই নামে গ্রামের নাম মনসাপুকুর। পুকুরধারে শানঘাট। ঘাট বরাবর দাঁড়িয়ে যায় ভ্যান-রিকশা। নামার আগেই বউটির নামকরণ করে ফেলেছে পৃথা—নলেন বউ। নলেন বউ গাঁয়ে নেমে মাথায় আঁচল টানে, তবে এসো দিদিমুণি, তোমাকে বজোবুড়ির ঘর দেখিয়ে দিই।

ঢোলকলমির ঝোপ বসিয়ে ঘর আর বার পৃথক করা। ঘর বলতে হাত ছয়েক উঁচু এমন এক কুঁড়ে। পুড়ে ভিজে খড়গুলো তার বাদাম কালো। কালো চালায় হামা টানছে লিকলিকে উচ্ছে লতা। মেটে দেওয়ালের পিঠজুড়ে যেখান সেখান ঘুঁটের মিছিল। বাতাস এলেই গন্ধ ঝাঁপায়। কাঁচা ঘুঁটের গোবরগন্ধ। দাওয়া বলতে তেমন কিছুই নেই। উঠোন ফেলে ঘর, ঘর পেরোলে উঠোন। ঘরের ভেতর একটু কোণে পোঁটলা মতন পড়ে আছে কেউ। চারপাশে তার নোংরা কাঁথাকানির ডাঁই। ওটাই আলতাবউ নাকি? নাকি এ গাঁয়ের বজোবুড়ি? ভেজা ভেজা অন্ধকারে ভালোমতন বুঝতে পারল না পৃথা। কিংবা চাইল না বুঝতে। হাসিলেপা ভরাট মুখখানা এখনও ভাসছে যে বুকে। কপালজোড়া মেটে সিঁদুরের টিপ, ঠোঁট দুখানা খয়েরলাল। বড়ি খোঁপায় আঁচল ওঠালে কী অপরূপ যে দেখত আলতা বউকে।

এক পা ঘরে, বাইরে এক পা, পৃথা দাঁড়িয়ে রইল খেজুরপাতার খোলপা খানা ধরে। ঠিক তখনই রোগে ভেজা বৃদ্ধাকণ্ঠ ভেতর থেকে থরোথরো, কে এল রে? ওরে কে এল? বল না বউ কে এল?

প্রাণগোপালের বউ-এর গলায় ফিসফিসানি, যাও না কেন ভেতরে, ও দিদি।

যাই গো যাই। এর জন্যই তো আসা এতদূর। পৃথা ফিরে তাকাল। প্রাণগোপালের বউ কখন গামছা ছেড়ে কাপড় জড়িয়েছে শরীরে, সবুজ ডুরের সস্তা শাড়ি। তাও আবার শতেক ফাটা। ডাগর চোখ শান্ত নরম। ও চোখেও নাকি আগুন নাচে! কে জানে। কাক চিলও নাকি হাঁক শুনলে দৌড়ে পালায়! নলেনবউ এরকমই বলেছিল বটে। পৃথার সামনে রূপ কিন্তু অন্যরকম। একটু আগে, এই তো কেমন নিজের হাতে ধুয়ে মুছে সাজিয়ে দিল শাশুড়িকে। গন্ধ তাড়াতে ঘরে ধোঁয়া দিল গুগ্‌গুলের। ছেলে দুটোকে পাঠাল বাপের খোঁজে। পৃথাকেও কত খাতির, কদ্দূর থিকে এসেছ। জিরোও দিকিন আগে। এত পথ এলে, গরিব ঘরের জলবাতাসা টুকুনখানিক মুখে দাও দিনি।

কোন মানুষ যে কখন কিরকম! এই যদি ভালো দ্যাখো তো, এই মন্দ। মন্দ ভালো মিশলে পরে তবে না মানুষ, মানুষ হয়। আহা বেচারি, দুঃখে অভাবে জেরবার হয়তো। অন্নের জন্য দুঃখ, তাড়িখেকো মাতাল স্বামীটার জন্য দুঃখ। কতটুকুন ঘরটাতে কচিকাঁচা মিলিয়ে এতগুলো মানুষের থাকা। তায় দোসর ওই পঙ্গু বুড়ি।

আবার গলা কাঁপছে ঘরে, ও বউ, কেমন যেন বাস আসতেছে না? চেনা চেনা, পুরোনো অনেক। কে এসেচে, বল না, ও বউ?

ভ্যানিটি ব্যাগের মুখ খুলে মিষ্টির বাক্সখানা বার করল পৃথা। বুদ্ধি করে খানদুয়েক সস্তা দামের শাড়ি আনলে হত। কিংবা নিজেরই কোনো পুরোনো ছেঁড়া। পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা অবাকচোখ বাচ্চাগুলোরও নেই কিছুই। ভাবতে ভাবতে এগোলো আলতাবউ-এর কাছে, চেনা চেনা লাগছে নাকি? সত্যি? দ্যাখো তো ভালো করে।

ভাঙা মাজা চেপে ধরে টান টান আলতাবউ। কাদাগোলা ছানি চোখের পাতা দুটো পিটির পিটির, কে বলোতো? ঠিক ঠিক চিনতি পারছিনি।

—সেই যে গো, একডালিয়ার বাগচী বাড়ি। ভুবনমোহন বাগচী নয়নমোহন বাগচী...

বুড়ি তবু উথালপাথাল কথা হাতড়ায়, একডালিয়া? সে আবার কাদের গেরাম? কোন্ পথ দে যেতি হয়?

প্রাণগোপালের কিশোরী মেয়ে খিলখিল হেসে উঠল। পৃথা বুড়ির শরীর ছুঁল, গ্রাম নয় গো। একডালিয়া সেই কলকাতায়। বালিগঞ্জে নামলে পরে এগিয়ে গিয়ে ডানহাত মোড়ো, তারপর আবার ডান, আবার ডান...

বুড়ির গলা প্যাঁ প্যাঁ বাজে এবার, অনেকটা ঠিক হারমোনিয়াম রিডের
তা, হ্যাঁ গো হ্যাঁ, পড়েচে গো, মনে পড়েচে। বউমাদের শউড় ঘর তুলল
র, সেই নড়াই-এর কালে। সব ত্যাখন পেইলে যাচ্চে কলকেতা

ও ঝুঁকেছে পৃথা। ব্যগ্র মন ঝোকা শরীরে টলমল, চিনেছ তবে?
তাবউ শিশুর মতো কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে হাত বোলাল
পৃ খ। শক্ত বরফ কাঠি আঙুল, পুরোনো বাসি মড়ার যেমন। কপাল
থাব ল থাবড়ায়, গালে হাত, চোখে এসে হাত টিপটিপ। আস্তে
আ হাতে প্রাণ ফিরছে, ভাঙা মুখে আলোর আভাস,—চিনেছি গো
চিনে. চোখ কি আর ভোলা যায় গো? তুমি আমার ছোটবউদিদি,
নয়নদাদার আহ্লাদি বউ, তাই নয়? একইরকম আছ দিকি! বদলাওনি!

পৃথা বুঝি ছিটকে গেল। হায় রে হায়, শেষে তাকে মা বলে ভেবে নিয়েছে আলতাবউ!

—এতদিন পর কুথথেকে এলে গো ছোটবউদিদি? কোথায় ছিলে গো এতটা দিন? কতদিন যে দেখিনি তোমাদের...

ধীরে ধীরে কান্না সুর হয়ে যাচ্ছে, হারিয়ে যাওয়া সেই নখকাটানির সুর। পৃথার ভেতর সব কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল। এমনটা যে হবে একটু আগেও কি ভেবেছিল? ভুলটাকে ভেঙে দেবে নাকি? মা বলে মেয়েকে চেনার ভুল? কী লাভ তাতে? একেবারে ভুল তো নয়। সব মা'ই তো একটু একটু করে একদিন ঢুকে পড়ে মেয়ের মধ্যে। ভাঙতে ভাঙতে, ভাঙতে ভাঙতে, কখন মেয়েরাই যে মা হয়ে যায়। যুবতী মা, যুবতী মা থেকে প্রৌঢ়া মা, প্রৌঢ়া মার দিন ফুরোলে বৃদ্ধা মা। অসম্ভব, এ ভুল ভাঙতে আর যে পারুক, পৃথা পারে না। যে সময়ে বেঁচে ছিল প্রাণভরে, সেই সময়টাকে হাত বাড়িয়ে ধরতে চাইছে বজোবুড়ি।

—হ্যাঁ গো ছোটবউদিদি, ছেলেমেয়ে সব কেমন আছে? নয়নদাদা? এখনও সেই ছুটির দিনে আপিস করে?

আলতাবউ কে ছিল মার? বোন? বন্ধু? কাছের আত্মীয় কোনো? পৃথা দু আঙুলে কপাল টিপে ধরল। হারানো মানুষগুলো হঠাৎ হঠাৎ এমন হৃদয় মাড়িয়ে যায়!

—বড়বউদিদি এলনি কেন? ভুবনদাদার বউ? শরীর থাকলি যেতাম তারে একদিন আলতা পরাতি। তোমাদের সক্কলকার বে'তে আমিই ছিলাম, মনে পড়ে? সেই কর্তামার আমল থিকে...

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল পৃথা। মনে শুধুই জবাব সার সার। নয়নদাদা, ভুবনদাদা কোনো দাদাই নেই যে গো আর। বড় বউ তো কবেই চলে গেছে শেষ যাত্রার আলতা পরে।

বুড়ি ব্যস্ত হয়েছে এবার, ও বউ, আমার নরুনখানা খুঁজে দ্যাখ না মা। আর আলতার শিশিখান। ছোটবউদিদিকে কদ্দিন পর পরান ভরে আলতা পরাই।

এবার বুকের জবাব জল হয়ে নামছে চোখ বেয়ে। পৃথা দাঁতে আঁচল চাপল। ছোটবউদিদি তোমার আর কোনোদিনই আলতা পরবে না গো। আলতা পরার কাল কবেই তার শেষ হয়েছে।

খুঁজে খুঁজে ঠিক বার করেছে প্রাণগোপালের বউ। নাকি হাতের কাছেই ছিল? নরুন, ঝামা, পেতলের ছোট আলতাবাটি, রাঙাজবার শিশি একখানা। ছেলের বউই শাশুড়ির কাজ করে নাকি এখন? নাকি নাপিতঘরে মজুতই থাকে এসব? ঠকঠকে হাতে পা ছুঁয়েছে। পৃথার শরীর জুড়ে শিহরন খেলে গেল। এ দৃশ্য দেখলে মুনিয়াটা হেসে কুটিপাটি যেত, মা, তুমি আলতা পরছ নাকি! কোনোদিন তো দেখিনি!

—দেখিসনি তো কি আছে, দ্যাখ। মানায়নি আমাকে?

—মোটেই না, মোটেই না। তোমার পায়ে আলতা! ওফ্ হরিবল। ব্যাপারটাই ভীষণ প্রিমিটিভ।

হ্যাঁ প্রিমিটিভ। সেই প্রিমিটিভ হাত এখন নরুন ধরেছে। নরুন ছুঁল নখ, নাকি নখই ছুঁল নরুনকে! দেখতে দেখতে ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া ছড়িয়ে গেল চারদিকে। আঙুল থেকে গোড়ালি, আবার আঙুল। আলতাবউ এও ভুলেছে, এসব তাকেও ছুঁতে নেই আর। পৃথা উঠে দাঁড়াল। দুটো পায়ের গোটা পাতাই রক্তে রক্তে টসটস। এ রক্ত বড় সুখের রক্ত। এ রক্তে বাঁধা পড়ে মায়া। বোধহয় এরই নাম ভালোবাসা।

ফেরার পথে পা পড়ছে এলোপাথাড়ি। এত দূরে ভেসে গেলে ফিরে যাওয়া কি সহজ হয়? ঢোলকলমির বেড়ার ধারে প্রাণগোপালের বউ দাঁড়িয়ে, একা। কচিকাঁচাগুলো গেল কোথায়? প্রাণগোপালও এল না তো?

—ও বউদিদি, ইদিকপানে এসো এট্টু, কথা ছিল।

পৃথা চমকে তাকাল। একটু আগের দিদিমণি ডাক বদলে হঠাৎ বউদিদি যে? নাকি ছোঁয়াচ লেগেছে শাশুড়ির? তা বলুক না হয়। বাগচী বাড়ির বউ না হলেও, পৃথা বউ তো বটে। আরেক বাড়ির।

—কী বলছ?

—জিগিস করতিছি শাউড়িরে কিছু বলতি এসছিলে নাকি?

—কেন বলো তো?

—শাউড়ির মতন আমিও এখুন আলতা পরাই দোরে দোরে। এ ঘর ও ঘর থিকে ডাক আসে। প্রাণগোপালের বউ গলা নামাল, তা গেরাম দেশের গরিব যজমানদের থিকি কত আর উপায় হয়। ঘরে ইদিকে বড় অভাব...

প্রাণগোপালের বউ তাকিয়ে আছে আশায় আশায়। পৃথা নীরব। কথা বলবে কীভাবে? দুজন মানুষ যে ঢুকে গেছে বুকের ভেতর। পৃথার মা হাসতে চাইছে মধুর করে, তবে এসো মাঝে মাঝে। বাড়ি এসে আলতা পরিয়ে যেও।

মুনিয়ার মা বলছে, পাগল নাকি? ওসব এখন আউটডেটেড। দরকার নেই।

প্রাণগোপালের বউ বলছে, তুমি ডাকলেই যাই গো বউদিদি। কলকেতাতে দু চার ঘর যজমান যদি পাইয়ে দাও....

কলকাতাতে মানুষ কোথায় আলতা পরার? তেমন তেমন প্রয়োজনে বিউটি পারলার মোড়ে মোড়ে। তাছাড়া মানুষ এখন...। মুনিয়ার মা গুছিয়ে সাজিয়ে বলতে চাইল অনেক কথাই। তার আগেই কী করে যেন কথা বলে ফেলেছে পৃথার মা, আমি থাকি বাবুর বাগান, ঢাকুরিয়ায়।

উঠোন পেরিয়ে রাস্তা, রাস্তা পেরিয়ে মাঠ, তারপর আকাশ। দিগ্‌বিদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে ঠিকানাটা—বাবুর বাগান, ঢাকুরিয়া। এই মাত্র ঢুকে গেল ঘরে ঘরে। এ ঘর থেকে ও ঘর, কুমোরপাড়ার ঘর, মালোপাড়ার ঘর....ও নলেন বউ, তুমিও এসো তবে। গুড় রাখব। ঝোলা গুড়, তালপাটালি, যখন যেমন। খেজুর রসও এনো শীতে। তারপর গল্প কোরো পা ছড়িয়ে। এর কথা, তার কথা।

এক ঠিকানা খুঁজতে এসে, এক ঠিকানা খুঁজে পাওয়া। মনে মনে তাই কুড়িয়ে পৃথা কোথায়, পৃথার মা ফিরছে যেন শেষে। ভ্যান-রিকশায় একা একা। নীল সাদা শাল নেমে গেছে কোলের ওপর, জংলা আঁচল বাতাস বাতাস। বুকটা যখন তাপে তাপ, তখন কি আর ঠান্ডা লাগে? মাঘ-বিকেলেও?



ভিনদেশ



ফিরে আসার নিশানাগুলো নিখুঁতভাবে মনের ভেতরে এঁকে নিয়েছিল তৃষ্ণা। অচেনা শহর, অজানা পথঘাট। রাস্তার প্রতিটি বাঁক তাই লক্ষ করেছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তবু পথ হারাল। ভিনদেশির রাজ্যে নিঃসঙ্গ রানির মতো একদম একা একা হারিয়ে গেল। রানি না ভিখারিনি? অচিনপুরের রাস্তায় যে বোকার মতো হারিয়ে যায় আর হারিয়ে গিয়ে তালবেতাল ঘুরে মরে, তাকে ঠিক কী মনে হয় তখন? ঘুরে মরাই তো। আইসক্রিম বারটার সামনে দিয়েই বারপাঁচেক ঘুরে গেল। ঠিক কোন্‌খান দিয়ে যে ফিরতে হবে? ডানদিক বা বাঁদিক? না চৌকো চাতালের ওপারের ওই সিধে রাস্তাটা? কোন্ রাস্তা দিয়ে যে পড়ল এখানে। হাতে ধরা সিটিম্যাপটা বারবার দেখেও জায়গাটার হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। এই তো এখানে টাইবারের ওপারে ভ্যাটিকান সিটি। সেন্ট পিটারস চার্চ, সিসটিন, চ্যাপেল, পোপের বাড়ি। এধারে সিটিসেন্টার পিয়াৎজা ভেনিজিয়া। রোমের এসপ্লানেড। অপরিচিত নামগুলোকে সকাল থেকে ঠোঁটে ঠোঁটে বাজিয়েছে তৃষ্ণা, ছেলেবেলায় বর্ণপরিচয় মুখস্থ করার মতন। চোখের সামনে ভাসছে সেই বিশাল ফার্নিচারের দোকানটা। মোবিলিয়া। তারপর কিছুটা এগোলে সেই ঈষৎ লম্বা রাস্তা ভিয়া-দেলা-ফ্রেমিৎজিয়া, দুপাশে যার মনোরম ঘরবাড়ি, গোটাকয়েক দোকানপাট আর দীর্ঘাঙ্গী গাছের মিছিল। আর মোটেল লে-পিন, এ শহরে তৃষ্ণার দুরাতের আস্তানা।

ফুটপাথের একেবারে মাঝখানে দাঁড়িয়ে চোখের খুব কাছে মানচিত্রখানা তুলে ধরল তৃষ্ণা। সকালটা শুরু হয়েছিল টাইবারের ওপারে, ভ্যাটিকান সিটি থেকে। দুপুরে আবার টাইবার পার হয়ে রোমান ফোরাম। রোমান ফোরাম থেকে কলোসিয়াম, ট্রেভি ফাউন্টেন...তারপর?...তারপর? তৃষ্ণা ভুরু কোঁচকাল। তারপর তো এই লাল মোটা লাইনটা ধরে তার ফিরে যাওয়ার কথা আবার টাইবারের কাছেই। এই তো ম্যাপের গায়ে নীল কালিতে স্পষ্ট টাইবার নদী। ওখানেই স্থির দাঁড়িয়ে ইগলের মাথাঅলা সেই বিশালকায় ব্রিজ, যার কাছে পৌঁছোলে ফার্নিচারের দোকানটাকে পেয়ে যাবে। তারপর মোটেল লে-পিন আর কতটুকু। কিন্তু লাল-দাগ রাজপথ এ কোথায় এনে ফেলে দিল তাকে? মাঝে কোথাও নির্ঘাত একটা বড় ভুল হয়ে গেছে। কোনও মোড় পার হতে গিয়ে হয়তো ভুল রাস্তায় ঢুকে পড়েছে। হয়তো কোনও ভুল বাঁকের ভুল সিদ্ধান্ত। তৃষ্ণা দু-চোখ বন্ধ করল। নিজেকে ভীষণ বোকা বোকা লাগছে। কলকাতার সেই চালাক চতুর মেয়ে, যে কিনা হিল্লিদিল্লি করে বেড়ায় কথায় কথায়, একা একাই ছোটে পাসপোর্ট অফিস, স্বরাষ্ট্র দপ্তর, সে-ও তবে হারিয়ে যায়! বঙ্কিম রাস্তার ভুল বাঁকে।

একটু আগেও বড় নিশ্চিন্ত মনে বসেছিল আইসক্রিম বারটার ভেতর। গোলাপি সবুজ টু-ইন-ওয়ানে জিভ ছুঁইয়ে ভাবছিল, আহারে তিন্নিটা আইসক্রিম খেতে কী ভালোই না বাসে। গলার কাছে ওত পেতে রাক্ষুসে টনসিল, হাজার নিষেধ, লক্ষ বকুনি, তবু মেয়ে যেন তার বরফ খাওয়ার যম। দু-বেলা এমন সুস্বাদু আইসক্রিম পেলে তিন্নি খুশিতে পাগল হয়ে যেত।

ভাবতে গিয়ে বুক জুড়ে ব্যথা টনটন, চোখ-ভর্তি মনকেমনকরা জল। মাকে ছেড়ে কেমন আছে তিন্নি? কলকাতায়, একা একা?

দূর, একা কোথায়! কত কে আছে। তিন্নির দাদাই, দিদান, কুট্টিমাসি, মামা। খেলনা আর গল্প পেলে কত সহজেই শিশুরা সব ভুলে যায়। তৃষ্ণাও যদি পারত সেরকম? এত বড় একটা বিশ্ব, জাঁকজমকের কনফারেন্স, সবকিছুকে ছাপিয়েও কেন যে শুধু ওরা আর ওরা! কেন যে এত পিছুটান? অকারণ আঁকড়ে ধরার চেষ্টা? পিয়াল কি এখনও একদিনও দেখতে যায়নি

মেয়েকে? জেদ করে? তৃষ্ণা প্রায় গোটা আইসক্রিমটা ছুঁড়ে দিয়েছিল স্ট্রিট ডগটার দিকে। টালমাটাল ভাবনায় এলোমেলো হেঁটেছিল অনেকক্ষণ।

তবে কি ভুল হয়েছে তখনই? ভুল তো হয় এভাবেই। ভুলের কোনও পদশব্দ নেই। সে আসে বড় নিঃসাড়ে, শয়তানের পায়ে গুটিগুটি। একটামাত্র ভ্রান্তি কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যায় মানুষকে।

সিগন্যাল বুঝে, ট্রাফিক লাইন ধরে সাবধানে অন্য ফুটপাথে এল তৃষ্ণা। রাস্তা পার হওয়াও এখানে ঝকমারি। দূর থেকে আরেকবার তাকাল বর্ণময় আইসক্রিম বারটার দিকে। কী কুক্ষণেই যে ওখানে ঢুকেছিল। দুহাতে নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে। এভাবে হারিয়ে যাওয়ার কোনও মানেই হয় না। ট্যাক্সি ধরবে একটা? ট্যাক্সিড্রাইভার যদি ঘোরায় বেশি? যদি মিটার ওঠে হাজার হাজার লিরা? সব দেশেই ট্যাক্সিচালক বিদেশিদের অকারণ হয়রান করে। কী দরকার ছিল এভাবে নিজের খেয়ালখুশি মতন বেরিয়ে পড়ার? ট্রাভেল এজেন্টদের কাছে গেলেই তো হত। টাকার অঙ্ক শুনে মিছিমিছি তখন পিছিয়ে এল। টাকা নয়, লিরা। ভ্যাটিকান সিটি থেকে সিজারের রোম, মেডিভাল রোম সব একসঙ্গে দেখিয়ে দেবার দক্ষিণা পঁয়ত্রিশ হাজার লিরা। ভারতীয় হিসেবে, যা কিনা সাড়ে তিনশো টাকার কিছু কম। পনেরো দিনের এই বেড়ানো শেষে লন্ডনে ফিরে আরও সাত আট দিন থাকতে হবে। শেষ দফার কনফারেন্স এখনও বাকি। হুট করে বেহিসেবি খরচা করার উপায় কোথায়।

তৃষ্ণা যেখানে দাঁড়িয়ে তার পাশেই একটি সুদৃশ্য কাচের পানশালা। শো-উইন্ডোতে ঝকঝকে নেশার বোতল। তারপর সার সার বাহারি ফুলের দোকান। নানান বয়সের রঙিন পোশাকপরা গুচ্ছ গুচ্ছ মহিলা মিষ্টি হাসির সঙ্গে ফুলের তোড়া বাড়িয়ে দিচ্ছে পথচারীদের দিকে। কেউ কিনছে, অনেকেই কিনছে না। তৃষ্ণার দেশে, কলকাতা বোম্বাই দিল্লি কি মাদ্রাজে এভাবে কি ফুলের পসরা সাজিয়ে বসে সুবেশা নারীরা? পুরো দৃশ্যটাই কেমন স্বপ্ন স্বপ্ন। অলীক। কাছেই কোনও গির্জায় ঘন্টা বাজছে ঢং ঢং। একটু আগেও রোমের আকাশে একটা বিকেল ফুটে ছিল। এখন ধীরে ধীরে জড়ো হচ্ছে নীলচে অন্ধকার। এইমাত্র আলোর সাজে সেজে উঠল রোমিউলাসের নগরী।

আলো ঝিলমিল রাস্তাঘাটের দিকে তাকিয়ে এতক্ষণে তৃষ্ণার গা ছমছম করে উঠল। সন্ধে নেমে গেলে অচেনা জায়গারা আরও বেশি অচেনা হয়ে যায়। চারদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে অজস্র গাড়িঘোড়া। অচিন শব্দমালারা দুলছে বাতাসে।

তৃষ্ণা অশান্তভাবে বেশ খানিকটা হেঁটে গেল। আবার ফিরল। আবার হাঁটল। দুপাশ দিয়ে মানুষজন চলে যাচ্ছে যে যার মনে। হলুদ ঢোলা গাউনপরা এক বৃদ্ধা খুব আস্তে আস্তে হেঁটে আসছেন। প্যারাম্বুলেটারে ফুটফুটে বাচ্চা বোধহয় নাতি।

তৃষ্ণা তাঁর পথ আটকাল,—তুমি কি আমাকে একটু রাস্তা দেখিয়ে দেবে? কোন্দিকে গেলে নদী পাব আমি? ব্রিজ?

বিস্মিতচোখে মহিলা থমকে তাকিয়েছেন কফিরাঙা বিদেশিনির দিকে। তাকিয়েই আছেন। বারকয়েক প্রশ্ন ছুঁড়ে তৃষ্ণা ধৈর্য হারাল,—ক্যান ইউ প্লিজ শো মি...

বেশ খানিক পর মহিলা ঠোঁট খুললেন। নিজস্ব ভাষায় গড়গড় করে কী যেন বলে যাচ্ছেন। তৃষ্ণা এক বর্ণও বুঝল না। প্রাণপণে নিজেকে প্রকাশ করতে চাইল। ইটালিয়ান ঠাকুমা দুদিকে মাথা নাড়লেন।

তৃষ্ণা হতাশভাবে এগিয়ে গেল। এবার ইংরিজি উচ্চারণ করছে টেনে টেনে। এবার এক তরুণীর কাছে। এবারও নিরাশ। হায়রে, কেউই তার ভাষা বুঝছে না। সেও বোঝে না এদের। চোখ ফেটে জল আসতে চাইছে। নিজেকে বোঝাতে না পারার যন্ত্রণা যে কী গভীর তা যেন নতুন করে আরেকবার উপলব্ধি করল তৃষ্ণা। কী লাভ শুধু শুধু বিদেশিদের ওপর অভিমান করে? যারা তার ভাষা বোঝে, তাদের কাছেও কি নিজেকে পৌঁছাতে পেরেছে কোনওদিন? সঠিকভাবে? কেউই বোধহয় পারে না। প্রথম সেপ্টেম্বরে যদিও এখানে প্রকৃতি মোটেই উষ্ণ নয়, বাতাস ঠান্ডা বরং, তবু কুলকুল ঘাম জমছে কপালে। চারদিকের আলোর ভিড়ে চোখ জুড়ে ঝাপসা অন্ধকার।

অনেক অনেকদিন আগে এরকমই একবার হারিয়ে গিয়েছিল তৃষ্ণা। কতই বা বয়স তখন। চার কি পাঁচ। মায়ের একহাতে তৃষ্ণা, তিনজনে চলেছে পুজোর বাজার করতে, বেশি দূরে নয়, হাতিবাগান। ভিড়ের ভেতর

মা বুঝি তখন ব্যস্ত ব্লাউজ না কী কিনতে। পাশেই জমকালো খেলনার দোকানে ঘন ঘন মাথা নাড়ছে ইয়া বড় এক বাঘ। বাঘ নয়, যেন বিস্ময়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আশ্চর্য। মায়ের হাত খুলে তৃষ্ণা কখন চলে গেছে সেইদিকে। সেকেন্ড গেল, মিনিট গেল, ঘাড় ফিরিয়ে মেয়ে হঠাৎ দিশাহারা। কোথায় মা, কোথায় বোন, বিশাল ভিড়ের ভেতর সে কখন একলা হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে বুক কাঁপিয়ে সে কী হাহাকার। পাগলের মতো এলোপাথাড়ি ছুটছে। মা নেই, বোন নেই,আত্মজন কেউ কোত্থাও নেই। পরে ভাবলে খুব হাসি পেত। বাড়ি থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরেও তবে হারিয়ে যায় কেউ কেউ। সেদিন থেকেই তবে কি তার হারিয়ে যাওয়া শুরু! কৌতূহলী জনতা যখন জড়ো হচ্ছে ছোট্ট বালিকার কান্নাকে ঘিরে, তখনই অনেক দূর থেকে একটা আর্ত ডাক কানে এসেছিল। বোন চিৎকার করে কাঁদছে আর ডাকছে,—দিদিইই, দিদিভাআআই, দিদিরে...

মা'ও কি চিৎকার করছিল বোনের মতো? হয়তো করেছিল। তৃষ্ণার মনে নেই। শুধু মনে আছে মেয়েকে জাপটে ধরে সেদিন কী কান্নাই না কেঁদেছিল মা।

মানিকতলার বাড়িতে বসে মা কি আজ বুঝতে পারছে মেয়ে তার আবার হারিয়ে গেছে? এবার সাতসমুদ্র পারে?

নাহ্, কেউ টেরও পাবে না। অনেক অনেক দূরে চলে এলে এরকমই তো হয়। পিছন থেকে ডেকে নেবার কেউ থাকে না তখন। কিংবা হয়তো ডাকে। তৃষ্ণা আর সে ডাক শুনতে পায় না। পিয়াল কি কোনওদিনও খুঁজেছিল তাকে? তেমন করে? নাকি শুধুই..

তৃষ্ণার চোয়াল শক্ত হল। ঠিকানা সে খুঁজে নেবে। নেবেই। নাই বা কেউ ভাষা বুঝল, কাছাকাছি পুলিশ স্টেশন তো আছে। এত বড় শহরে হাঁটতে হাঁটতে একটা পুলিশ চৌকিতে কি পৌঁছোনো যায় না? দুই যুবক গায়ের খুব কাছে এসে দুর্বোধ্য কিছু মন্তব্য ছিটিয়ে দিয়ে গেল। ইভ-টিজার। তৃষ্ণা মুখ ফেরাল না। ভাষা না বুঝলেও ইঙ্গিত চেনা যায়। ওরা কি তবে বুঝে ফেলেছে একদা এক কানাগলির মেয়ে রাস্তা বেয়ে চলতে চলতে পথ ভুলে অজানা পাঁচমাথার মোড়ে? খুবই উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে কি তাকে? ছেলেদুটোর হাবভাব আচার আচরণ অনেকটা কলকাতার গলির মোড়ের

ছেলেদের মতো। চেহারাতেও কোথায় মিল যেন। কালো রং চুল, চোখের তারা কালো। না তাকিয়েও তৃষ্ণা টের পেল ছেলেদুটো ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকেই দেখছে। ছোটমামা পই পই করে বলে দিয়েছিল, যদি লন্ডন থেকে কন্ডাক্টেড ট্যুরে রোমে বেড়াতে যাস তবে খুব সাবধানে থাকবি। ওই শহরটা হল যতসব ঠগ জোচ্চর আর ছিনতাইবাজদের আড্ডা।

ভ্যানিটিব্যাগটাকে বুকের ভেতর ভালো করে সাপটে নিল তৃষ্ণা। জোরে জোরে হাঁটছে। প্রচণ্ড গতিতে মোটর সাইকেল চালিয়ে আরেকজন চলে গেল গায়ের পাশ দিয়ে। ভয়ে কাঁটা দিল শরীরে। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাফিক পুলিশটার কাছে এক ছুটে পৌঁছে গেল তৃষ্ণা। অসহায় স্বর আপনা-আপনি ছিটকে এসেছে গলা থেকে,—আয়াম ইন ডিপ ট্রাবল। প্লিজ হেল্প মি।

সুদর্শন পুলিশটি বেশ রসিক। প্রথম দর্শনেই টুক করে চোখ মেরে নিল বিদেশিনিকে। হাসছে মৃদু মৃদু।

তৃষ্ণা বিপদ বোঝাতে মরিয়া হল,—লিসন। আই হ্যাভ লস্ট মাই ওয়ে। প্লিইজ।

লোকটি এবার থমকাল।

—আমি ঠিক রাস্তা খুঁজে পেতে চাই—

এবার লোকটির মুখ হাঁ হল সামান্য। তৃষ্ণা হাঁপাতে লাগল। এ লোকটিও ইংরিজি ভাষা বোঝে না। তবে হাসছেও না আর। বোধহয় বুঝেছে মহিলা সত্যি সত্যি বিপন্ন।

তৃষ্ণা সজোরে ঠোঁট কামড়ে ধরল। কেউই যদি তার ভাষা না বোঝে, ফিরবে কী ভাবে? ট্যাক্সি ড্রাইভারও হয়তো...। তৃষ্ণার বুক ধড়ফড় করে উঠল। এতক্ষণ যা ছিল শুধুই দুশ্চিন্তা, তাই এবার শীতল আতঙ্ক হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে শরীরে। মস্তিষ্ক থেকে ধীরগতিতে একটা হিমবাহ গড়িয়ে আসছে শিরদাঁড়ায়। ডুবন্ত মানুষ যেভাবে হাত পা ছোঁড়ে, সেভাবে ছটফট করে উঠল তৃষ্ণা,—টাইবার। টাইবার। রিভার। ইগল ব্রিজ। হুইচ ওয়ে?

পুলিশটিও বুঝি সাহায্য করতেই চাইছে। পশ্চিমদিকে আঙুল তুলে কী যেন দেখাল। তৃষ্ণা জোরে জোরে মাথা নাড়ল। দুহাত উঁচু করে নদীর ওপর ব্রিজ আঁকল একটা, শূন্যেই। আঙুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জল বোঝাতে চাইল।

লোকটি আবার নিজস্ব ভাষায় কিছু বলল। বাচনভঙ্গি এতই ভিন্ন যে ওর মুখে 'তাইবার' নামক চেনা শব্দটিকেও বুঝে উঠতে সময় লাগল তৃষ্ণার। নিজের অজান্তে এবার নির্ভেজাল মাতৃভাষা গড়িয়ে এলে গলা থেকে,—হ্যাঁ ভাই হ্যাঁ। তাইবার নদী। তার ওপরে ইগল ব্রিজ। কোথায় একটু বলে দাও না গো।

দুজনে দুভাষায় অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। বুঝতে চাইছে একে অন্যকে। পারছে না। তৃষ্ণার গলার কাছে কান্না উথালপাথাল। তবে কি নির্বাসনই লেখা ছিল কপালে। তবে কি পৌঁছোনো যায় না নিজস্ব ঠিকানায়? হাত পা ক্রমশ ঠান্ডা হয়ে আসছে। পাসপোর্ট ভিসা সব জমা আছে হোটেলের রিসেপশনে। হোটেলই যদি খুঁজে না পাওয়া যায়...দলিলগুলো ছাড়া কোনওভাবেই মুক্তি নেই এখান থেকে। আজ যদি না ফিরতে পারে, কসমসের ক্যারাভান কি অপেক্ষা করবে তার জন্য? খুঁজবে তাকে? নাকি রুটিনমতোই ভোরবেলা রওনা দেবে ফ্লোরেন্সের দিকে?

একটামাত্র যাত্রীর জন্য কোথাও বসে থাকে কি গোটা দল? তারপর কী হবে? ইন্ডিয়ান এমব্যাসি কতদূর এখান থেকে? কোথাও পৌঁছোনো না গেলে সারারাত এ শহরে একা একা...!

তৃষ্ণা ফুটপাথে ফিরে এসে কেঁদেই ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে ভাবনারা সব গোল পাকাল। কাঁদতে কাঁদতে রাস্তার মাঝখানে মাইকেল এঞ্জেলোর স্ট্যাচু হয়ে গেল তৃষ্ণা।

কতসময় কেটেছে জানে না, আচমকা কানের কাছে তৃষ্ণা শুতে পেল এক অপার্থিব স্বর। স্বর নয়, স্বর্গ থেকে দৈববাণী হল বুঝি। একেবারে পাশেই। হাত তিনেক দূরে। প্রথমটা যেন বিশ্বাস হয় না কানকে। তবে কি সাহায্য আসে শেষ পর্যন্ত? তবে কি ডুবন্ত জাহাজের এস ও এস পৌঁছোয় কোথাও না কোথাও?

সম্বিত ফেরার আগেই আবার সেই স্বর্গীয় সুর ভাসছে,

—মাদাম, তুমি কি পথ হারিয়েছ?

ছেলেটি ইটালিয়ান, না ইংরেজ? নাকি ছদ্মবেশী দেবদূত কোনও? কপালকুণ্ডলা বুঝি বহুযুগ আগে এভাবেই ডেকেছিল নবকুমারকে, তুমি কি পথ হারিয়েছ?

তৃষ্ণার চোখ বড় বড় হল,—তুমি ইংরেজ?

—না, আমি এখানকারই বাসিন্দা, মার্সেলো।

মার্সেলো। আহ, কী সুন্দর নাম। তৃষ্ণা জোরে জোরে শ্বাস টানল। মার্সেলো হাসল সুন্দর করে,—ওই পিৎজাহাটে বসে অনেকক্ষণ থেকে তোমাকে লক্ষ করছি। দেখেই বোঝা যায়, তুমি এখানে নতুন। তাই না?

ছোট্টমতন খাবার দোকানটা এতক্ষণে তৃষ্ণার নজরে এল। মার্সেলো ওখান থেকেই দেখেছে তাকে। তৃষ্ণার চোখে পড়েনি কিছুই।

মার্সেলো ঝুঁকল,—অ্যাম আই রাইট মাদাম?

—রাইট। অ্যাবসলিয়ুটলি রাইট। আমি একেবারে নতুন। কালই সবে তোমাদের দেশে এসেছি।

—তুমি কি ইথিয়োপিয়ান?

—না। তৃষ্ণা চটপট উত্তর দিল।

—তবে কি ইজিপ্ট থেকে আসছ?

—উহুঁ।

—আর্জেন্টিনা?

তৃষ্ণা দুদিকে মাথা দোলাচ্ছে। মার্সেলোর চোখ বিস্ময়ে জ্বলজ্বল,—তবে কোন্ দেশের তুমি? কোথা থেকে আসছ?

পিৎজাহাটের মাথায় টাঙানো লালহলুদ বিজ্ঞাপনের দিকে উদাস তাকাল তৃষ্ণা। সত্যি তো, সে কোথা থেকে এসেছে? সে যে আসলে কে? ইন্ডিয়ান, ইথিয়োপিয়ান, ইংরেজ না জাপানি? কী যে তার প্রকৃত পরিচয়? নিজেই বুঝি বুঝতে পারছে না এই মুহূর্তে।

মার্সেলো আবার জিজ্ঞাসা করছে,—কোথা থেকে এসেছ মাদাম?

তৃষ্ণা বিষণ্ণ হাসল,—আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি।

—যাবে কোথায়?

—নদীর কাছে।

—নদী? কোন্ নদী?

—আপাতত টাইবার।

—নদী তো কাছেই। মার্সেলো উত্তরোত্তর অবাক হচ্ছে,—এই তো একটু গেলেই...

—আমি সেখানেই যেতে চাই। ইগল ব্রিজের ওপর। তৃষ্ণা একনিশ্বাসে বলে ফেলল,—কিছুতেই রাস্তা পাচ্ছি না।

—সে তো বোঝাই যাচ্ছে। মার্সেলো বিজ্ঞের মতো কাঁধ ঝাঁকাল,—কিন্তু কোন ইগল ব্রিজ খুঁজছ তুমি। তাইবারের পিঠে এখানে তো অনেক ব্রিজ। ইগল ব্রিজই আছে খানকয়েক। কোন্ ব্রিজটা চাও?

আবার বুঝি নতুন করে ঘাবড়ে যাওয়ার পালা। তৃষ্ণা ঢোঁক গিলল। মার্সেলো তার মুখ-চোখ দেখে হাসছে চোখ টিপে।

—রাস্তার নাম মনে আছে? ঠিকানা? যেখানে যাবে?

—আছে। আছে। রাস্তার নাম ভিয়া-দেলা-ফ্লেমিংজিয়া। মোটেল লে-পিন।

তৃষ্ণার উচ্চারণের ধরন বুঝতে মার্সেলোরও অসুবিধা হচ্ছে। তবু বুঝেছে, তুমি তো তোমার হোটেল থেকে তবে বহুদূরে চলে এসেছ। ওই ইগল ব্রিজ এখান থেকে বেশ দূরে। সোজা গেলে চারমাথার মোড় পড়ে একটা, তারপর ডাইনে ঘুরে বাঁদিকের থার্ড লেন ধরে...

তৃষ্ণা অসহায় চোখে তাকাল,—আমি এখন কিছু বুঝতে পারব না। সব কেমন গুলিয়ে গেছে। তুমি দয়া করে আমাকে...

মার্সেলো শিস দিতে দিতে এগোচ্ছে। কথা বলতে বলতে হাঁটছে দুজনে। একটা গোল পার্ক ঘুরে বড়সড় এক ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের সামনে এল। রোগা লম্বা মায়াবী যুবকটি হাঁটছে আর কথা বলছে। জিজ্ঞাসা আর কৌতূহলের বুঝি শেষ নেই তার।

—সোজা ইন্ডিয়া থেকে আসছ?

—না, এসেছিলাম লন্ডনে। আরকিয়োলজিকাল কনফারেন্সে।

—একা?

—উহুঁ, দশজনের একটা টিম। তার মধ্যে তিনজন মহিলা আছে। আমি, মিসেস প্যাটেল আর নয়না সিঙ্গানিয়া...

—তাঁরা কেউ আসেননি রোমে বেড়াতে?

তৃষ্ণা মাথা নাড়ছে। মিসেস প্যাটেল অত্যন্ত হিসেবি মহিলা। গভর্নমেন্টের পয়সা ছাড়া এক পয়সা খরচা করতে নারাজ। আর নয়নার তো এসব পৃথিবী বহুবার ঘোরা। গ্রুপের অনেকেই আগে এসেছে এদিকে।

পশ্চিমবাংলার একমাত্র প্রতিনিধি তৃষ্ণাই শুধু নতুন। কী করে যে অত অত উমেদারদের টপকে ন্যাশনাল ডেলিগেট হয়ে গেল! শুধু কনফারেন্সই নয়, পনেরো দিনের সুযোগও এসে গেল ফ্রান্স ইটালি ঘুরে নেওয়ার।

—দেন ইউ আর অ্যান আরকিয়োলজিস্ট? প্রাচীন সময়কে খুঁড়ে তোলো তবে তোমরাই? তুমি?

মার্সেলোর চোখে মুগ্ধতা। সফল এক নারীকে দেখছে, যেমন অনেকে দেখে। তৃষ্ণার হাসি পেয়ে গেল। সফলতার মাপকাঠিটা আসলে যে কী রকম! কখন প্রকৃত সফল হয় মানুষ। পিয়াল একদিন খুব রোম্যান্টিক মুহূর্তে বলেছিল,—আমরাই পৃথিবীর সব থেকে সফল সুখী কাপ্‌ল তৃষ্ণা।

সেই পিয়ালই কেমন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পালটে গেল। পাসপোর্ট পাওয়ার দিনও কী হিংস্রভাবেই না ঝগড়া করেছিল।,

—তুমি তা হলে যাবেই? আমার এত আপত্তি সত্ত্বেও?

—তোমার আপত্তিটা কোথায় খোলসা করে বলোই না।

—ঘরসংসার ফেলে সারাদিন তোমার এই উড়ে বেড়ানো আমার পছন্দ নয়।

—কী করতে বলো? বাড়িতে বসে থাকব চুপচাপ?

পিয়াল একথার কোনও জবাব দেয়নি। তৃষ্ণা তবু বোঝানোর চেষ্টা করেছিল,—দ্যাখো এত বড় একটা সুযোগ এসে গেছে...যাব না? কী সম্মান তুমি ভাবো?

—সম্মান না ছাই। অহেতুক আক্রোশে ভেঙে চুরে যাচ্ছিল পিয়ালের মুখ,—মেয়ে ফেলে, সংসার ফেলে...আমি তোমার মেয়ে সামলাতে পারব না।

—বারে, মেয়ে তোমার নয়? তুমি যেতে না এরকম একটা চান্স পেলে? আমাদের রেখে? একা একা...

নাহ, পিয়ালকে দোষ দেওয়া যায় না। পিয়ালের মতো বহু মানুষই এরকম মানসিক জড়তায় পঙ্গু হয়ে রয়েছে আজও। তবু...

—আর ইউ ম্যারেড?

তৃষ্ণা হোঁচট খেল। লোকটা এত প্রশ্ন করছে কেন? কোনও খারাপ মতলব নেই তো? কথায় কথায় ভুলিয়ে...। এভাবে লোকটাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। দশ বছর ঘর করার পরও যার কাছে ঘরের মানুষ বিদেশি হয়ে যায়, দশ সেকেন্ডের পরিচিত বিদেশির ওপর সে নির্ভর করে কোন্ ভরসায়?

জংলাবাটিক পাঞ্জাবির গলার বোতামটা পর্যন্ত আটকে নিল তৃষ্ণা,—কিছু যদি মনে না করো, আমাকে শুধু নদীর কাছে পৌঁছে দাও। তারপর আমি একা একাই খুঁজে নিতে পারব ঠিকানা। এমনভাবে কথাটা বলল তৃষ্ণা যেন একমাত্র নদীকেই শুধু বিশ্বাস করা যায় দুনিয়ায়।

দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে নদীপার। তৃষ্ণা শিশুর মতো সেদিকে ঝাঁপিয়ে যেতে চাইল। ওই তো ইগলের পাথরমাথা। ছায়া ছায়া অন্ধকারেও দেখা যায় ব্রিজ।

তৃষ্ণার ব্যস্ততা দেখে মার্সেলো শব্দ করে হেসে উঠল,—আরে, আরে, ওটা তোমার ব্রিজ নয়। নদী ধরে সোজা চলে যাও, আরেকটা ব্রিজ পাবে। সেটাও তোমার নয়। তারপর আরও গেলে আরেকটা, সেটাও তোমার নয়। এভাবে একটা দুটো তিনটে চারটে করে তবে নবম ব্রিজ তোমার। সেখান থেকে বাঁদিকে গেলে ভিয়া-দেলা-ফ্রেমিংজিয়া, তোমার মোটেল...

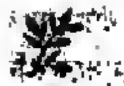
ছি ছি, এই ছেলেটাকেই অবিশ্বাস করছিল! তৃষ্ণার মন গ্লানিতে ভরে গেল। কোথাকার মানুষ কোথায় যে কাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। কতটুকুই বা বোঝে মানুষ মানুষকে। নিজেই এগিয়ে মার্সেলোর হাতে হাত রাখল তৃষ্ণা,—থ্যাংক ইউ মার্সেলো। তোমাকে আমার মনে থাকবে চিরদিন।

মার্সেলো চলে গেলে তৃষ্ণা আবার হাঁটা শুরু করল। এবার নদীকে সঙ্গে নিয়ে। রাত ঘন হচ্ছে ক্রমশ। ক্ষীণাঙ্গী টাইবারের কোলে ছোট্ট ছোট্ট কাচের নৌকো খেলনার মতো দুলছে। স্ট্রিট লাইটের হলুদ আলোয় নদীতীর যেমন হয় তেমনই রহস্যময়। পাশের পাথুরে রাস্তা বেয়ে অবিরাম ভেসে যাচ্ছে গাড়ি, বড় দীর্ঘশ্বাসের মতো। সার সার পর্ণমোচী বৃক্ষে টুকরো অন্ধকার। দু-একটা প্রেমিক প্রেমিকা ঘনিষ্ঠভাবে হাঁটছে। একজন বৃদ্ধ নিস্তব্ধ বসে একা বেঞ্চিতে। মাঝে মাঝে মাটির নীচে নেমে যাচ্ছে রাস্তা। আবার উঠে আসছে পৃথিবীতে।

তৃষ্ণা দ্বিতীয় ব্রিজ পার হল। তৃতীয় ব্রিজ। চতুর্থ। এতক্ষণের উদ্বেগ আর ক্লান্তি এবার মন থেকে নেমে আসতে চাইছে কোমরে, পায়ে। প্লেনে ওঠার তিনদিন আগে তিন্নিকে নিয়ে যেদিন চলে এল যাদবপুর থেকে মানিকতলায়, সেদিনও বুঝি এভাবেই ভেঙে পড়ছিল শরীর। জীবন মাঝে মাঝে কেন যে এত ভারী হয়ে যায়!

দূর থেকে নবম ব্রিজ দেখা যাচ্ছে। চারদিক শুনশান এখন। হালকাভাবে ঠান্ডা বাতাস বইছে। চাঁদ উঠেছে ভ্যাটিকান সিটির আকাশে। মহাশূন্যে ঝিকঝিক অসংখ্য তারা।

তৃষ্ণা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। আর একটুও এগোতে ইচ্ছে করছে না। চোখের পাতা ভিজে উঠছে বার বার। নিজের অজ্ঞাতেই। এই চাঁদ, আকাশ, তারা, সবই এত চেনা তবু কেন তাদের অচেনা মনে হয় কোনও কোনও মুহূর্তে! কেন পৃথিবীটাই হয়ে যায় অজানা গ্রহ! ঠিকানা খুঁজতে মাথা খুঁড়তে হয় তখন! তাও শেষ পর্যন্ত যা পাওয়া যায় তা তো মোটেল লে-পিন, শুধুই দুরাতের সরাইখানা!...কিংবা যাদবপুরের বাড়ি...! কিংবা মানিকতলার...!



কোনো একদিন



ক'দিন ধরেই ভাঙো ভাঙো অবস্থায় ছিল। স্নান সেরে এসে পরতে গিয়ে মুট করে ভেঙে গেল ডানদিকের ডাঁটিটা। কালও সন্ধেবেলা একবার চশমাটা সারিয়ে নেবার কথা ভেবেছিল অনিরুদ্ধ। এক হাতে ভাঙা ডাঁটি, অন্য হাতে বাকি অংশটা ধরে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে পড়ল সে। দশ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে বাস না ধরতে পারলে কিছুতেই এগারোটার আগে ডালহাউসি পৌঁছোন যাবে না। এদিকে চশমা ছাড়া সে একরকম অচলই। সাধারণত যাদের চোখের অবস্থা এরকম, তারা ডুপ্লিকেট একটা করিয়ে রাখে। বহুদিন ধরেই আরেকটা নতুন করিয়ে নেবার কথা ভাবছে অনিরুদ্ধ। আজ এই রকম একটা মুহূর্তে ওটা ভেঙে যাবে কল্পনাতেও আসেনি।

প্রথমটা তাই কেমন থতমত খেয়ে যায় অনিরুদ্ধ। কয়েক সেকেন্ড। তারপরই হতভম্ব ভাবটাকে ছিটকে দিয়ে একটা অদ্ভুত সংকেত খেলে যায় তার মাথার ভেতর। সকাল থেকে বুকে জমে থাকা চাপ চাপ অস্বস্তি নিমেষে উধাও। সে পরিষ্কার টের পায় এ চাকরিটাও তার হবে না।

—এমা, চশমাটা ভাঙলি কী করে? মা ঘরে ঢুকে আর্তনাদ করে ওঠেন।

অনিরুদ্ধ অপ্রস্তুত ভাবে হাসে।

—সর্বনাশ, কি হবে এখন? মা'র চোখমুখ কাঁদো কাঁদো পলকে। অনিরুদ্ধর মনে হয় তার শরীর থেকে এক্ষুনি হাত বা পা খসে পড়তে দেখলেও বুঝি এতটা ভেঙে পড়ত না মা। ভাঙা ডাঁটিটা চোখের খুব কাছে এনে পরীক্ষা করে। নাঃ, কিছু করা যাবে না। একেবারে গোড়া থেকে গেছে।

—চশমা ছাড়া পরীক্ষা দিতে যেতে পারবি তুই? মা ব্যস্তভাবে তার বুকে হাত রাখেন। হাতের মুঠোয় প্রতিবারের মতোই কিছু ফুল-বেলপাতা।

বুকের ওপর মায়ের হাতের কাঁপুনি দেখতে দেখতে সে ম্লান হাসে, এ চাকরিটা আমার হত না মা।

মা ছিটকে সরে যান। কান্না-ভেজা মুখ পলকে শুকিয়ে খটখটে, —তার মানে তুই আজ যাবি না?

অনিরুদ্ধ আবার গভীর মনোযোগে চশমার ডাঁটি পরীক্ষা করে।

—সুরেনকে আমি মুখ দেখাব কি করে? চিৎকার করতে গিয়ে মার স্বর ভেঙে আসে।

কয়েক মুহূর্ত আগের সেই অদ্ভুত সংকেতটা এখনও অনিরুদ্ধর ভেতর টরেটক্কা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ ব্যাপারটা এখন মাকে বোঝাতে গেলেও তিনি বুঝতে চাইবেন না। সে তাই এখন মা'র কথার কোনো উত্তর না দেওয়াটাই সমীচীন মনে করে। নির্দ্বিধায় গিয়ে শুয়ে পড়ে চৌকিতে।

মা ফেটে পড়েন, ছি ছি, লজ্জা করে না তোর? বাপ-মরা বোনটা মুখের রক্ত তুলে চাকরি করে খাওয়াচ্ছে, তোর কি এতটুকু বিবেক নেই? মানঅপমান নেই?

পুরোনো খোঁচা। অন্যান্য দিন শুনলে প্রচন্ড রাগ হয়। কিন্তু এই মুহূর্তে সে টের পায় ও ধরনের কথা শুনেও তার কিছুই মনে হচ্ছে না। সে খুব নির্বিকার ভাবে ভাবতে চেষ্টা করে খুকুর বদলে আজ সে চাকরিটা পেলে মা ঠিক এভাবেই খুকুকে খোঁচাতেন কি না।

—তুই তবু শুয়ে থাকবি?

না। ভদ্রমহিলার সামনাসামনি এখন আর থাকা যাবে না। অনিরুদ্ধ খুব ধীরেসুস্থে উঠে বসে। ছিটকিনি খুলে বাইরে বেরিয়ে আসার মুখে শুনতে পায় মার কঠিন গলা পলকে মমতায় ভিজে গেছে। ছেলের পেছনে আসতে আসতে তিনি গাঢ় গলায় বলে চলেছেন,—রাগ করে চললি কোথায়? পরীক্ষাটা দিতে যাস বাবা। একটু কষ্ট করে দিয়ে আয়।

বাড়ির বাইরে গিয়েও সে মা'র গলা শুনতে পায়। ত্রেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর উদ্দেশে প্রাণপণে প্রণাম জানিয়ে চলেছেন। অনিরুদ্ধর বুকটা ঈষৎ চিনচিন করে।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে চশমা নামক দু টুকরো কাচ যে তার জন্য কী পরিমাণ জরুরি তা আবার টের পায় অনিরুদ্ধ। চোখ দুটো আপনা থেকে কুঁচকে ছোট হয়ে আসে। আলো সইয়ে নিয়ে সে দু-চার পা এগোয়। অসম্ভব হালকা হালকা লাগছে মাথাটা। নিজের শরীর নিজের কাছে আলগা পলকা যেন। একটু থমকে দাঁড়ায়। কেন এমন হচ্ছে? এটা কি ইন্টারভিউ বা পরীক্ষা নামক অকারণ উদ্বেগটা কেটে গেল তাই? নাকি একান্তই সেই একজোড়া কাচের অভাব? বেরোনোর সময় চশমাটা চৌকির ওপরই ফেলে এসেছে। নিয়ে আসার জন্য পেছন ঘুরেও মত বদলায়। দেখাই যাক না, একদিন চশমাবিহীন ঘুরে বেড়াতে কেমন লাগে। তাছাড়া শুধু শুধু ওটা নিয়ে বেরিয়েই বা লাভ কী? সারাতে গেলে পাঁচ-ছ টাকার ধাক্কা। একটা টিউশনির টাকা আজ সন্ধেবেলা পেলেও পাওয়া যেতে পারে। বাকি দুটোর টাকা দিতে বড় দেরি করে। প্রায়ই মাসের মাঝামাঝি টেনে নিয়ে যায়। অবশ্য তেমন হলে খুকু বা মা'র কাছে চাইলে পাওয়া যায়। কিন্তু পারতপক্ষে বোন বা মা'র কাছে হাত পাততে ইচ্ছে হয় না। এই অস্বস্তিটা বছর কয়েক আগেও ছিল না। আজকাল হয়। এমনকি রূপার কাছেও ইদানীং সে মুখ ফুটে কিছু চাইতে পারে না।

গলির মুখে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে সে। মোড়টা ঘুরলেই রূপাদের বাড়ি। সেদিকে না ঘুরে অন্যদিকে হাঁটা শুরু করে। কিছুদিন অবধি রূপার ধারণা ছিল অনিরুদ্ধর একটা কিছু হয়ে যাবেই। এখন নিজেই চাকরির চেষ্টা করছে। খুকুর মতো হয়ত পেয়েও যাবে। সে চাকরি না করে রূপা তার বদলে রোজগার করে আনছে, ভাবলে কেন যে তার এত কষ্ট হয়! আসলে তার কিছু মৌলিক যন্ত্রণা আছে। রূপার সঙ্গে মানসিক বোঝাপড়া থাকলেও, এ ব্যাপারে তার যন্ত্রণার মূল উৎসটা কোথায় তা কোনোদিনই রূপা খুঁজে পেতে পারে না। অসম্ভব।

অনিরুদ্ধ এখন খুব ধীরে সুস্থে হাঁটছে। চোখের সামনে মাকড়সার জালের মতো ঝাপসা ভাব। নিজের অজান্তেই দুটো হাত বার বার উঠে আসছে বুকের মুখোমুখি। অন্ধ মানুষ যেভাবে হাতড়ে হাতড়ে পথ চলে অনেকটা সেই ভঙ্গি। সামনের ঘরবাড়ি মানুষজন সব কিছুর ওপর একটা

পাতলা সর। সে লক্ষ করে হাঁটার সময় তার পা দুটো অনেকটা উঁচু হয়ে উঠে তারপর পড়ছে রাস্তার ওপর। চাঁদের ওপর মানুষের পা ফেলে হাঁটার মতন। নীচের বাঁধানো ফুটপাথের দিকে চকিতে একবার চোখ রেখেই আকাশের দিকে মুখ তোলে। রাস্তা নীচে নেমে গেছে, না সে নিজেই লম্বাটে হয়ে গেছে বুঝে উঠতে পারে না। আকাশও অন্য দিনের চেয়ে আজ অনেক বেশি উঁচুতে। শরতের ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘগুলো বড় ধ্যাবড়া, পাঁশুটে। দুহাতে চোখের কোলে জমাট কিছু ঘন জলবিন্দু মুছে নেয়। একটা সিগারেট খাওয়া দরকার। চটপট পকেটের অবস্থাটা হিসেব করে ফেলে।

—চারটে সিগারেট দে তো।

ছোট্টু মোটা কাচের বয়ামে কালো লাল লজেন্স সাজাতে ব্যস্ত। আড়চোখে অনিরুদ্ধকে একবার দেখে নিয়েই হাঁক মারে, এই বাবু কি চাইছে দ্যাখ।

ছোট্টু তাকে চিনতে পারেনি। নইলে এতক্ষণে বকবকানি আরম্ভ হয়ে যেত। সে লক্ষ্য করে ছোট্টু খালি প্যাকেটে সিগারেট ভরতে ভরতে হাঁ করে দেখছে তাকে। যেন খুব চেনা চেনা, চিনতে পারছে না।

হঠাৎ ব্যাপারটা ভারি মজার লাগে অনিরুদ্ধর। একটু আগের ঘুণ ধরা মেজাজ নিমেষে উধাও। চশমা ছাড়া এরা কেউই তাকে দেখেনি বা দেখে না। ছোটবেলা থেকে চশমা পরে পরে তার মুখের আদলটাই একধরনের হয়ে গেছে। এখন অন্যরকম লাগতেই পারে। এই ব্যাপারটা, মানে চশমা ছাড়া তাকে কেমন লাগে, আদৌ চেনা যায় কিনা, এ ধরনের মজার ভাবনা একটু আগেও তার মাথায় আসেনি। আরেকটু নিশ্চিন্ত হবার জন্য সে গলা খাঁকারি দেয়,—এই ছোট্টু, একটা লজেন্স দে তো।

ছোট্টু মুখ তুলে কিছুক্ষণ অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। তারপর বোকা বোকা মুখে বলে, আরে অনিদা না? তোমার চশমা কোথায় গেল?

দু গাল ছড়িয়ে হাসে অনিরুদ্ধ, খুব চমকেছিস?

—সত্যি অনিদা। চশমা ছাড়া একদম তোমায় চেনা যায় না। কেউ চিনতে পারবে না।

অনিরুদ্ধর চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে, একদম চিনতে পারবে না? অন্য কেউ ভাববে?

হলদে দাঁত বার করে হাসে ছোট্টু, কিছুক্ষণ ভালোভাবে দেখলে অবশ্য চেনা যাবে। হঠাৎ চেনাই যায় না।

কৌতুকটা খুব মনে ধরে অনিরুদ্ধর। ফুর্তি ফুর্তি মেজাজে সে অনেকটা দূর হেঁটে চলে যায়। রূপা আজ তিনটের সময় মেট্রোর সামনে আসবে। গত মাস থেকে মোটা টাকার টিউশনি পেয়েছে। কাল মাইনেও হয়ে গেছে। সেই খাতিরে আজ তাকে এসপ্লানেডে খাওয়াবে। বেদম হাসি পায় অনিরুদ্ধর। রূপা যদি আজ তাকে চিনতে না পারে? অন্য কেউ ভাবে? দারুণ হবে।

চোখের কাছে কবজি তুলে সে ঘড়ি দেখে। সবে এগারোটা কুড়ি। এতটা সময় কী করা যায়? কোনো বন্ধুবান্ধবের কাছে যাবে? নীলুর অফিসে গিয়ে তিনটে অবধি কাটিয়ে দেওয়া যায়। সরকারি অফিস। আড্ডা দেওয়ার অসুবিধে নেই। প্রথমে দেখা যাক, নীলু তাকে চিনতে পারে কিনা।

এগোতে গিয়ে পিঠের ওপর আলগা থাপ্পড়,

—কি রে বাচ্চু? এ পাড়ায় এসে ঘুরে বেড়াচ্ছিস? অফিস নেই?

অনিরুদ্ধর সমবয়সি একজন। একেবারে মুখোমুখি দাঁড়ানোর জন্য ছেলেটার মুখ ভালোভাবে দেখতে একটুও অসুবিধে হয় না। নাঃ, কস্মিন কালেও দেখেনি। চকিতে মনস্থির করে নেয়। তারপর অনায়াসে ছেলেটার কাঁধে হাত রেখে, কেমন আছিস বল?

—ভালোই। তোর খবর কি? অনেকদিন আড্ডায় আসিস না।

কি আশ্চর্য! তার মতো চেহারার আরেকজন তাহলে আছে যাকে তার বন্ধু এক হাত কাছ থেকেও চিনতে ভুল করে? অনিরুদ্ধর মনে হয় ছেলেটার ভুল ভাঙিয়ে দেয়। কিন্তু নিজেকে একবার বাচ্চু বলে স্বীকার করে ফেলায় সাহসে কুলোয় না। একটা ডবল-ডেকার এসে স্টপে দাঁড়িয়েছে। ছেলেটাকে আর কিছু বলা বা করার সুযোগ না দিয়ে সে বাসে উঠে পড়ে, কাল থাকিস। যাব।

চশমা না থাকায় তার একটাই অসুবিধে হচ্ছে। একটু দূরের কোনো কিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ এই অসুবিধেটাই দারুণ ভালো লেগে যায় তার। বাসটা বেশ ফাঁকা। সামনে এগিয়ে বসার সিটও পেয়ে যায়। গোলপার্ক ঘুরে বাস সাদার্ন অ্যাভিনিউতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গতি বেড়েছে।

ফাঁকা রাস্তায় তেজি ঘোড়ার মতো ছুটে চলেছে বাস। বাঁদিকে অলসভাবে পড়ে থাকা লেকের নরম শরীরে চোখ বোলাতে বোলাতে মনটা তার ফুরফুরে হয়ে যায়।

রাসবিহারীর কাছাকাছি আসতেই পেছন থেকে এক ভদ্রলোক টোকা দেন পিঠে, এই যে দাদা, ওই ভদ্রমহিলা আপনাকে ডাকছেন।

সে প্রথমটা অবাক হয়। ভদ্রলোকের পাশ দিয়ে ঝুঁকে কোণাকুণি লেডিজ সিটের দিকে তাকায়।

—কি রে খোকন, তোর মা কেমন আছে? জলপাইগুড়ি থেকে ফিরেছে?

ভদ্রমহিলার মুখ এতদূর থেকে আবছা আবছা। আন্দাজ করা যায় মায়েরই বয়সি। সুখী সুখী চেহারার গোলগাল ভদ্রমহিলা তার দিকে তাকিয়েই পরম আত্মীয়ের হাসি হাসছেন।

খেলাটা আস্তে আস্তে জমে উঠছে মনে হচ্ছে। অনিরুদ্ধ আরও ঝুঁকে সুন্দর বিনয়ী হাসি ফোটায় মুখে—হ্যাঁ। মা ভালোই আছেন। আপনারা সব ভালো তো?

—এই কেটে যাচ্ছে। তোর মাকে একদিন আসতে বলিস। অনেকদিন দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। তোর বাবার শরীর ভালো তো?

অনিরুদ্ধ নিখুঁত ঘাড় নাড়ে। ভদ্রমহিলা কোলের ওপর পড়ে থাকা কৌটো খুলে পান মুখে পোরেন। অনিরুদ্ধ সেই ফাঁকে চিন্তা করে নেয়, খোকন নামক ব্যক্তিটি এই ভদ্রমহিলাকে কি বলে ডাকতে পারে। মাসিমা? না পিসিমা? মায়ের বন্ধু বলেই মনে হচ্ছে। বোন-টোনও হতে পারে।

জানলা দিয়ে পানের পিক ছুঁড়ে মুখ খোলেন ভদ্রমহিলা— হ্যাঁ রে দিদির কি হল? ছেলে না মেয়ে?

আচ্ছা মুশকিল। বাসসুদ্ধ লোক হাঁ করে কথা শুনছে। ভদ্রমহিলার পাশে বসে থাকা একটি মেয়ে তো প্রশ্ন শুনে রীতিমতো মুখে আঁচল চাপা দিয়েছে। ভারি ঝামেলায় পড়া গেল তো খোকনের মা'র বান্ধবীকে নিয়ে।

—ছেলে হয়েছে। নির্বিকার মুখে উত্তরটা দিয়েই উঠে দাঁড়ায় অনিরুদ্ধ। আর বসে থাকা যায় না। বাস হাজরা, হরিশ মুখার্জি রোডের কাছাকাছি এখন। নামতে গেলে ওই খোকনের মা'র বান্ধবীর সামনে দিয়েই নামতে

হবে। উপায় নেই। সে তাড়াতাড়ি দরজার কাছে চলে আসে, আমি এখানেই নামব।

ভদ্রমহিলা এক গাল হাসেন, আয়। মাকে নিয়ে একদিন আসিস আমাদের বাড়ি, কেমন?

রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিজের মনে হেসে ফেলে অনিরুদ্ধ। এখনও নিজেকে কেমন খোকন মনে হচ্ছে। সে প্রথমটা ভেবেছিল তাকে লোকে অনিরুদ্ধ বলে চিনতে পারে কিনা পরীক্ষা করবে। এখন অচেনা লোকরাই তার মুখে চেনা লোকের আদল পাচ্ছে। বেশ নাটকীয় হয়ে উঠছে ব্যাপারটা।

হাজরা বাস স্টপে একজন ভীষণ গোমড়ামুখো লোক বার বার নাকমুখ কুঁচকে নিজের প্রয়োজনীয় বাসটা আসছে কিনা দেখছেন। হঠাৎ ভদ্রলোকের সঙ্গে মজার খেলাটা খেলার ইচ্ছে জাগে অনিরুদ্ধর। তার মতো দেখতে বাচ্চু বা খোকন যদি থাকতে পারে এই শহরেই, তব ওই ভদ্রলোকের মতো আরেকজন থাকবে না কেন? সে ভদ্রলোকের গা ঘেঁসে দাঁড়ায়, আরে পঞ্চুদা না? কেমন আছেন?

ভদ্রলোক ভয়ংকর বিরক্তিতে ঘুরে তাকান, আপনি ভুল করছেন। আমি আপনার পঞ্চুদা নই।

—ধ্যাঃ; হতেই পারে না। ঠাট্টা করছেন। নিজের রসিকতায় এবার নিজেই মুগ্ধ অনিরুদ্ধ, আমায় চিনতে পারছেন না? আমি মন্টু।

গোড়ালি উঁচু করে বাস আসছে কিনা দেখছেন ভদ্রলোক, না মশাই। বলছি তো আমি পঞ্চু-ফঞ্চু নই।

ভদ্রলোকের কোথাও যাওয়ার বিশাল তাড়া আছে বোঝা যাচ্ছে। মুখে কপালে হাজার চিন্তার কাটাকুটি। এক লাখ সমস্যায় ডুবডুবু ছাপোষা মধ্যবিত্ত মানুষের চেহারা।

না। ঠিক জমবে না। ভদ্রলোকের ওপর অনিরুদ্ধের করুণা হয়। তার মতো করে খেলাটার রস গ্রহণের ক্ষমতা নেই মানুষটার। নইলে কিছুক্ষণের জন্য হলেও নিজেকে হালকা করতে পারতেন।

একটা বেজে বারো মিনিটে ধর্মতলার মোড়ে পৌঁছে যায় অনিরুদ্ধ। এখনও ঘণ্টা দুয়েক কাটাতে হবে। চশমা ছাড়া হাঁটাচলা করতে এখন আর তেমন অসুবিধে হচ্ছে না, বরং ভালোই লাগছে। নতুন নতুন মনে হচ্ছে

সব কিছু। নিজেকেও। আবছা আস্তরণ ভেদ করে দেখার দরুন কলকাতার এই মধ্যমণি অঞ্চলটি আজ তার কেমন মায়াময় লাগে। মেট্রোর ফুটপাথ ধরে মানুষের ভিড় সাঁতরে হেঁটে বেড়াতে দারুণ রোমাঞ্চ জাগে তার। একটু দূরের যা কিছু সব যেন ফিনফিনে মসলিনে ঢাকা। শুধু একদম কাছাকাছি দু এক হাতের মধ্যে অস্পষ্টতা নেই। জনসমুদ্রে নিজেকে একটা ছোট দ্বীপ মনে হয় তার। নিজেকে এবং নিজের কাছাকাছি পরিমন্ডলকে ঘিরে কেমন একটা আত্মীয় পরিবেশ রচনার অনুভূতি। সে এই পরিবেশেই বুঁদ হয়ে যেতে চায়। হাঁটতে হাঁটতে নিউমার্কেটের দিকে এগিয়ে চলে। সুবেশা সুগন্ধী তরুণীরা ঝলক আলোর মতো তার খুব কাছাকাছি এসেই অস্পষ্ট হয়ে যায়।

একটা বড়সড় দোকানের সামনে সে খুব কাছ থেকে শো-কেসে ঝোলানো দামি পোশাকগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। দেখতে দেখতে রূপার জন্য, খুকুর জন্য, এমনকী মায়ের জন্যও খুব দামি শাড়ি আলাদা আলাদাভাবে পছন্দ করে ফেলে।

নাকের কাছে সেই সময় আচমকাই টাটকা গোলাপের গন্ধ। অনিরুদ্ধ সচেতন হয়। বুঝতে পারে এইমাত্র তার পাশে একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল। খুব ইচ্ছে হয় ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার। কতদিন যে টাটকা গোলাপের গন্ধ পায়নি।

ঠিক এই রকম সময়, তাকে হতবাক করে দিয়ে মেয়েটির ভোরের সানাইয়ের মত মিষ্টি গলার আওয়াজ ভারি সুন্দর ছন্দে বেজে ওঠে—পার্থদা না?

অনিরুদ্ধর বুক টিপ টিপ করতে থাকে। গলা শুকিয়ে খরার খেত। মেয়েটা কি তাকেই ডাকল? কই, আশে পাশে আর কেউ তো নেই?

—পার্থদা না?

মেয়েটি আবার জিজ্ঞাসা করায় অনিরুদ্ধ ভালোভাবে চারধার দেখে নেয়। না, তাকে বলছে। কত আশ্চর্যই না আছে পৃথিবীতে। বাচ্চু বা খোকন ছাড়াও সে এখন এই মেয়েটির পার্থদা হয়ে যেতে পারে। সারা শরীরে কেমন একটা চোরা কাঁপুনি। সে ঘুরে মেয়েটি মুখোমুখি দাঁড়ায়। পরনে খুব হালকা রঙের চুড়িদার কামিজ। গাঢ় মেঘ রং ওড়না ভারি সুন্দর ভঙ্গিতে

বুকের ওপর ছড়ানো। চকচকে কালো দুটো বেণি দুপাশ ছুঁয়ে হাঁটু পর্যন্ত নেমে গেছে। গায়ের রং নরম মাখনের সঙ্গে হালকা লাল মিশিয়ে দিলে যেমনটা হয় তেমনি।

চোখাচোখি হতেই মেয়েটি দুগালে গভীর টোল ফেলে, আমি রিমঝিম। সেই যে মল্লিকপুরে পিকনিকে গিয়ে আলাপ হয়েছিল। বাবাঃ, কতক্ষণ ধরে ডাকছি, যেন চিনতেই পারছ না।

রিমঝিম! কী মিষ্টি নাম। ঝরনার মতো, বৃষ্টির ধারার মতো, একবার শুনলেই যেন ঝিরঝিরিয়ে বয়ে চলে মনের ভেতর।

—তাই তো। আরে, একদম লক্ষ্যই করিনি। হঠাৎ নিজেকে ভুলে নিজের স্বভাব ভুলে অন্য মানুষের মতো, হয়তো বা রিমঝিমের পার্থদার মত হই হই করে ওঠে অনিরুদ্ধ।

—মেয়েদের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে কি দেখছ হাঁ করে? রিমঝিম আরও কাছে সরে আসে।

আঃ, কী ঠান্ডা, স্নিগ্ধ রূপ। কী কোমল মসৃণতা উজ্জ্বল মুখে, শাঁখের মতো গলার খাঁজে। রূপা কিংবা খুকুদের ত্বক কেন এমন হয় না?

—কী দেখছ?

—তোমাকে। তুমি কত সুন্দর হয়েছ। নিজের মুখ থেকে বেরিয়ে আসা অচেনা শব্দগুলো নিজের কানেই মধুর হয়ে বাজে অনিরুদ্ধর।

—তুমি কিন্তু আগের চেয়েও রোগা হয়ে গেছ পার্থদা। আমি তো প্রথমটা ভাবছিলাম অন্য কেউ বুঝি।

অনিরুদ্ধ মনে মনে ছটফট করে ওঠে। না, না রিমঝিম, আমি অন্য কেউ নই। আমি তোমার পার্থদাই।

—কই বললে না কার জন্য শাড়ি পছন্দ করছিলে? বিশেষ কারুর জন্য বুঝি?

নিখুঁত অভিনেতার মতো কাঁধ ঝাঁকায় অনিরুদ্ধ, তেমন বিশেষ কেউ আর এল কই?

—ইস। কী দুঃখ রে। রিমঝিম পাতলা ঠোঁট দুটো মেলে দেয়।

কী সুন্দর নরম হালকা গোলাপি ঠোঁট। ও কি কোনো রং লাগিয়েছে? না সত্যিই ও দুটো গোলাপ পাপড়ি? অনিরুদ্ধর ভারি ইচ্ছে হয় ছুঁয়ে দেখার।

রিমঝিম আলতো করে ধাক্কা দেয়,—থাক, চলো আর শাড়ি দেখতে হবে না। আমার টুকটাক কিছু শপিং আছে, যাবে সঙ্গে?

—চলো। মেয়েটার কাঁধে আলতো হাত রেখে খুব সুন্দর করে হাসে অনিরুদ্ধ।

রূপসী নিউমার্কেট তার নিজস্ব ঐশ্বর্য আর রঙ নিয়ে ঝলমল করছে। কিছু দেখে না, কাউকে দেখে না অনিরুদ্ধ। চোখ ভরে শুধু রিমঝিমকেই দেখে যায়। আলো আর রং ছড়িয়ে সরে যায় দোকানের পর দোকান। সেই সব মদির রঙের ভেতর পরির মতো ভেসে বেড়ায় তার স্বপ্নের রাজকন্যা।

ঘণ্টা দুই সময় যে কোথা দিয়ে চলে যায়! এক সময় রিমঝিম বলে, আমি এবার ফিরব পার্থদা। বিকেলে এক বন্ধুর জন্মদিনে নেমন্তন্ন আছে। যেতে হবে। তুমি একদিন চলে এসো না আমাদের বাড়ি।

—খুঁজে পাব না যে। অলৌকিক স্বপ্নের ভেতর থেকে কথা বলে ওঠে অনিরুদ্ধ।

রিমঝিম ঝরনার মতো হাসে, ফোন কোরো তাহলে। তাছাড়া অলকদা তো চেনে। অলকদাকে নিয়ে একদিন চলে এসো।

মন-পাগল-করা কিছু গন্ধ অনিরুদ্ধর কাছে গচ্ছিত রেখে মিনিবাসে উঠে যায় রিমঝিম।

তিনটে বারো। মেট্রোর কাছাকাছি আপন মনে দাঁড়িয়ে থাকার সময় অনিরুদ্ধ লক্ষ্যই করেনি এখন রূপা একেবারে সামনাসামনি এসে দাঁড়িয়েছে।

আঁচল তুলে ঘাম মোছে রূপা, কতক্ষণ এসেছ? বাবাঃ দুপুরবেলা বাস পাওয়ার যা ঝামেলা।

অনিরুদ্ধ সামনের হোর্ডিং-এর দিকে তাকিয়ে থাকে। তাকিয়েই থাকে।

—কী হল? রাগ করেছ? আসার সময় তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। মাসিমা বললেন চশমা ভেঙে গেছে বলে তুমি নাকি আর রাগ করে পরীক্ষাই দেবে না ঠিক করেছিলে?

অনিরুদ্ধ এক ঝলক রূপাকে দেখে নিয়েই মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

—কি বাচ্চা ছেলে রে। মার কাছে বকুনি খেয়ে এখনও ঠোঁট ফুলিয়ে আছে।

এবার রূপার দিকে সোজাসুজি তাকায় অনিরুদ্ধ, আপনি কি আমায় কিছু বলছেন।

—মানে? রূপার চোখ গোল গোল হয়ে ওঠে।

—আপনি যাকে ভাবছেন আমি সে নই। ভুল করছেন। গট গট করে রূপাকে ফেলে এগিয়ে যায় সে।

রূপা পেছন পেছন আসতে থাকে, এই, কী ছেলেমানুষি করছ? দাঁড়াও।

অনিরুদ্ধ জোর পা চালায়।

—যেও না, শোনো। এই দ্যাখো, আসার সময় তোমার চশমা আমি সারিয়ে এনেছি। পরে নাও লক্ষ্মীটি। হোঁচট খেয়ে পড়বে যে।

আরও জোরে পা চালায় অনিরুদ্ধ। রূপা নাছোড়বান্দার মতো তার চশমাটা হাতে নিয়ে পেছন পেছন আসছে। একদম ফিরে তাকায় না। এই মুহূর্তে তার অনিরুদ্ধ হওয়ার ইচ্ছে নেই। সে রিমঝিমের পার্থদা হতে চায়। নিদেনপক্ষে সেই খোকন কিংবা বাচ্চু। তাও না হলে অন্য যে কেউ। অশোক, অমল, নির্মল যে কেউ।

অনিরুদ্ধ প্রাণপণে ছুটতে শুরু করে।

শাড়ি, রসমালাই এবং বিবাহবার্ষিকী



দুপুরবেলায় হাত খালি হলে খাওয়াদাওয়ার পর একটু নিজের মনে সেলাই ফোঁড়াই নিয়ে বসে শান্তা। কিংবা কোনো বই বা ম্যাগাজিন। ঘুমের অভ্যেস এককালে ছিল। আজকাল শরীর ঝামেলা করে। একটু ঘুমোলেই গা ম্যাজম্যাজ, মাথা ভার, বুক জ্বালা। বুবলার হাফহাতাটা শেষ করে লালটির কার্ডিগান ধরতে হবে। তারপর শুভর পুলওভার। নিজের জন্যও একটা চোলিকাট ব্লাউজ বানানোর ইচ্ছে আছে। ইদানীং সবাই খুব পরছে। অবশ্য ততদিন শীত থাকলে হয়। একসময় ভালো হাত চলত, বিয়ের পর প্রথম শীতে শুভর লালকালো জাম্পারটা তো সাতদিনে শেষ করে ফেলেছিল। তখন সময়ও ছিল অফুরন্ত। সারাদিন একা মনে শুধু সময় নিয়ে নিয়ে নাড়াচাড়া করা। এখন সময় ছুটছে তাড়াখাওয়া কুকুরের মতো। তাল দিতে গিয়ে শান্তা নাজেহাল। দম নেওয়ার আগেই ছোটো পড়িমড়ি করে।

তাতেও যদি ধরা যায় সময়কে। ধরার আগেই পিছলে পিছলে যায়।

ঘুম থেকে উঠেই রান্নাঘর। চা, ভাত, ডাল, তরকারি। শুভ সকালে ভাত খেতে পারে না। তার জন্য রুটি। ছেলেমেয়েদের টিফিন। ওয়াটারবটলের জন্য জল ফুটিয়ে ঠান্ডা করা। শুভ লালটি আগে পরে বেরোয়। লালটির বাস আসে সাড়ে ন'টায়। ওরা বেরিয়ে গেলে বুবলাকে নিয়ে পড়তে হয়। দস্যি ছেলেকে স্নান-খাওয়া করাতেই একগাদা সময়। বেশিরভাগ দিনই স্কুল না যাওয়ার বায়নাক্কা। এর মধ্যেই কাপড় বদলে চুলটুল ঠিক করে শান্তা। কপালে টিপ লাগায়। ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে ফিরতে ফিরতে বারোটা। এ সময় আরেকবার ঠিকে-ঝিটা আসে, তার সঙ্গে খানিক বকবক শেষে স্নান-খাওয়ার পর এই একটু বিশ্রাম।

হলুদ গোলাটায় বিশ্রী জট পাকিয়ে গেছে। শান্তা একমনে গিঁটগুলো খোলার চেষ্টা করল। মনটা সকাল থেকেই খচখচ করছে। শুভ আজ একটাও কথা বলেনি তার সঙ্গে। বেরোনোর সময়ও না। এমনিতে অবশ্য সকালের দিকে খুব একটা কথা হয় না দু'জনের। আর সময় কোথায়? তবে আজ শুভ ইচ্ছে করেই কথা বলেনি। বাবুর রাগ হয়েছে। ঠিক আছে, কতক্ষণ রাগ থাকে দেখা যাক। শান্তা গায়ে পড়ে কথা বলতে যাবে না। আজকের দিনেও সে যদি মেজাজ দেখাতে পারে, শান্তার কিসের ঠেকা ভাব করতে যাওয়ার? তা বলে গাল ফুলিয়ে বসে থাকলেও তার চলবে না। বিকেলে কত কাজ। বুবলাকে স্কুল থেকে আনার সময় টাকা পনেরোর রসগোল্লা কিনতে হবে। প্রতিবছরই এ দিনটায় রসমালাই বানায়। ঘরে তৈরি রসমালাই শুভর খুব প্রিয়। এ ছাড়া সাবির মাকে দিয়ে মশলা করিয়ে রেখেছে। সন্ধেবেলা গরমগরম কচুরি ভাজবে, সঙ্গে আলুর দম। কেউ না কেউ আজ বাড়িতে আসবেই। দিদি-জামাইবাবু তো প্রতিবছর আসে। আগেরবার নন্দিনীরা এসেছিল। অনিমেষদারও ঠিক মনে থাকে আজকের তারিখটা। সন্ধেবেলা যথারীতি বউদিকে নিয়ে হাজির হবে। সঙ্গে একগোছা ফুল আর মিটিমিটি হাসি।

হলুদ গিঁট আলগা করে সুতো টানল শান্তা। অতগুলো লোক যে বাড়িতে আসবে তার জন্য কোনো মাথাব্যথা আছে শুভর? বিন্দুমাত্র না। শুধু নিজের রাগ নিয়েই ব্যস্ত। সকাল থেকে একবার জিজ্ঞাসা করল না পর্যন্ত। দুনিয়ার লৌকিকতা, সামাজিকতা করার দায় যেন একা শান্তার। উনি দিব্যি মেজাজে টইটুম্বুর হয়ে গটগটিয়ে বেরিয়ে গেলেন। জানে তো বাড়িতে অতিথি এসে পড়লে শান্তা একটা না একটা ব্যবস্থা করবে করবেই।

গোলা সামলাতে গিয়ে কাঁটা থেকে ঘর পড়ে গেছে। গলার ছাঁটটা ফেলে উঠে পড়া যাক। শান্তা কাঁটার মুখে কাঁটা ধরল। রাতের রান্নাও এ বেলা সেরে রাখা দরকার। একটু পর থেকেই তো ধুমধাড়াক্কা, হুটোপুটি। বুবলাকে নিয়ে আসার পর লালটি ফিরবে। ওদের জলখাবার দেওয়া, জামাকাপড় বদলানো। বাইরের লোকজন আসবে, ঘরদোরও সাজাতে হবে একটু। কাশ্মীর থেকে আনা বেডকভারটা পাতলে হয়। পরদাগুলোও পালটালে ভালো হত। যাকগে, বুবলাকে আনার সময় বরং বেশি করে ফুল

কিনে আনবে। গোলাপ, জুঁই, রজনীগন্ধা। ফুলদানিতে চারটি ফুল রাখলে ঘরের চেহারাই বদলে যায়। অন্যান্যবার শুভই সকালে বাজারে থেকে ফুল নিয়ে আসে। আজ যা হাবভাব, বিকেলে তাড়াতাড়ি ফিরবে কিনা তাও সন্দেহ। ছেলেদের বেশ মজা। ইচ্ছে করলে রাগটাগ দেখিয়ে দিব্যি সংসার থেকে সরে থাকতে পারে। শান্তার কোথাও যাওয়ার নেই। এই সংসার চারদিক থেকে তাকে অক্টোপাসের মতো খামচে রয়েছে। আজ যদি সে রাগ করে চলে যায় কোথাও। রাত করে ফেরে। ভাবা যায়। ইসস্, লোকে কি বলবে? লালটি বুবলা তো কেঁদেই সারা হবে। আর শুভ বুঝি বিস্ময়ে পাথর হয়ে যাবে। আসলে এ বাড়ির খাট, আলমারি, দেওয়াল, দরজার মতো সেও একটা অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে গেছে। এ বাড়ির সদর দরজাটার মতো সেও কোথাও নড়তে পারে না। রাগ, দুঃখ, অভিমান সব তাকে চার দেওয়ালে পুষে রাখতে হয়।

দূর, কী সব এতাল-বেতাল ভাবনা। শান্তা সেলাই রেখে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। বোকার মতো চোখে জল আসছে। কোনো মানে হয় না। এত মনখারাপ করার কী আছে? সামান্য কিছু কথা-ছোঁড়াছুঁড়ি, ও তো সবসময়েই হয়। আপনাআপনি আবার মিটেও যায়। আসলে আজকের দিনেও শুভর মুখভার করে থাকাটা শান্তাকে কষ্ট দিচ্ছে বেশি। এ কষ্ট শুধুই তার একার। শুভ যেন দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে। তেমন করে আর কিছুতেই ছুঁতে পারে না শান্তার মনটাকে। বুঝতেই পারে না শান্তা কী চায়। তবে কি আর তাকে আগের মতো ভালোবাসে না শুভ? ধ্যুৎ, তাই বা কী করে হয়? এই তো গত মাসে, তার যখন ধুম জ্বর, শুভ অফিস কামাই করে দু'দুটো দিন বসে রইল বাড়িতে। মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া, ওষুধ খাওয়ানো, বারবার ছোটা ডাক্তারের কাছে। জ্বর ছাড়ার পরও তাকে বিছানা থেকে উঠতে দেয়নি ক'দিন। নিজেই সংসার সামলেছে, অপটু হাতে কাজকর্ম সেরেছে। শান্তা আলগোছে পাশ ফিরে শুল। তবু কেন তার মনে হয়, শুভ অনেক বদলে গেছে? নাকি সে আর নিজেই বুঝতে পারে না শুভকে? একজনের মনকে পুরোপুরি বুঝে উঠতে আরেকজন কি পারে? প্রথম প্রথম চেষ্টা হয়ত থাকে। তারপর শুরু হয় মানিয়ে গুনিয়ে চলা। একসঙ্গে শোওয়া বসার অভ্যেস।

কাল রাতে বারকয়েক প্রশ্নটা ছুঁড়েছিল শুভ। শান্তা তখন শোওয়ার আগে আঁটসাঁট করে চুল বাঁধছে। শুভ নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে বিছানায়। লালটি বুবলা ঘুমিয়ে কাদা।

—এই, কাল কী নেবে বলো।

শান্তা কোনো উত্তর দেয়নি। প্রতিবছর একই প্রশ্নের জবাব দিতে কারু ভালো লাগে? তাছাড়া বিবাহবার্ষিকীর মানে কি শুধুই উপহার আদানপ্রদান? সত্যি সত্যি সম্পর্ক কি তাই? অবশ্য শুভ একেবারে কিছু না দিলেও ভালো লাগবে না শান্তার। একটু মন খচখচ করবেই। সব মেয়েরই বোধ হয় করে। মানুষ প্রিয়জনের কাছ থেকে কিছু পেতেই তো ভালোবাসে সব থেকে বেশি।

প্রথম বছর নিজে থেকেই তার জন্য একটা মুক্তোর সেট এনেছিল শুভ। জিনিসটা দেখতে মন্দ না, তবে সবুজ পাথরগুলো না থাকলে আরও সুন্দর হত। কথাটা জানাতেই শুভর কী আপসোস, —ইস, চলো কালই গিয়ে পালটে আনি!

—থাক না। এটাই বা খারাপ কি?

—তোমার পছন্দ হয়নি

—কে বলছে? শান্তা ওর গলা জড়িয়ে ধরেছিল,—তুমি ভালোবেসে যা দেবে, তাই সুন্দর।

—বলছ?

—হুঁ।

সেবার বেশ-কয়েকজনকে নেমতন্ন করেছিল তারা। ছোট্ট ফ্ল্যাটখানা ফুলে ফুলে একাকার। সবাই চলে যেতে একটা একটা করে ফুল দিয়ে বিছানা সাজিয়েছিল শুভ। ফুলশয্যার রাতের মতো গোড়ের মালা দুটো বালিসে জড়ানো।

—এবার থেকে প্রতিবছর এভাবে বিছানা সাজাব। যতদিন বাঁচব।

শুনে শান্তা হেসে বাঁচে না,—সে কি? বুড়ো হয়ে গেলেও?

—আমরা কক্ষনো বুড়ো হব না। কোনোদিন আমাদের বয়স বাড়বে না।

—বারে, সময় শুনবে কেন?

—সময়ের সঙ্গে ভালোবাসার কোনো সম্পর্ক নেই। সময় যত বাড়ে, ভালোবাসা গভীর হয়।

শান্তা আবার পাশ ফিরল। দ্বিতীয় বছর তাকে কী দিয়েছিল শুভ? ওহো, সেবার তো সে নার্সিং হোমে। লালটি হল। তার পরের বছর ফুলে ফুলে বাড়ি ভরে গেলেও বিছানায় কাঁথা, অয়েল ক্লথ, ফিডিং বটল। এখন তো শুভর জন্য আলাদা সিঙ্গল বেডের ব্যবস্থা। ছেলেমেয়ে নিয়ে শান্তা শোয় বড়খাটে। তার মধ্যেই মাঝে মাঝে এক আধদিন তারা যখন এক বিছানায়, তখন কত সাবধানতা তাড়াহুড়ো। ভাল্লাগে না। সব কিছুই কেমন মেশিনের মতো হয়ে গেছে। শান্তা একাই নয়, শুভও একটা নিয়মে বাঁধা যন্ত্র। কবে থেকে যে জীবনটা এমন হয়ে গেল!

কাল শান্তার উত্তর না পেয়ে শুভ আবার জিজ্ঞাসা করেছিল,—শাড়ি নেবে?

শান্তা চুপ। কী বলবে? এখন বউকে কিছু দেবার ধরনটাও শুভর যান্ত্রিক হয়ে গেছে।

—বলো কী চাও? আমেরিকান ডায়মন্ডের সেট আনব? না ভালো পারফিউম।

বারকয়েক প্রশ্ন করার পর বিরক্ত হয়েছিল শুভ, —তোমার কী হয়েছে বলো তো?

—কী আবার হবে? কিছু না।

—উত্তর দিচ্ছ না কেন?

—এমনি।

এরপর শুভ উঠে সিগারেট ধরাল। সামান্য খোশামোদের চেষ্টা—আরে বাবা, লজ্জা কি, বলেই ফ্যালো না কী চাই?

—কিছু চাই না, শুয়ে পড়ো।

শুভ আস্তে আস্তে ধৈর্য হারাচ্ছিল।

—তোমাদের, মেয়েদের এই এক ন্যাকামো। সোজা কথার সোজা উত্তর দিতে জানো না।

—বাঁকা কী বললাম?

—বাঁকা নয়? সাধারণ একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি...

—দ্যাখো, তোমার সঙ্গে বকবক করতে আমার একটুও ভালো লাগছে না। সারাটা দিন খাটতে খাটতে মুখে রক্ত উঠে যায়, কোনো সময় তো ফিরে তাকাও না। বছরে একদিন আদিখ্যেতা করে আর...

—বুঝেছি। শুভ সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর।—আর কিছু বলতে হবে না।

—সত্যি কথা বললেই গায়ে ছ্যাঁকা লাগে...

এইভাবে কিছুক্ষণ অকারণ কথা-কাটাকাটির পর বারান্দায় বেরিয়ে গিয়েছিল শুভ। শান্তাও তাকে ডাকেনি।

নাহ, আর শুয়ে থাকলে দেরি হয়ে যাবে। শান্তা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ঘর থেকে বেরোতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল আয়নার সামনে। কাল অত কথা না শোনালেই হত। কী যে মাঝে মাঝে হয়ে যায়। মেজাজটাকে কিছুতেই বাগে রাখা যায় না। এরকম চলতে থাকলে...। নাহ, শুভ বাড়ি ফিরলে সে আজ নিজে থেকেই মিটমাট করে নেবে। সন্ধেবেলা একটু সাজগোজ করলে কেমন হয়? শুভ বেশ চমকে যাবে তাহলে। শান্তা নরম করে হাসবে তখন,—এখনও রাগ আছে?

শুভ ঠোঁট ফুলিয়ে তাকাবে বাচ্চা ছেলেদের মতো। শান্তা ওর বুকে হাত রাখবে, —তুমি তো আজকাল নিজে থেকে আমাকে কিছু দাও না। বেশ, আমি আজ নিজেই চাইছি...

শুভ শান্তাকে ছুঁতে গিয়েও হাত সরিয়ে নেবে। তখনও হয়ত দ্বিধা। শান্তা নিজেই ওর হাত তুলে ছোঁয়াবে নিজের বুকে,—শুনবে না কি চাই?

নিশ্চয়ই আর রাগ করে থাকতে পারবে না শুভ। ওকে কাছে টানবে। আর সেই ফাঁকে শান্তা টুপ করে বলে ফেলবে মনের কথাটা,—শাড়ি, গয়না, আসবাব এ সবের মধ্যে বড্ড হাঁপিয়ে উঠেছি গো। আমাকে তুমি আগের দিনের মতো একটা রঙিন দিন উপহার দিতে পারো?

এভাবে শেষ করতে পারলে একটা দারুণ রোম্যান্টিক বিবাহবার্ষিকীর গল্প লেখা যেত। হল না। তার আগেই আমার গল্প থেকে দুম করে উঠে এল শান্তা। খোলা চুল চুড়ো করে মাথার ওপর যেমন তেমন জড়ো করা, ঘাড়ে কপালে তিরতির ঘাম। আটপৌরে শাড়িতে মুখ মুছতে মুছতে হাঁপাচ্ছে—থামুন। বন্ধ করুন আপনার লেখা।

—কেন? কী হল।

—বাহ, আপনার হাতে কাগজ কলম রয়েছে বলে আমাকে দিয়ে যা খুশি করিয়ে নেবেন? এ চলতে পারে না।

—তোমার পছন্দ হচ্ছে না?

—প্রথমটা মন্দ শুরু করেননি। ঝগড়াঝাঁটি, কথাবন্ধ, এমনকী মন খারাপ হওয়া অবধি ঠিকঠাক ছিল। তারপরে একগাদা রোমান্স-ফোমান্স এনে যাচ্ছেতাই রকমের ক্যাতকেতে করে ফেললেন।

—বারে, আমি তোমার মনের কথাই তো লিখতে চাইছিলাম। তোমার ভেতরকার আবেগগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে...

—আবেগ এলেই ওরকম সব ডায়লগ বলতে হবে নাকি? মুখে আঁচল চেপে খিলখিল হেসে উঠল শান্তা, —তাও বিয়ের বারো বছর পরে? ইমপসিবল! আপনার দেখছি কোনো আইডিয়াই নেই।

—কিন্তু একদিন তো এসব ডায়লগই ভালো লাগত।

—যখন লাগত লাগত। সব কিছুর একটা সময় আছে...

—তোমারাই কিন্তু বলেছিলে ভালোবাসার সময় নেই।

—একটা বয়সে সবাই বলে। বাস্তবিক কি তাই হয়? শান্তা হাসি থামাল, উঁহু, আপনার দেখছি ম্যারেড লাইফ সম্পর্কে কনসেপশনই নেই। ওসব মধুর মধুর দৃশ্য ফিল্মে ভালো লাগে কিংবা আপনাদের মতো লিখিয়েদের গল্প উপন্যাসে। প্র্যাকটিক্যাল লাইফে ওরকম কক্‌খনো হয় না। বাস্তব হল সমুদ্রের মতো। যত উচ্ছ্বাস তীরের কাছে। ভেতরে যান, দেখবেন জল ক্রমশ কেমন শান্ত, গভীর...

—তাহলে বলছ মধ্যবয়সে তোমরা আর ওধরনের সংলাপ বলো না?

—বলার দরকার হয় না।

—বিবাহবার্ষিকীর দিনেও নয়? নিশ্চয়ই মানো আজ তোমাদের সম্পর্কটা রিনিয়ুআলের দিন?

—মন্দ বলেননি। শান্তা আমার টেবিলে উঠে বসল,—তবে সম্পর্ক রিনিয়ুআল না বলে অভ্যেস রিনিয়ুআল বলতে পারেন। আমাদের সম্পর্ক আবেগ, আদর, ভালোবাসা সবই খাওয়া-ঘুমোনোর মতো একধরনের অভ্যেস হয়ে গেছে। কিংবা অভ্যেসটাই ভালোবাসা।

—তাই যদি তবে রসমালাই বানাতে গেলে কেন?

—বানালাম। বানাতে হয় তাই। শান্তা ঠোঁট ওলটাল,—তাছাড়া সন্ধেবেলা লোকজন আসবে, তাদের আপ্যায়ন করার জন্য...

—আর শুভর সঙ্গে কাল যে ঝগড়াটা করলে? সকাল থেকে সে কথা বলেনি, মনখারাপ, এও কি হতে হয় তাই?

শান্তা বুঝি থমকাল। সেই সুযোগে নিজেকে গুছিয়ে নিলাম,—তুমি বোধহয় ঠিক বলছ না শান্তা। সবটাই শুধু অভ্যাস হতে পারে না। আমি তো জানি বিয়ের আগে তিনটে বছর, বিয়ের পরও বছর দেড়েক তোমরা কী করেছ। গঙ্গার ধারে সাইত্রিশ দিন, ভিক্টোরিয়ায় ছাব্বিশটা সন্ধে, কাফে-ডি-মনিকোর বাহান্নটা বিকেল, তারপর বিয়ের পর রাতের পর রাত... মনে পড়ে তখনকার কথা? বলতে চাও তার কিছুই অবশিষ্ট নেই?

মুহূর্তে শান্তার গালে আবির ছড়িয়ে দিয়েছে কেউ,—আপনি কি তখন থেকেই আমাদের ফলো করেন নাকি?

—করি বইকি। কাফে-ডি-মনিকোতে তোমরা যখন পরস্পরের আঙুল ছুঁয়ে বসে থাকতে, মনে হত একটা অদৃশ্য তরঙ্গ তোমাদের শরীরে খেলা করছে। গঙ্গার ধারে বসে যখন দুজনে তাকিয়ে থাকতে দূরের জাহাজগুলোর দিকে, কী সুন্দর একটা ভালোবাসার উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ত চারদিকে। বারো বছর একসঙ্গে থাকার অভ্যেসে তার সবটাই...

শান্তা এবার উদাস যেন। শেষ ঢিলটা ছুঁড়লাম,—আজ যদি শুভ ফিরে হঠাৎ তোমাকে আগের মতো করে আদর করে, তোমার কি একটুও ভালো লাগবে না? সত্যি বলো তো?

শান্তা ধীরে ধীরে সামলে নিল নিজেকে,—ভাবতে খারাপ লাগে না। তবে সত্যি বলতে কি ওরকম হয় না।

—কি হয় তাহলে?

—আমাদের পেছনে সব সময়ই তো ঘুরঘুর করছেন। আজও থাকুন। রাত অবধি কী হয় দেখে নেবেন।

অতিথিরা কেউ তখনও আসেনি। শান্তা কাজটাজ সেরে ছেলেমেয়েদের একটু পড়িয়ে নিচ্ছে, ডোরবেল বাজল। শুভ ফিরল হাতে কিছু ফুল আর আর একটা বাদামি প্যাকেট। দরজা খোলার সময় শান্তা আড়চোখে দেখে নিল সেটা। বিকেলবেলা আজ একটু সাজ করেছে। চুল পেঁচিয়ে বাহারি খোঁপা বেঁধেছে মাথায়, মুখে হালকা প্রসাধন, আকাশি নীল তাঁতের শাড়িতে বেশ ঝকমকে দেখাচ্ছে তাকে। চোরা চোখে একবার বউকে দেখে নিয়ে ভেতরে এল শুভ, —কেউ আসেনি?

—নাহ।

—এটা রাখো। পছন্দ হয় কিনা দ্যাখো।

লালটি দৌড়ে এলে,—বাপি, তুমি দেরি করলে? মা বলছিল তাড়াতাড়ি ফিরতে পারো...

দারোগার সামনে পড়া আসামির মতো শান্তার দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলল শুভ। —তাড়াতাড়ি তো বেরিয়েছিলাম। বাসট্রামের যা অবস্থা, তার ওপর আজ তিনটে মিছিল বেরিয়েছে এসপ্লানেডে...

শান্তা নিঃশব্দে রান্নাঘরে চায়ের জল বসাতে গেল।

রাতে ছেলেমেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে, শান্তা যখন ড্রেসিং টেবিলের সামনে, শুভ পাশে এল, —অনিমেষদারা এবার এল না কেন বলো তো?

—কি জানি। শান্তা কাঁটা খুলে চুলের গোছা ছড়িয়ে দিল পিঠের ওপর, —নন্দিনী এবারও এসেছে। ওদের অ্যানিভার্সারিতে কিন্তু যেতেই হবে।

—কবে যেন ওদেরটা?

—দেরি আছে। ডিসেম্বরে। শান্তা পাশের টেবিলে পড়ে থাকা পিয়োর সিল্কে হাত বোলাল।

শুভ ঝুঁকল, —পছন্দ হয়েছে?

—এত দামি কিনতে গেলে কেন? তোমাকে পয়সা কামড়ায়?

—দাম নিয়ে ভাবতে হবে না। কেমন হয়েছে বলো।

—আরেকটু ডিপ পেলে না? রঙটা বড় ম্যাড়মেড়ে...

শুভ গোমড়া হল,—এইজন্যই তোমার জিনিস আমি কিনতে চাই না। কাল অত করে জানতে চাইলাম... অযথা মেজাজ দেখালে।

—মেজাজ তুমি দেখাওনি? শান্তা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বসেছে,—সকালবেলা বাজারটা পর্যন্ত করে দিলে না। এত লোকের আয়োজন, আমি একা একা...

—কথা বললে তখন উত্তর দিতে তুমি? রাত থেকে যা একটা মুখ করে রেখেছিলে। মাঝে মাঝে তোমার মাথায় ভুত চাপে!

—আমার মতো খেটে মরতে হলে দেখতাম কার মেজাজ ঠিক থাকে।

—নিজেই যেচে খাটো। কতদিন থেকে বলছি একটা রাতদিনের লোক রেখে নাও...

শান্তা ফোঁচ ফোঁচ নাক টানল। শুভ সিগারেট নেভাল।

—শোভনা বউদি বলছিল হাতে একটা বাচ্চা মেয়ে আছে। আমি কালই গিয়ে নিয়ে আসব।

—না, না। শান্তা চোখমুখ ঘোরাল।—রাতদিনের লোক মানেই গাদাগুচ্ছের খরচা। কোনো দরকার নেই।

—মনে থাকে যেন। আর এ নিয়ে খোঁটা দিতে পারবে না।

—হ্যাঁ, আমি তো শুধু খোঁটাই দিই। শান্তার ঠোঁট ফুলল, —তুমি কিছু বলো না!

এ প্রসঙ্গ আর বাড়ানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। শুভ কথা বদলাতে চাইল, —তোমাকে আজ সন্ধেবেলা বেশ দেখাচ্ছিল।

—খোশামোদ। শান্তা চুলে চিরুনি চালাল, —রসমালাই কেমন হয়েছিল?

—মন্দ নয়। তবে আজকাল বড় বেশি ভ্যানিলা মেশাও তুমি। আগে আরও ভালো করতে।

—খেয়ে তো নিলে চেটেপুটে! শান্তা ঠোঁট টিপল।

—খেলাম। শুভ ঝুঁকে আচমকা একটু চুমু খেয়ে ফেলল বউকে।

লালটি ঘুমের ঘোরে হাত-পা ছুঁড়ছে। ওর লাথি খেয়ে বুবলা যে কোনো মুহূর্তে জেগে উঠতে পারে। শান্তা হাত বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি আলো নিভিয়ে দিল।

—কি, দেখলেন তো?

—দেখলাম।

—বুঝলেন কিছু?

—মনে হচ্ছে বুঝেছি।

—কচু বুঝেছেন। শান্তা শুভর বিছানা থেকে চাপাস্বরে হেসে উঠল, —যান, এবার কেটে পড়ুন। আজ অন্তত আমাদের কিছুক্ষণ একা থাকতে দিন।

ঘরের ভিতর অন্ধকার যেন অন্ধকার নয়, মাঝসমুদ্রের গাঢ় নীল শান্ত জল। এবার মনে হয় গল্পটা ঠিক ঠিক লিখে ফেলতে পারব।



খাঁচা



দিনটার কোনো পৃথক রূপ ছিল না। একই ছন্দে, একই নিয়মে বিকেল পেরিয়ে সন্ধে এসেছিল। শীতের সন্ধে। অর্কপ্রভ জানত না শুধু তার জন্যেই দিনটা আজ অন্যরকম।

অফিসে বসে রিপোর্টটা আরেকবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছিল অর্কপ্রভ। পার্কার অ্যান্ড স্টিভেনসনের তৈরি প্রোজেক্ট রিপোর্ট, তথ্য আর পরিসংখ্যানে ঠাসা। চা ইস্পাত ফুড প্রোডাক্টস-এর পর এবার অর্কপ্রভদের কোম্পানি হোটেল ব্যবসাতে নামতে চায়। বিদেশি সহযোগিতায়। একই সঙ্গে তিন শহরে। দিল্লি মুম্বই কলকাতা।

অর্কপ্রভর হাতে আর সময় বেশি নেই। থাকেও না কখনও। কাল সকালের ফ্লাইটে দিল্লি পৌঁছেই বিদেশি প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা টেবিল বসতে হবে। লা মেরিডিয়ানে। সঙ্গে চেয়ারম্যান থাকছেন, এম. ডি-ও। কালকের মিটিং ফলপ্রসূ হলে বিদেশিদের সঙ্গে মউ সই হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। তার জন্যেই এই তোড়জোড়। তার জন্যই এই রিপোর্ট খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া। বার বার।

ইন্টারকমে শব্দ বেজে উঠল। অর্কপ্রভর প্রাইভেট সেক্রেটারি ভীরু গলায় ডাকছে,—স্যার।

দুপুরে অর্কপ্রভর ঘরে মিটিং ছিল। তারপর সেই সাড়ে চারটে থেকে লাল আলো জ্বলছে তার চেম্বারের বাইরে। এ সময়ে ফোন দেওয়ারও নিয়ম নেই ঘরে। চেয়ারম্যান বা এমডি-র ফোন ছাড়া। কিন্তু তাঁরা তো দিল্লিতে!

অর্কপ্রভ যথেষ্ট বিরক্ত হল,—কী ব্যাপার?

—ম্যাডামের কল আছে স্যার।

ম্যাডামের কল। চকিতে অর্কপ্রভর চোখ কবজির প্ল্যাটিনাম ঘড়িতে। সাড়ে সাতটা! আশ্চর্য, একটা রিপোর্ট স্টাডি করতে তিন ঘন্টা সময় লেগে গেল! তবে কি অর্কপ্রভর মস্তিষ্ক আজকাল তত দ্রুত কাজ করছে না! নাকি আজ অর্কপ্রভর দিনটাই তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল!

অর্কপ্রভর এই ঘরে অবশ্য 'দিন ফুরোল' বলে কোনও কথা নেই। সত্যি কথা বলতে কি চোদ্দোতলার ওপর এই অফিস-চেম্বারে দিনের তেমন কোনও অস্তিত্বই নেই। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরের জানলা সর্বদা মোটা পরদায় ঢাকা, ঘর জুড়ে শুধুই বিজলিবাতির রোশনাই।

এখানে বারো মাস একই তাপমাত্রা। একই আলো। একই সুরভি।

অন্যমনস্কভাবে অর্কপ্রভ রিসিভার কানে চাপল। কণ্ঠে মাপা আবেগ, —ইয়েস ডার্লিং।

—কী হল তোমার? তুমি কি আজকে খান্ডেলওয়ালের পার্টিতে যাচ্ছ না?

—সরি। ভীষণ ফেঁসে গেছি।

—রাবিশ। আমি সেই কখন থেকে তোমার জন্য ওয়েট করছি.....

—প্লিজ ডার্লিং, তুমি চলে যাও। আমি আসছি। একটু পরে।

—না। গেলে দুজনে একসঙ্গে যাব, না হলে যাবই না।

ওফ, শোভনা হঠাৎ হঠাৎ এমন বাড়াবাড়ি করে। এমনিতে সময় পেলেই মিসেস খান্ডেলওয়ালের বুটিকে গিয়ে হাহা-হিহি চলছে, একসঙ্গে কিটি পার্টি, লেডিজ ক্লাব, আড্ডা কোনও কিছুরই কমতি নেই, আর এখন দুম করে একেবারে....! মেয়েরা পারেও বটে!

অর্কপ্রভ আরেকবার ঘড়ি দেখল, —ঠিক আছে, ওয়েট করো তা হলে। আমি কিছুতেই ন'টার আগে যেতে পারছি না। কালকের ব্যাপারে এখনও অনেকগুলো পয়েন্ট নোট করতে হবে।

—কাম অন ডার্লিং, ও তুমি কাল প্লেনে যেতে যেতে দেখে নিয়ো।

সহজ সমাধান। এতক্ষণ কেন মাথায় আসেনি যুক্তিটা। রিসিভার রেখে ঘুরনচেয়ারে হেলান দিল অর্কপ্রভ। এতক্ষণ টের পায়নি, এখন হঠাৎই বেশ ক্লান্ত লাগছে নিজেকে। চোখ টানছে, ঘাড়ের কাছে একটা মৃদু দপদপ ভাব। প্রেশারটা বাড়ল নাকি!

সাধারণত সন্ধে সাড়ে ছ'টার মধ্যে অফিস ছাড়ে অর্কপ্রভ। বেশির ভাগ দিন অফিস থেকে সোজা ক্লাব। ক্লাবে কোনও দিন টেনিস, কখনও সাঁতার, কখনও বিলিয়ার্ড। সঙ্গে পরিমিত পান, পরিমিত কথা, পরিমিত হাসি। জীবনটাই এখন এক অদ্ভুত পরিমিতির মধ্যে চলে এসেছে। ভোর পাঁচটায় উঠে লেকে জগিং। পঁয়তাল্লিশ মিনিট। ডাক্তারের পরামর্শ মতো ফিরে এক গ্লাস ফ্রুট জুস। কমলা কিংবা আপেলের। আধ ঘন্টা পর এক কাপ সুগন্ধি চা। মার্জারিন দিয়ে দু পিস টোস্ট। একটা ছোট্ট মুরগির ডিমের পোচ। কলা। অথবা পাকা পেঁপে। দুপুরের লাঞ্চে স্যুপ স্যালাড টক দই। কোনও কোনও দিন স্যান্ডউইচ, চিকেন সেদ্ধ, পুডিং। সকালের জগিং থেকে রাতে শুতে যাওয়ার আগে দেড়খানা ঘুমের ট্যাবলেট, সবই নিয়ম আর পরিমাপে বাঁধা। একমাত্র রাতের খাওয়াটাই এখনও বিশৃঙ্খল রয়ে গেছে। অল্প হলেও তখন একটু ভাত চাই। সঙ্গে পাকা বাঙালি মতে মাছ ডাল শাকসবজি। অর্কপ্রভর এই ভেতো অভ্যাসটাকে কেউ কোনও ভাবেই ছাড়াতে পারেনি।

উচ্চ রক্তচাপ নয়। ডাক্তারে সাবধানবাণী নয়। শোভনাও নয়।

অর্কপ্রভ বোতাম টিপে এবার নিজেই ভাস্করকে ডাকল,—ব্যানার্জি, একবার আসবেন।

যতক্ষণ অর্কপ্রভ অফিসে থাকে ভাস্করও ততক্ষণ অ্যান্টিচেম্বারে মজুত। স্মার্ট ঝকঝকে বছর ত্রিশের তরুণ। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সদাসর্বদা তার গলায় টাই-এর ফাঁসটি নিখুঁত। ঠিক যেমনটি অর্কপ্রভ চায়।

অর্কপ্রভ একবার আড়চোখে দেখে নিল ভাস্করকে,—ফিজিবিলিটি চার্টের কপিগুলো রেডি হয়ে গেছে?

—অনেকক্ষণ স্যার। সপ্রতিভ ভাস্কর সঙ্গে সঙ্গে হাতের ফোল্ডার এগিয়ে দিয়েছে, এখানে সব সাজিয়ে দিয়েছি।

—গুড। দিবাকর কোথায়? ওপরে আছে?

—বাইরেই অপেক্ষা করছে স্যার।

—বদরিকে বলুন সব ফাইল আর কাগজ একসঙ্গে গুছিয়ে দিবাকরকে দিয়ে দিতে। আমি এবার বেরোব।

—রাইট স্যার।

—আপনিও এবার চলে যেতে পারেন। মিস জোন্‌সকে ছেড়ে দিয়েছেন তো?

—যেতে বলেছিলাম, যাননি। শি নেভার লিভস বিফোর ইউ স্যার।

—সে কি। এত রাত অবধি। না, না আস্ক হার টু গো।

মুখে কথা না বললেও মনে মনে বেশ তৃপ্তি অনুভব করছিল অর্কপ্রভ। তাকে ঘিরে একটি জগৎ আবর্তিত হয় এই চিন্তাতেও যে কী গভীর সুখ। একটু হাসি হাসি মুখেই উঠে দাঁড়াল অর্কপ্রভ। এবার সে অ্যাটাচড টয়লেটে ঢুকে মুখে চোখে সামান্য জল ছিটোবে, তুর্কি তোয়ালের নরম আরাম চাপবে দুগালে; পাতলা হয়ে আসা ঈষৎ কোঁকড়ানো চুলে আঙুল ডোবাবে। সাদা মারবেল বসানো টয়লেটের একটা দেওয়াল জুড়ে প্রকাণ্ড পেন্টিং, সেদিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকবে কিছুক্ষণ। বিশাল ক্যানভাস জুড়ে সেখানে শুধুই এক রমণীর উন্মুক্ত পিঠ। বাদামি। মাংসল। অল্প বেঁকে থাকা শিরদাঁড়ার সরু গভীর খাত। এই নারীশরীরটিকে অর্কপ্রভ চেনে না। শোভনা ছাড়াও যে কটি নারীদেহ তার চেনা, তাদের একটিও সঙ্গেও মিল নেই ওই রমণীর, অথবা আছে কিনা খেয়াল করেনি অর্কপ্রভ। তবু ওই খোলা পিঠের দিকে তাকিয়ে থাকলে অর্কপ্রভর পঞ্চাশ বছরের শরীরটা টনকো হয়ে ওঠে। ঝপ করে বয়স অনেকটা কমে যায় যেন। ক্লান্তিহীন। ব্যাধিহীন। উৎকন্ঠাহীন। বিষাদহীন। ইন্টিরিয়র ডেকরেটার মেয়েটি কি জেনেবুঝেই অর্কপ্রভর টয়লেটে এই ছবি টাঙিয়েছিল?

ছবি থেকে চোখ সরিয়ে আবার আয়নায় নিজেকে দেখে অর্কপ্রভ। উঁহু, ঠিক নিজেকে দেখে না, দেখে পঞ্চাশের অর্কপ্রভকে। পঁচিশের তরতাজা অর্কপ্রভর চোখ দিয়ে। দর্পণের মানুষটা কেমন যেন গাঁট্টাগোট্টা। একটু হোঁতকা ধরনের। চিবুকের নিচে দ্বিতীয় চিবুক। গালের খাঁজে খাঁজে থলথলে চর্বির আভাস। কুঞ্চিত চুলের ফাঁকফোকরে ছোট্ট ছোট্ট সাদা ঢেউ। দেখতে দেখতে অর্কপ্রভ ফিক করে হাসে একবার। একবারই। ব্যস। ফের গাম্ভীর্যের মুখোশে আড়াল করে ফেলে নিজেকে। অধস্তনদের সামনে সে পারতপক্ষে মুখে হাসি রাখে না। এক চিলতে হাসিকেই ওরা প্রশ্রয় ভেবে মাথার চড়ে বসতে পারে। হাসির জন্যও স্থান-কাল-পাত্র আছে। মাপ আছে। অর্কপ্রভ জানে।

টয়লেটের দরজা খুলে অর্কপ্রভ সোজা বেরিয়ে এল চেম্বার থেকে। বদরিনাথের সেলাম নিল, নিজস্ব দৃপ্ত ভঙ্গিতে পার হল শূন্যপ্রায় অফিস প্রাঙ্গণ। অফিসের বাইরে লম্বা করিডোর, আধো আলো মাখা। রাত-পাহারার জন্য সিকিউরিটির লোকজন এসে গেছে সেখানে, তাদের

দু-একজনের টুকরো অভিবাদন মাথা ঝাঁকিয়ে গ্রহণ করল অর্কপ্রভ। একেবারে লিফটের কাছে পৌঁছে ঘাড় ঘুরিয়েছে। দিবাকর। একটু পিছনে। দিবাকরের কাঁধে অর্কপ্রভর জলের ফ্লাস্ক, এক হাতে ফাইলের বোঝা, অন্য হাতে ব্রিফকেস।

এক ডাকেই স্বয়ংচালিত লিফট এসে গেছে। স্বমহিমায় অর্কপ্রভ প্রবেশ করল লিফটে। সঙ্গে দিবাকর।

লিফট নামছে এবার। দরজায় মাথায় টিপ টিপ জ্বলছে সবজে বাতি। নিবছে। জ্বলছে। তেরো। বারো। এগারো। দশ। লিফট মসৃণ গতিতে নামছে। নামছে অর্কপ্রভ। নামছে সিংহানিয়া গ্রুপের চিফ অ্যাডভাইজার। নয়। আট। সাত। নামছে দিবাকর। অর্কপ্রভ সেনের সারথি।

তখনই ঘটে গেল দুর্ঘটনাটা। সাত আর ছয়ের মাঝখানে। লিফট থেমে গেল। আচমকাই।

দুই

লিফট থেমে গেছে।

তীব্র ঝাঁকুনিটা সামলাতে অর্কপ্রভ সেনের সময় লেগে গেল কয়েক সেকেন্ড। আকস্মিক ধাক্কায় অর্কপ্রভর পা টলে গিয়েছিল, হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল প্রায়, কোনোক্রমে লিফটের দেওয়াল ধরে সোজা রাখল নিজেকে।

লিফটের উজ্জ্বল আলো নিবে পলকে জ্বলে উঠেছে বিপদকালীন বাতি। সেই আলোতে দিবাকরের দিকে নজর গেল অর্কপ্রভর। দিবাকরের হাত থেকে ছিটকে গেছে জরুরি ফাইল, মেঝেতে উবু হয়ে এক হাতে কাগজ কুড়োচ্ছে লোকটা।

অর্কপ্রভ হায় হায় করে উঠল—ইশশ, দিলে তো সব নোংরা লাগিয়ে।

দিবাকর অধোবদন। কিছুতেই সে সব কাগজ একসঙ্গে ব্যাগে আনতে পারছে না। ফাইল তুলতে গেলে কাগজ পিছলে যায়, কাগজ তুলতে ফাইল।

অর্কপ্রভ হালকা ধমক দিল,—আচ্ছা স্টুপিড তো। ব্রিফকেসটা নামাও হাত থেকে। দুহাতে তোলো।

বহু কষ্টে কাগজ ফাইল ব্যাগে এনেছে দিবাকর। বিব্রত মুখে ফ্লাস্কের স্ট্র্যাপও গুছিয়ে নিচ্ছে কাঁধে। ব্রিফকেস হাতে তুলে একটু হেলে দাঁড়াল।

লিফট এখনও গোঁয়ারের মতো অনড়।

হলটা কী। এতক্ষণ কেন আটকে আছে। পাওয়ার গেল। বিদ্যুতের অবস্থা তো আজকাল তত বেহাল নয়। অর্কপ্রভ বিরস মুখে লিফটের দেওয়ালে চোখ বোলালো। এমারজেন্সি বাতির তীব্রতা খুব বেশি নয়, তবু লিফটের অভ্যন্তর দেখতে অসুবিধা হচ্ছিল না তার। বর্গক্ষেত্রাকার কামরা, বড় জোর ছয় বাই ছয়। দরজা দেওয়ালের রঙ ইস্পাতনীল। নিশ্ছিদ্র বন্ধ দরজার পাশে সার সার চাকা বোতাম। জি থেকে ষোলো। পিছন দেওয়ালে টুকরো আয়না। লিফটে ঢুকলে প্রথমেই নিজেকে দেখা যায় সেখানে। সকালে ওঠার সময় ওই আয়নাতে এক সুবেশা যুবতী চুল ঠিক করছিল আজ। দরজার বাঁ দিকে অ্যালুমিনিয়াম প্লেটে লিফট সংক্রান্ত নির্দেশনামা। নিচু ছাদে চার ডানার দুটো পুচকে ফ্যান ডানা মেলে নিথর। কোনায় জড়সড় দিবাকর।

কিন্তু এমারজেন্সি বেলটা গেল কোথায়?

অর্কপ্রভর ব্যস্ত চোখ দেওয়ালে দেওয়ালে ঘুরল আবার,—বেলটা কোথায়? বেল?

দিবাকর নড়েচড়ে উঠল। হাতের বোঝা বুকে চেপে পিটপিট তাকিয়েছে প্রভুর দিকে। মিনমিনে স্বরে বলল,—বেল আপনার মাথার পিছনে স্যার।

—তাই তো!

অর্কপ্রভ সুইচ টিপল। একবার। দুবার। কয়েকবার। শব্দ আদৌ বাজছে কি কোথাও? ছ'তলায়? সাততলায়? ভূমিতে? বোঝা যাচ্ছে না। ঘণ্টার চাবি সজোরে চেপে ধরে রইল খানিকক্ষণ। কান পেতে শোনার চেষ্টা করল। নাহ, সম্পূর্ণ বন্ধ ঘরে বাইরে কোনও তরঙ্গই পৌঁছোয় না।

হতাশ অর্কপ্রভ ঘড়ি দেখল,—স্ট্রেঞ্জ! এখনও জেনারেটার চলল না কেন? পুরো চার মিনিট হয়ে গেল!

দিবাকর ক্ষীণ গলায় বলল,—জেনারেটার তো আজকাল কম চলে স্যার, তাই বোধ হয় চালু করতে সময় লাগছে।

—হোয়াট ডু ইউ মিন? সব সময় জেনারেটার চলে না বলে তার মেনটেনেন্স হবে না? লিফটের জন্য টোয়েন্টি ফোর আওয়ারস একটা আলাদা জেনারেটার রেডি থাকার কথা!

দিবাকর কথা বাড়াল না।

অর্কপ্রভ গজগজ করে চলল,—কালকেই আমি কেয়ারটেকারের এগেনস্টে কমপ্লেন করছি। এরা ভেবেছেটা কী, অ্যাঁ? বিল্ডিং-এর রানিং

মেনটেনেন্স-এর জন্য কম টাকা পে করি আমরা। তার পরও যদি এই ছোটখাটো অ্যামেনিটিসগুলো না পাই....। এত্ত ক্যালাস এসব লোকগুলো। দিব্যি নিচে কোয়ার্টার পেয়েছে, বউ বাচ্চা নিয়ে সংসার করছে, ওদিকে কাজের ব্যাপার বিন্দুমাত্র দায়িত্বজ্ঞান নেই! কিছু বলতে যাও, ওমনি ঝান্ডা নাচাবে। দ্যাখো গে, বাবু হয়ত খেয়ালই করেনি। হয়ত কোনও তাসের আড্ডায় জমে আছে। হয়ত নেশাভাং করে পড়ে আছে। হয়ত এই ভরসন্ধেবেলা.........

অর্কপ্রভ ঝপ করে থেমে গেল। কাকে এসব কথা বলছে সে? তারই এক নগণ্য কর্মচারীকে? ড্রাইভারকে? এমন একটা নিচের তলার লোকের সঙ্গে এত কথা বলা কি সাজে অর্কপ্রভ সেনের!

দিবাকর অবশ্য ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়েই আছে। লোকটা এমনিতেই কথা বলে খুব কম। যথেষ্ট বিনয়ী। শান্ত ধরনের। তার কাজ শুধু সামনে চোখ রেখে গাড়ি এগিয়ে নিয়ে চলা। মালিককে পৌঁছে দেওয়া স্থান থেকে স্থানান্তরে। এরকম চুপচাপ লোকই অর্কপ্রভর পছন্দ। আগে একটা ড্রাইভার ছিল, তুলসী না কি যেন নাম, বড় ফুট কাটত গাড়ি চালাতে চালাতে। কথায় কথায় দেশগাঁয়ের গল্প জুড়ত। খরা বন্যা মাছ জমি আরও কত কী হাবিজাবি। এতটুকু লঘুগুরু জ্ঞান নেই।

তবু এই মুহূর্তে দিবাকরের একদম চুপ মেরে থাকাটাও ঠিক সহ্য হচ্ছিল না অর্কপ্রভর। এরকম একটা খুপরি জায়গায় চকিতে আটকে পড়েছে দুটো মানুষ, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে, একজন একা কথা বলে চলেছে, অন্যজন নির্বাক, অথবা দুজনেই শব্দহীন, ব্যাপারটাই কী অস্বস্তিকর।

অর্কপ্রভ এই প্রথম খুব কাছ থেকে ভালোভাবে নিরীক্ষণ করছিল তার ড্রাইভারকে। পেশিবহুল ডাঁটো চেহারা, অনেকটা অর্কপ্রভর মতনই। মাথাতেও অর্কপ্রভর সমান সমান। বয়সেও। তবে লোকটার কবজি দুটো কী অসম্ভব চওড়া। লোমশ তামাটে হাতে গোল দড়ির মতো শিরা-উপশিরা প্রকট। জলপাই-রং বুশ শার্টের নিচে খয়েরি সোয়েটার। ভি গলা সোয়েটারের ফাঁক দিয়ে নোংরা গেঞ্জি দেখা যাচ্ছে। ভীষণ খর্বাকৃতি গলা। গলা জুড়ে স্বরনালির জমাট ডেলা। চিবুকে হালকা পোড়া দাগ। পোড়া দাগ, না জড়ুল? কপালে পরপর অসংখ্য ভাঁজ। রোজ যে ছায়া ছায়া দিবাকরকে দেখে অর্কপ্রভ, সে যেন হঠাৎই ভীষণভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে সামনে।

কায়িক অস্তিত্ব নিয়ে। অস্তিত্বটা এত প্রখর, এত নিকট, যে হঠাৎ কেমন অস্বচ্ছন্দ বোধ করল অর্কপ্রভ।

সময় কাটছিল। ধীর লয়ে। থেমে থেমে।

লিফটের নড়াচড়ার কোনও চিহ্ন নেই। দিবাকরও একভাবে নিশ্চল। খানিকক্ষণ এদিক ওদিক চোখ ঘুরিয়ে অর্কপ্রভ গলা ঝাড়ল। একটু লঘু স্বরে বলল,—কী? দুশ্চিন্তা হচ্ছে, না?

দিবাকর এতক্ষণ পর মুখ তুলেছে,—না তো স্যার।

—কতক্ষণ আটকে আছ খেয়াল আছে?

—না স্যার।

—তোমার বাড়ির লোক তোমার জন্য ভাবনা করবে না? তার জন্যও তোমার কোনও উদ্বেগ নেই?

—না স্যার।

—দশঅশ মিনিট। পুরো ছশো সেকেন্ড।

—হ্যাঁ স্যার।

—ধরো আরও এক ঘন্টা আটকে রইলে, দু ঘন্টা আটকে রইলে, ধরো এখনও কেউ কোনও খবরই পায়নি। তবু তোমার দুশ্চিন্তা হবে না?

—না স্যার।

—কী তখন থেকে হ্যাঁ স্যার, না স্যার করছ? নতুন করে ধৈর্য হারাচ্ছিল অর্কপ্রভ। বিদ্রূপের স্বরে বলল,—কেন তোমার দুশ্চিন্তা হবে না জানতে পারি?

দিবাকরের ঠোঁটের কোণে ফিকে হাসি ফুটেছে এবারে,—আমার তো স্যার সাড়ে দশটা এগারোটা অবধি ডিউটিই থাকে। বাড়ি ফিরতে আরও রাত হয়। এখন তো স্যার আটটাও বাজেনি।

অর্কপ্রভর ভুরুতে ভাঁজ পড়ল,—কোথায় যেন থাকো তুমি? তোমার মেমসাহেব বলছিল কোথায় একটা নতুন বাড়ি করেছ?

—বাড়ি নয় স্যার। দিবাকর যেন লজ্জা পেল একটু,—ওই মাথা গোঁজার মতন জায়গা। মেমসাহেব কিছু আগাম দিয়েছিলেন, তাই দিয়ে কষ্টে শিষ্টে....। সোনারপুর স্টেশন থেকে অনেকটা ভেতরে স্যার। কামরাবাদের দিকে। সাইকেলে গেলে মিনিট পনেরো লাগে। হাঁটাপথে আধ ঘন্টাটাক।

কামরাবাদ জায়গাটা কোথায় অর্কপ্রভ জানে না। শোভনাই বলছিল

দিবাকর বাড়ি করার জন্য কী সব টাকা ফাকা নিয়েছে। লোকটা অর্কপ্রভর নিজস্ব চালক হলেও কোম্পানিই তার মাইনেটা দিয়ে দেয়। ওভারটাইমও। শোভনা কত টাকা দিয়েছে দিবাকরকে? পাঁচ হাজার? দশ হাজার? মরুক গে যাক, ওসব শোভনার ব্যাপার। সাংসারিক তুচ্ছ বিষয়ে মাথা গলাতে চায় না অর্কপ্রভ।

গলায়ওনি কখনও। তুচ্ছেও নয়, বৃহতেও নয়। ছেলে ঘর বাড়ি চাকরবাকর ড্রাইভার মালি সব মিলিয়ে গোটা সংসারটাই শোভনার দপ্তর। অর্কপ্রভ সেখানে এক সম্মানিত মেহমান।

টাই-এর নট সামান্য আলগা করল অর্কপ্রভ। অল্প অল্প গরম লাগছে। বাইরে ডিসেম্বরের চড়া শীত, তবু এক কণা ঠান্ডাও ঢুকছে না খুপরিতে। আবদ্ধ বাতাস উষ্ণ হয়ে উঠছে ক্রমশ।

দিবাকর বুঝি অর্কপ্রভর অস্বস্তি টের পেয়েছে, নিম্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করল, —আপনার কি কষ্ট হচ্ছে স্যার? জল দেব? খাবেন?

অর্কপ্রভ জোরে জোরে শ্বাস টানল,—না না, আমি ঠিক আছি।

—আরেকবার বেলটা বাজাব স্যার?

—লাভ হবে না।

—স্‌স্যার, যদি বলেন একবার খুব জোরে চেঁচিয়ে দেখতে পারি।

আচ্ছা গাড়ল তো। এখান থেকে চেঁচিয়ে লোক ডাকবে। এই ভাসমান ত্রিশঙ্কু অবস্থা থেকে। যেখানে পৃথিবীর একটি শব্দতরঙ্গও পৌঁছোচ্ছে না। আধ ঘন্টা হয়ে গেল এখনও যখন কোথাও কোনও স্পন্দন নেই তখন বোঝাই যায় বৈদ্যুতিক গোলযোগ হয়নি কোনও। না হলে এতক্ষণেও কি জেনারেটার চলত না? একবারও নজরে পড়ত না দুর্ঘটনাটা? নাহ, অন্য গণ্ডগোল হয়েছে। অন্য গণ্ডগোল। লিফটের।

দিবাকর আবার বিনবিন অনুনয় করল,—স্যার একবার ডেকে দেখি না? চেষ্টা করতে দোষ কি? আমি একটা খুব ভালো ডাক ডাকতে পারি।

বলেই অর্কপ্রভর বিনীত সারথি হঠাৎ বিচিত্র স্বরে চিৎকার করে উঠেছে। চিৎকার নয়,গর্জন। তার হাড়কাঁপানো জান্তব ডাকে ছোট্ট ধাতব কুঠুরি থরথর কেঁপে উঠল।

অর্কপ্রভ শিউরে উঠেছে,—এটা কী হচ্ছে।

—এটা স্যার টার্জানের ডাক। লোকটা হাসছে অমায়িক,—যাত্রায়

থাকতে শিখেছিলাম। এ ডাক স্যার মরা মানুষকেও জাগিয়ে দেয়। তাও তো হাত দুটোকে চোঙা করতে পারছি না।

অর্কপ্রভর ভেতরে একটা রাগ দানা বাঁধছিল, তবু কেমন যেন হাসি পেয়ে গেল হঠাৎ। মজা করার ভঙ্গিতে বলল,—সেটাই বা বাকি থাকে কেন? মনের সুখে ডাকো।

সঙ্গে সঙ্গে ফাইল বগলে চেপে ব্রিফকেস মেঝেতে নামিয়ে দিয়েছে দিবাকর। দুহাতে মুখের সামনে গোল করে ধরে আবার তুলল আওয়াজটা, —হোওও হো হোওওহ।

করুণ থেকে তেজি, তেজি থেকে হিংস্র তালে তালে ঝঙ্কৃত হচ্ছে শব্দ। দেওয়াল থেকে দেওয়ালে আছাড়ি- পিছাড়ি খেল। চক্রাকারে পাক খেয়ে ঘুরে চলেছে। শেষ হওয়ার পরও অনেকক্ষণ রেশ রেখে দিল অর্কপ্রভর কানের পরদায়।

আজব কাণ্ড। বাইরে থেকে লোকজনের গলা শোনা যাচ্ছে না। বহু দূর থেকে কারা যেন সাড়া দিতে চাইছে।

অর্কপ্রভর আগে দিবাকর বলে উঠেছে,—দেখেছেন স্যার, ঠিক শুনতে পেয়েছে। ভালো করে শুনুন, কাছাকাছি কথা বলছে ওরা।

অর্কপ্রভর দরজায় কান পাতল। খুব কাছে নয়, তবে শব্দ বেশ স্পষ্ট এখন। সিঁড়ি দিয়ে নামছে। নামতে নামতে আচমকাই থেমে গেল আওয়াজটা। সম্পূর্ণ নিঝুম। মরিয়া হয়ে অর্কপ্রভ গুম গুম ঘুসি মারল দরজায়। দিবাকরও লাথি মারছে। প্রাণপণে।

ফিরছে। শব্দ ফিরছে। ফিরে এসেও ক্ষীণ হতে থাকল ক্রমশ। তারপর একেবারেই মিলিয়ে গেল।

তিন

শব্দ ফিরল না। লিফট জগদ্দল পাথরের মতো স্থির। যেন চলতেই জানে না। চলেওনি কোনও দিন।

অর্কপ্রভ স্নায়ুর ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছিল। প্রাথমিক অসহিষ্ণুতা একভাবে আয়ত্ত করে নিয়েছিল সে, এখন একটা গোপন শিরশিরে কাঁপুনি পাক খাচ্ছে তার মেরুদণ্ডে। কম্পনটা সরীসৃপের মতো শরীর বেয়ে উঠছে, নামছে, হাঁটুর কাছে গিয়ে দুলছে ঘন ঘন।

দিবাকরের মুখচোরা ভাব প্রায় নেই। ওই টার্জানের ডাক ডাকার পর থেকেই। সে-ই এখন দেখছে অর্কপ্রভকে। খানিকটা সান্ত্বনা দেওয়ার স্বরে বলল,—কিচ্ছু ঘাবড়াবেন না স্যার। আমি আপনাকে বলছি শুনুন, ওরা চেষ্টা করছে। ভয়ের কিছু নেই।

মুহূর্তে অর্কপ্রভর মাথার আগুন জ্বলে উঠল। পদমর্যাদা ভুলে চেঁচিয়ে উঠেছে,—কে বলল আমি ভয় পেয়েছি?

লোকটা একটুও অপ্রতিভ নয়,—আপনার স্যার নাকে কপালে ঘাম জমে গেছে। আপনি স্যার সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না।

লোকটা কি মজা পাচ্ছে। একদিকের দেওয়ালে হাত চেপে অর্কপ্রভ গর্জে উঠল—চোপ। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। আমি ভয় পেয়েছি। ছোট্ট কামরা জুড়ে দাপাদাপি করছে অর্কপ্রভ,—দেখে নেব। আ'ইল সি দা কেয়ারটেকার। আ'ইল সি দা সিকিউরিটি গার্ডস। কী ভেবেছে কী সব, অ্যাঁ। খেলা হচ্ছে। সিংহানিয়া গ্রুপের চিফ অ্যাডভাইজার এতক্ষণ ধরে লিফটে আটকে আছে, এখনও রেসকিউ করতে পারল না! আ'ইল জাস্ট কিক দেম আউট অফ দিস বিল্ডিং। অর্কপ্রভ মেঝের প্যাডিং-এ পা ঠুকল। দিবাকরের দিকে ফিরল। চোখ কুঁচকে দাঁত কিড়মিড় করল কয়েক সেকেন্ড, —তোমাকেও দেখে নেব আমি।

—আমি কী করলাম স্যার? আমি তো ভালোর জন্যই....

—একটা কথা নয়। একটা কথা নয়। অর্কপ্রভর গলার শিরা ফুলে উঠল, —টার্জানের ডাক ডাকা হচ্ছে। এটা কি চিড়িয়াখানা? না বনজঙ্গল?

অর্কপ্রভর হুঙ্কারে দিবাকর খুব ভয় পেয়েছে বলে মনে হয় না, তবে মিইয়েছে একটু। আহত গলায় বলল,—আপনি স্যার মিছিমিছি রাগ করছেন। সেবার রথের মেলায় আমার মেজ ছেলেটা হারিয়ে গিয়েছিল, ওই ডাক শুনেই তো.....। ওরা সত্যি আমার ডাক শুনেছে স্যার।

—চোওওপ। আরও জোরে চ্যাঁচাতে গিয়ে অর্কপ্রভর গলা চিরে গেল। এত জোর চিৎকার করা তার ধাতে নেই, তাই গলাও যেন বিদ্রোহ করছে। ভাঙা ভাঙা কর্কশ স্বর ছিটকে এল,—আমি তোমাকে চুপ থাকতে বলেছি দিবাকর। কিপ মাম। আদারওয়াইজ আ'ইল থ্রো ইউ আউট অফ দিস লিফট।

কথাটা বলেই অর্কপ্রভ চেতনার ফিরল। ধুস, একথা বলার কোনও অর্থ

হয়? সে কি পাগল হয়ে যাচ্ছে। উলটোদিকে মুখ ঘুরিয়ে চোয়াল শক্ত করে দাঁড়িয়ে রইল অর্কপ্রভ। বার কয়েক নিশ্বাস নিল জোরে জোরে। মাথা ঝাঁকাল।

দিবাকর চুপ মেরেছে। লিফটটার মতোই।

অর্কপ্রভ কুলকুল ঘামছিল। গরম সুটে জ্বালা জ্বালা করছে শরীর। নিজের হুঙ্কার নিজেকেই কেমন বিবশ করে দিয়েছে। পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছে নিল। রুমালে ল্যাভেন্ডারের গন্ধ। আঃ, একটু যেন শীতল হচ্ছে মাথা। উত্তেজনা বাড়লে ডাক্তার ল্যাভেন্ডার ব্যবহার করতে বলেছে। ত্বকে। ঘ্রাণে। গন্ধ চিকিৎসা! চিন্তাকে যুক্তির খাতে আনতে চাইল অর্কপ্রভ। এত কেন রেগে গেল সে? তবে কি সত্যিই সে ভয় পেয়েছে? এর চেয়ে বেশি বিপদে কি অর্কপ্রভ কখনও পড়েনি? বছর তিনেক আগে তার প্লেন একবার দিল্লিতে ক্র্যাশল্যান্ডিং করেছিল। একবার গৌহাটি ফ্লাইটে দুর্যোগে পড়ে বিমান উথাল পাতাল। বাতাসবিহীন শূন্যতায় ধপাস করে দুশো পাঁচশো ফিট নেমে যাচ্ছে, লাফিয়ে উঠছে ভয়ঙ্করভাবে। কই, সে সব মুহূর্তেও তো এত ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনি। তবে কি ভয় নয়, ভয় ধরা পড়ে যাওয়ার গ্লানিতেই এই বিকার? একটা অসম লোকের কাছে?

না, এ-সব মুহূর্তে অন্য ভাবনায় ঢুকে পড়া দরকার। অর্কপ্রভ চোখ বুজে খান্ডেলওয়ালের পার্টিটাকে দেখতে চাইল। উজ্জ্বল হলঘরে বর্ণময় সমারোহ চলছে এখন। হাতে হাতে গ্লাস ঘুরছে, টুং টাং শব্দ উঠছে, মৃদু আলাপচারিতা চাপা গুঞ্জন হয়ে ভাসছে বাতাসে। তানিয়ার ভুবনমোহন আঁখি ছুঁয়ে যাচ্ছে অভ্যাগতদের। হ্যালো। হাই। হাউ সুইট। হাউ কিউট। নাইস টু মিট ইউ। আজ পার্টিতে তিন-চারটে কনস্যুলেট থেকে কয়েকজন অফিসারের আসার কথা। তাদের সঙ্গে দেখা হলে ভালো হত। সিংহানিয়া গ্রুপ আর শুধু ভারতে আটকে থাকতে চায় না, এ-দেশের বাজারে দিন দিন, প্রতিযোগিতা বাড়ছে, অন্য দেশের দিকেও পা বাড়াতে হবে এবার। তাই নিয়ে ছোটখাটো কথাবার্তা সেরে নেওয়া যেত আজ। অর্কপ্রভ ঘড়ি দেখল। আটটা কুড়ি। শোভনা নিশ্চয়ই এখন ঘর-বার করছে। যা জেদ, এর পর অর্কপ্রভ পৌঁছোলেও বোধহয় যাবে না পার্টিতে। শোভনার আত্মসম্মানজ্ঞান অত্যন্ত টনটনে, অফিসে আর ফোনও করবে না একবারও। হয়তো বা এর মধ্যেই পোশাক বদলে গ্লাসে জিন নিয়ে বসে গেছে। ফুঁসছে রাগে।

অর্কপ্রভরই-বা আর এত দেরি করে পার্টিতে গিয়ে কী লাভ?

এগারোটার মধ্যে বাড়ি ফিরতেই হবে। অন্তত চার-পাঁচ ঘন্টা ঘুমোতেই হবে রাতে। ভোর সাড়ে পাঁচটার মধ্যে দমদমে রিপোর্টিং। ভাবতে গিয়ে হঠাৎই একটা আজব প্রশ্ন মাথায় এল অর্কপ্রভর। দিবাকর বলছিল বাড়ি ফিরবে, যদি ফিরে যায়, অত সকালে ডিউটিতে সে আসবে কী করে? অন্যান্যবারই বা কী করে? অর্কপ্রভ বিস্মিত হল। সে গাড়ির পিছনের সিটে বসে থাকবে, সামনে স্টিয়ারিং-এ দিবাকর, ছবিটা এত অবধারিত যে এর কার্যকারণের কথা ভুলেও মস্তিষ্কে আসে না কখনও। আসার কথাও নয়। তাদের এই অবস্থান এত সময়-নিরপেক্ষ, এত ঋতু-নিরপেক্ষ যে, সকাল দুপুর বিকেল রাত, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সর্বদাই এ ব্যবস্থা ধ্রুব। তবু এই প্রশ্ন কেন জাগল?

দ্বিধা কাটিয়ে অর্কপ্রভ ডেকেই ফেলল দিবাকরকে,—শোনো।

চোখ অর্ধেক বুজে বিচিত্র ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল দিবাকর, ধড়ফড় করে সোজা হল।

—আচ্ছা তুমি যে বললে রাত্তির সাড়ে এগারোটার পর বাড়ি ফিরবে, অত দূর থেকে ভোর চারটেয় আবার আসবে কী করে?

—ক্যানিং থেকে শেষ রাতে একটা মাছের ট্রেন আসে, ওতেই উঠে পড়ি। ঢাকুরিয়ায় নামি, তারপর যোধপুর পার্ক হেঁটে চলে আসি।

—অ। তা হলে বেশ কষ্ট হয় তোমার।

—কষ্ট কীসের স্যার? শেষ রাত আমার ভালোই লাগে। তারা নিবে গেছে, আলো ফোটেনি, ঠান্ডা বাতাস। এখন তো আবার হাড় কাঁপানো। চাদর মুড়ি দিয়ে আসতে যে কী একটা আরাম লাগে। দিবাকর সুযোগ পেয়ে কথা বলেই চলেছে,—মাঝে মাঝে রাতে থেকেও যাই স্যার। যাদবপুরে। শালির বাড়িতে। মেমসাহেব অবশ্য বলেছেন তেমন হলে আপনাদের একতলার কোয়ার্টারেও থাকতে পারি। তা আমার স্যার ভালো লাগে না।

—কেন? তোমাদের জন্য তো নিচে ভালো ব্যবস্থা আছে।

—জানি স্যার। আসলে আমি স্যার......আসলে স্যার একটু আত্মীয়স্বজন.....মানে স্যার নিজের লোকজনের সঙ্গে ছাড়া থাকতে পারি না।

কথা বলে বলে স্থিত হচ্ছিল অর্কপ্রভ। রাগটা নিবছে। হাসিমুখে বলল, —আমরা তোমার নিজের লোক নই? আমাদের কাছে তুমি কাজ করছ, মেমসাহেব তোমাকে কত ভালোবাসে।......বাড়ি করতে টাকা দিয়েছে। ছুটিছাটা পাও।

—তা নয় স্যার। আমার কিরকম লজ্জা করে। আপনারা স্যার......মানে স্যার......ঠিক আমাদের মতো তো নন। আপনারা যেন একটা কীসের মধ্যে রয়েছেন। আপনাদের কাছাকাছি থাকা......

—কীসের মধ্যে আছি বলো তো?

দিবাকর উত্তর দিল না।

অর্কপ্রভ সামনে ঝুঁকল,—কীসের মধ্যে আছি আমরা, দিবাকর?

অর্কপ্রভর দিকে তাকাল না দিবাকর। বিপদকালীন বাতির জোর কমে আসছে, সেদিকে মুখ ফেরাল। যেন অর্কপ্রভর কথা সে শুনতেই পায়নি।

ঝিম ঝিম আলোতে অর্কপ্রভর মাথা দুলে গেল। দিবাকর তাকে অগ্রাহ্য করছে।

আরও ঝুঁকে খামচে ধরল লোকটার কাঁধ,—কী হল? তুমি উত্তর দিচ্ছ না যে?

দিবাকরের বিশেষ ভাবান্তর ঘটল না, অলস ভাবে গা মোচড়ালো,—কী হবে স্যার শুনে?

—দ্যাটস নট ইয়োর বিজনেস। ফট করে একটা কথা বলে দিলে, এখন উত্তর দিচ্ছ না,তুমি কিন্তু অবাধ্যতা করছ দিবাকর।

—আমি দুঃখিত স্যার।

—বাজে কথা ছাড়ো। চড়াং করে অর্কপ্রভর জেদ চেপে গেল,—ইউ মাস্ট আনসার মাই কোয়েশ্চেন। নইলে আমি তোমার এগেনস্টে স্টেপ নেব।

আলো আরও কমছে। কোনও অদৃশ্য ছিদ্রপথে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঢুকে পড়ছে তরল অন্ধকার। ধীরে ধীরে গিলে নিচ্ছে উজ্জ্বলতাকে। প্রাণহীন কক্ষে দিবাকর ক্রমে যেন অপ্রাকৃত আবছায়া। যেন সেই ছায়া ইগলের মতো ডানা মেলে আড়াল করছে আলোকে।

দুহাতে দিবাকরকে ঝাঁকাল অর্কপ্রভ,—তুমি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ দিবাকর। জানো, এই অবাধ্যতার জন্য আমি তোমার চাকরি খেতে পারি?

দিবাকরের শক্ত স্বরনালি নড়ে উঠল একটু,—তা পারেন স্যার।

—পারি মানে? আ'ইল স্যাক ইউ রাইট আফটার দা....

অর্কপ্রভ বাক্য শেষ করতে পারল না, অপ্রাকৃত ছায়া হাসছে ফিকফিক, —আপনি স্যার কী বলছেন, আপনি নিজেই জানেন না। একবার বলছেন লিফট থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন, অথচ আপনার লিফটের দরজা খোলার সাধ্য নেই। এখন বলছেন, বেরিয়েই চাকরি খাবেন। আগে তো বেরোন স্যার। যদি আদৌ বেরোতে না পারেন?

—তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্চ? অর্কপ্রভ দিবাকরের কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে নিল। নিজেরই উচ্চারিত 'ভয়' শব্দ চকিতে দখল নিয়েছে মস্তিষ্কের। ফিসফিস করে বলল,—কী বলতে চাও তুমি?

—আপনিই বলুন স্যার, আপনি এখন কী পারেন। আপনার কিচ্ছু করার নেই। আপনি ডাক ছেড়ে চ্যাঁচাতে পারেন না। আমার মতো করেও নয়, নিজের মতো করেও নয়। আপনি প্রাণ খুলে কাঁদতে পারেন না। আপনি পা ছড়িয়ে বসে পড়তে পারেন না। আপনি জোর করেও হাসতে পারবেন না এখন। আপনি আপনার নিজেরই অবস্থা জানেন না, স্যার, অথচ আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাকে শাসন করছেন।

অর্কপ্রভ গুম হয়ে গেল। এক রুক্ষ বিষাদ আচ্ছন্ন করে ফেলছিল তাকে। ওই দিবাকর, এই শব্দহীন ক্ষীণপ্রভ কুঠুরি, যেন তাকে এক গাঢ় উপলব্ধির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। সত্যি তো, অর্ক প্রভ কী পারে? সে তো শুধুই একটা শূন্যে ভাসমান আবদ্ধ জীব মাত্র। তার বেশি কিছু নয়।

অনেক উঁচুতে উঠবার নেশায় হাতিবাগানের বনেদি ছেলে একদিন শূন্যে পাড়ি দিয়েছিল। তার বাবা ছিল সম্পত্তির তলানি খাওয়া অকর্মণ্য মানুষ। ছেলেটাও ওভাবে জীবন কাটাতে পারত। কিন্তু সে ওভাবে বাঁচতে চায়নি। তার চোখে সূর্য ছোঁয়ার নেশা। উঠতে উঠতে কখন যে সে মাধ্যাকর্ষণ ছাড়িয়ে গেল। তারা হয়ে ঘুরতে লাগল নিজস্ব কক্ষপথে। ঘুরতে ঘুরতেই ভোগ। বাসনার পূর্ণতা। লালসার নিবৃত্তি। স্ত্রী। সন্তান। সংসার। সমাজ। এক কালের পৃথিবীর মানুষেরা কখন সরে গেল অনেক দূরে। পঁচিশ বছর পর সেদিন হঠাৎ রানুদি এল বাড়িতে। ছোট ছেলের একটা ভালো চাকরির জন্য তদ্বির করতে। যে রানুদিকে চোখের দেখা দেখার জন্য ছটফট করত অর্কপ্রভ, তাকে দেখে বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া হল না তার। বরং উটকো এসে কাজ নষ্ট করার জন্য কী বিরক্তি, কী বিরক্তি। বিধবা ছোট পিসিমা মায়ের চেয়েও বেশি আদর দিত ছোটবেলায়। তার মৃত্যুসংবাদ এল, চোখে

জল তো দূরের কথা, তার শ্রাদ্ধের দিনটা পর্যন্ত অর্কপ্রভ ভুলে গেল। এরা তো তাও এখন বাইরের লোক, এক-একদিন ভোরে বিছানা ছাড়ার সময়ে স্ত্রীকে দেখে কী চমকে উঠে অর্কপ্রভ। তার পাশে মহিলাটি কে। বড় পরিচিত যেন। পর মুহূর্তেই ভুল ভাঙে। ভাঙলেও ভুলের রেশ রয়ে যায়। হঠাৎ হঠাৎ মনে হয়, পরিচিত, এই মহিলা ভীষণ পরিচিত। কিন্তু শুধু পরিচিতই, তার বেশি নয়। ছেলে কানপুর আই আই টি-তে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে, ছুটিছাটায় আসে, তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ প্রায় নেই-ই অর্কপ্রভর। যেটুকু দেখা হয়, নিয়ম মেপে। ডিনার টেবিলে। দুই প্রান্ত থেকে দুজনের তখন শুধু হাই ড্যাড। হাই সান। ব্যস।

ব্যস। হৃদয় বাসনা পূর্ণ হল মন শুন সব জগৎ জনে। ভাঙা রেকর্ড বাজছে অহরহ। বাজনার তালে কক্ষপথে ঘুরছে তারকা। ক্লাব। পার্টি। অফিস। কনফারেন্স। সংসার। কক্ষপথে ঘুরছে ভাসমান ত্রিশঙ্কু। কক্ষপথ থেকে এতটুকু নড়ার সাধ্য আছে অর্কপ্রভর?

হঠাৎই প্রাণভয়ে নিজেকে ভুল প্রমাণ করতে চাইল অর্কপ্রভ। দিবাকরকে মুখের উপর একটা জবাবও দিতে চেষ্টা করল যেন। শরীরের সব শক্তি গলায় সংহত করে টার্জানের মতো ডেকে উঠতে চাইল। হোওওও হোওহো। একটি শব্দও বাজল না গলায়।

ক্ষীণ আলো নিবে গেল ঝুপ করে। সব অন্ধকার।

চার

সব অন্ধকার। মিশমিশে আঁধারে ডুবে গেছে নির্বাসিত কক্ষ। অন্ধকার এত ঘন যে কিচ্ছু দেখা যায় না। লাল সবুজ বোতাম নেই, সাদা নির্দেশনামা নেই, ঝকঝকে আয়না নেই, এমনকী দিবাকরও মুছে গেছে চোখ থেকে। শুধু কালো দেওয়ালের অপ্রত্যক্ষ অস্তিত্ব অনুভব করতে পারছিল অর্কপ্রভ।

অর্কপ্রভর ফুসফুস নিংড়ে এক রাশ ফাঁকা বাতাস দৌড়ে এল। বাতাসই প্রতিধ্বনির মতো ফিরল কাছে,—স্যার।

অন্ধকারে সাঁতার কাটছে অর্কপ্রভর হাত। ছুঁল দিবাকরকে,—আমাকে একটু জল দেবে?

হাতে হাত ছুঁইয়ে দিবাকর ফ্লাস্ক এগিয়ে দিল। কাঁপা হাতে ঢাকনা খুলল

অর্কপ্রভ। পুরো জল নিমেষে শেষ। যত না খেল তার থেকে বেশি গড়িয়ে গেছে মুখের বাইরে। কোট শার্ট টাই ভিজে একাকার।

সময় কাটছিল।

সময় কাটছিল না।

প্রতিটি মুহূর্ত দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর এখন। প্রতিটি মিনিট যেন এক-একটা বছর। অন্ধকার যে এত কালো হয় আগে জানত না অর্কপ্রভ। শুধু কালো নয়, ভয়ঙ্কর। হিংস্র অন্ধকার থাবা বসাচ্ছে শরীরে। কামড়ে ছিঁড়ে তালগোল পাকিয়ে দিচ্ছে অর্কপ্রভর অস্তিত্ব। অশরীরী শক্তি হয়ে দুমড়ে মুচড়ে সংকীর্ণ করে তুলল তার চার পাশ। ছয় বাই ছয় ঘর ছোট থেকে ছোট ক্রমশ।

অর্কপ্রভর দম আটকে আসছিল। মরিয়া হয়ে ডাকল,—দিবাকর।

—আছি স্যার।

—তোমার কাছে দেশলাই নেই? লাইটার? টর্চ?

—টর্চ তো স্যার গাড়িতে আছে। দেশলাই লাইটার আমি রাখি না।

মানে, লোকটা বিড়ি সিগারেট খায় না। অর্কপ্রভ নিজেও ধূমপান করে না, অভ্যাসটাকে অপছন্দই করে সে। তবু এই নির্দয় কালো গহ্বরে নিজের অভ্যাসটাকে গর্হিত মনে হল তার। কাতর গলায় বলল,—তা হলে কী হবে দিবাকর? একটু আলো না হলে.....

—ভয় পাবেন না স্যার। এক্ষুণি অন্ধকার সয়ে যাবে।

অর্কপ্রভ ভরসা পেল না। তবে সত্যিই একটু পরে অন্ধকার সয়ে এল খানিকটা। একটা খুব আবছা আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ঠিক আলোর আভাসও নয়, চোখ বাঁধা মানুষ অন্ধকার থেকে আলোকিত ঘরে গেলে ইন্দ্রিয়ে যতটুকু অনুভূতির তফাত হয় ঠিক ততটুকুই তফাত এখন আলো অন্ধকারে।

সেই ক্ষণে অর্কপ্রভ একটা ঘন্টাধ্বনিও শুনতে পাচ্ছিল। অতি অস্পষ্ট, ওই আলোরই মতো। যেন বহু দূর থেকে, অর্কপ্রভর যৌবন কৈশোর শৈশবের, ওপার থেকে ভেসে আসছে ধ্বনিটা। ভেসে আসছে মাতৃজঠরের আঁধার আশ্রয় থেকে।

অর্কপ্রভ দিবাকরের হাত চেপে ধরল,—শুনতে পাচ্ছ?

—কী স্যার?

—ঘণ্টা বাজছে। শোনো শোনো, ঘণ্টা বাজছে কোথাও।

দিবাকর দু-এক সেকেন্ড স্থির। তারপর বলল,—না তো স্যার। আপনি ভুল শুনছেন। মনের ভুল।

শব্দটা উবে যাচ্ছে। অর্কপ্রভ এখন চৈতন্যের শেষ সীমায়। ভয়ার্ত স্বরে বিড়বিড় করে উঠল,—বাতাস এত ভারী হয়ে গেছে কেন দিবাকর?

—কই, না তো।

—আমার তা হলে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে কেন? আমি কি তবে মরে যাচ্ছি দিবাকর?

অর্কপ্রভ টলে পড়ে যাওয়ার আগে দিবাকর ধরে ফেলেছে তাকে। চওড়া কবজিঅলা হাত স্পর্শ করল অর্কপ্রভর কপাল ঘাড় গলা,—এ কী! আপনি এত ঘামছেন কেন স্যার! আমি তো আছি।

দিবাকর সযত্নে মেঝেতে বসিয়ে দিল অর্কপ্রভকে। শরীরটাকে হেলিয়ে দিল দেওয়ালে। ক্ষিপ্র হাতে খুলে ফেলল অর্কপ্রভর কোট, শার্টের বোতাম মুক্ত করল, আলগা করল কোমরবন্ধনী। ফাঁকা ফ্লাস্ক উপুড় করে ঝাঁকাল মুখের কাছে— মনে জোর আনুন স্যার। নিজেকে শক্ত রাখুন। জোরে জোরে শ্বাস নিন।

ঘরে কোথাও রন্ধ্র নেই, তবু যেন বাইরের কনকনে বাতাস এবার ঢুকে পড়েছে অর্কপ্রভর শরীরে। ঘাম আর শীত জড়িয়ে গেল। দেহের খাঁচা থরথর। রক্তকণিকা অশ্রু হয়ে ঠেলে আসতে চাইছে।

অর্কপ্রভ শিশুর মতো দিবাকরকে আঁকড়ে ধরল,—তুমি ঠিক বলেছিলে দিবাকর। আমি কিছুই পারি না। আমি নিজের হাতেই বন্দি।

অর্কপ্রভ অজ্ঞান হয়ে গেল।

পাঁচ

অর্কপ্রভ ঠিকই শুনেছিল। সত্যিই ঘণ্টাধ্বনি বাজছিল বাইরে। দমকলের ঘণ্টা। গোটা বিল্ডিং-এর বিদ্যুৎ যায়নি, কোনো এক যান্ত্রিক গোলযোগে অচল হয়েছিল লিফট। রক্ষণাবেক্ষণের লোকজন অনেকক্ষণ ধরে সারাবার চেষ্টা করেছিল, পারেনি। তার পরই খবর দিয়েছে দমকলে।

দমকলের অভিজ্ঞ কর্মীরা সময় নেয়নি বেশি। মিনিট পনেরোর মধ্যে উদ্ধার করে ফেলেছে দুই বন্দিকে।

অর্কপ্রভ তখনও সংজ্ঞাহীন। দিবাকর তখনও পার্কার অ্যান্ড স্টিভেনসনের মোটা প্রোজেক্ট রিপোর্ট দিয়ে বাতাস করছে প্রভুকে।

ভূতলে এসে দু-চার মিনিটের মধ্যেই জ্ঞান ফিরল অর্কপ্রভর। জলের ঝাপটা খেয়ে। কেয়ারটেকার ব্র্যান্ডি মিশিয়ে গরম দুধ এনেছে, তাই পান করে সে এখন চাঙা অনেক।

ছোটখাট ভিড় জমে গেছে। সিকিউরিটির লোকজনরা তো এসেছেই, আশপাশের আরও কিছু মানুষ ভিড় ঠেলে দেখছে দিবাকর অর্কপ্রভকে।

কেয়ারটেকার অর্কপ্রভকে জিজ্ঞাসা করল,—একটু সুস্থ বোধ করছে স্যার?

—হ্যাঁ, এবার যাব।

—কাউকে সঙ্গে দিয়ে দেব স্যার?

—না থাক। দিবাকরের হাতে ভর দিয়ে অর্কপ্রভ উঠে দাঁড়াল। ধীর ক্লান্ত পায়ে কোর্টইয়ার্ড পেরোচ্ছে। রাস্তার ওপার থেকে দিবাকর গাড়ি সামনে নিয়ে এল। বিদেশি গাড়ির পিছনের সিটে শরীর এলিয়ে দিল অর্কপ্রভ। নরম তুলতুলে গদিতে ডুবে গেল।

দিবাকর স্টিয়ারিং-এ বসে ঘাড় ঘোরাল—বাড়ি যাবেন তো স্যার?

অর্কপ্রভ ঘড়ি দেখল। ন'টা পঁচিশ। এমন কিছু রাত হয়নি, এখন একবারে খান্ডেলওয়ালের পার্টি থেকে ঘুরে যাওয়া যায়। চোখ বুজে বলল, —নাহ্, আলিপুর চলো। যদি তোমার মেমসাহেব ওখানে গিয়ে থাকে.....। ঘুরেই যাই একবার।

বিপন্ন খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছে অর্কপ্রভ। সে এখন আবার তার নিরাপদ খাঁচায়।



ঝড়বাদলে ধু-ধু মাঠে...



ঝড়বাদলে ধু-ধু মাঠে যে যায় সে পায়... ছেলেবেলায় ঝড় উঠলেই ঠাকুমা দুলে দুলে গাইত ছড়াটা। তবে ওই টুকুনই। নাতিরা বার বার প্রশ্ন করত, —তারপর? ও ঠাম্মা, বলো না তারপর? গেলে কি পায়? ঠাকুমা উত্তর দিত না। শুধু ঠোঁট টিপে ভারি রহস্যের হাসি হাসত।

অনেক অনেকদিন পর আজ এই নির্জন স্টেশনে দাঁড়িয়ে রহস্যময় সেই ছড়াটা কেন যে মনে পড়ে গেল শঙ্খ! ট্রেন থেকে নামতেই সামনে সেই বিশাল প্রান্তর। ঘন মেঘ জড়ো হয়ে বড়োসড়ো আসর পেতেছে সেখানে। বৃষ্টি বুঝি নামে নামে। আজ বোধহয় না বেরোলেই ভালো হত। অসময়ে এমন আষাঢ়ে মেঘ কোত্থেকে এল কে জানে। নির্ঘাত বঙ্গোপসাগরে ডিপ্রেশান। তবে আজ না এলে কবে আবার আসা হয়। রাখীকে সংসারের গণ্ডি থেকে বার করাটাই এক বিরাট সমস্যা। আজ এই ঝামেলা, কাল ওই ফ্যাচাং। আগের দিনও তো বেরোব বেরোব, দুম করে খড়দার মাসিমা এসে হাজির। কি, না সারাদিন থাকবেন। আরেক দিন রাত অবধি সব ঠিকঠাক, সকাল থেকে হঠাৎ ঝুমপার গা ছ্যাঁকছ্যাঁক। দরকারি কাজে এভাবেই শুধু পরপর বাধা আসে।

মেঘলা মাঠে বারকতক চোখ বুলিয়ে রাখীর দিকে আড়চোখে তাকাল শঙ্খ। অনিচ্ছায় এসেছে বলে এখনও মুখ ভার। আঁচল তুলে চেপে চেপে ঘাড়গলা মুছছে। দু ভুরুর মাঝে জমাট বিরক্তি।

কথা বলার জন্যই কথা বলল শঙ্খ,—আকাশের সাজগোজ দেখে মনে হয় জোর নামবে, কি বলো?

রাখী কোনো কথা বলল না।

শঙ্খ আকাশের দিকে মুখ করে কোমরে হাত রাখল,—তবে বোধহয় নামছে না। দ্যাখো, পশ্চিম দিকটা খালি খালি আছে। পুরো ভরাট হওয়ার আগে আমাদের কাজ হয়ে যাবে।

রাখী এবার সোজাসুজি তাকাল,—তোমার লোক কোথায়?

লোকটা যে সামনাসামনি কোথাও নেই তা আগেই দেখে নিয়েছে শঙ্খ। ঢোক গিলল,—ওদিকটায় থাকতে পারে। চলো না, ওপারে যাই।

দুই প্রাচীন স্টেশনের মাঝখানে, খেলা মাঠের কোলে, মাত্র কিছুকাল আগে জন্ম নিয়েছে ছোট্ট স্টেশনখানা। এখনও ওভারব্রিজটা পর্যন্ত হয়নি। রেললাইনের উঁচুনিচু খোয়া টপকে ওরা এপারে এল। কোথাও জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই। কেমন যেন হু হু করছে গোটা এলাকাটা। কাঁচা মাটির গা-বরাবর একা একটা ল্যাম্পপোস্ট। রাখী সেই অবধি পৌঁছে দাঁড়িয়ে গেল,—কই, কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না!

শঙ্খর ব্যস্ত চোখ বৃথাই পুরো প্ল্যাটফর্ম ঘুরল আবার,—বুঝতে পারছি না। দশটার আগেই তো এখানে এসে দাঁড়াবে বলেছিল।

—দ্যাখো কখন আসে। দালালদের কোনো কথার ঠিক থাকে না।

—দেখি আরেকটু।

রাখী ঠোঁট ওলটালো। ট্রেনটা তাদের নামিয়ে দিয়ে যে পথে চলে গেছে, সেইদিকে তাকিয়ে আছে। ভাবটা এমন গাড়িটা যদি ভুল করে উলটো দিকে চলে আসে, টুক করে ও ফিরে যাবে কলকাতায়। কী যে মোহ ওর কলকাতার ওপর। দীর্ঘদিন খাঁচাবন্দি থাকলে বোধহয় এরকমই হয়। খাঁচার পাখি আকাশই ভুলে যায় তখন।

শঙ্খ তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে টিকিট কাউন্টারের দিকে এল। খুপরি মতন টিকিট ঘরটির ঝাঁপ যথারীতি অর্ধেক নামানো। ভেতরে কেউ আছে কি নেই বোঝা যায় না। আগে যে ক'দিন এসেছে, কোনদিনই কাউন্টারের ঝাঁপ পুরোপুরি খোলা দেখেনি শঙ্খ। শহরতলি বেশিরভাগ লোকাল এখানে দাঁড়ায় না। হঠাৎ তীক্ষ্ণ চিৎকারে দশদিক তোলপাড় করে ঝমাঝম চলে যায়। সেই অভিমানেই কি কাউন্টার ঘোমটা টেনে রাখে? শঙ্খ ঝুঁকে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করল। টেবিলে মাথা গুঁজে নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে টিকিটবাবু।

আয়েশ করে ঘুমোবার দিন বটে আজ। আর কেউ কি আছে ভেতরে? দেখা যাচ্ছে না। বাইরে বেরোনোর মুখে লাল সিমেন্টের চওড়া বেঞ্চি। একটা মাদি কুকুর খানচারেক বাচ্চা নিয়ে সেখানে নিঝুম বসে। শঙ্খ বাইরেটাও দেখে এল। নাহ্ লোকটা আসেইনি। কোনো মানে হয়? অত দূর থেকে, এমন একটা আকাশ বয়ে তারা আসতে পারল, আর তুই ব্যাটা কাছেই থাকিস, জমি কেনা-বেচাতে দাঁও মারবি মোটা......শঙ্খ পায়ের ডগায় এসে পড়া ইটের টুকরোয় ফুটবলের শট মারল একটা।

স্টেশনের বাইরে কাঁচা রাস্তা। রাস্তার গায়ে এখানকার সবেধন একটিই দোকান। ঠিক দোকান নয়, দোকানের মতো। বাঁশের খুঁটির মাথায় টিনের চালা, তিনদিকে দরমার দেওয়াল। পাম্প দেওয়া কেরোসিন স্টোভে কখনো-সখনো এখানে চা বানানো হয়। তবে কখনো-সখনোই। অফিস টাইমের টুকরোটাকরা দু-চারজন ছাড়া বড় একটা চায়ের খদ্দের নেই এলাকায়। অন্যান্য দিন তাও এক-আধজন বসে থাকে বেঞ্চিতে। বেশিরভাগ বাসরাস্তার দিকের বাসিন্দা। বসে বসে আড্ডা মারে, কাগজ পড়ে, বোফর্স কিংবা শ্রীলঙ্কা চুক্তি নিয়ে তর্ক জমায়। আজ চারদিক শুনশান। এমন গোমড়া দিনে কে আর শখ করে বাইরে বেরোয়। ছোট্টমতন কাচের বাক্সে গড়াগড়ি যাওয়া গুটিকতক অনাথ দরবেশ আর দানাদার সামনে রেখে দোকানিটাও ঢুলছে। তার খুব কাছে গিয়ে গলা ঝাড়ল শঙ্খ,—দাদা শুনছেন?

ধড়ফড় করে সজাগ দোকানি—টুটুবাবুকে দেখেছেন? এখানে এসে দাঁড়ানোর কথা ছিল.....

ঘুমন্ত চোখ টানটান করল লোকটা। হাতের উলটোপিঠে ঘুমের রস মুছছে। একবার ঝুঁকে আকাশও দেখে নিল,—সে কি আজ আর ঘর থেকে বেরোব্যা? জমি দেখাবার কথা ছিল বুঝি?

টুটুবাবু এ অঞ্চলে মোটামুটি সবার পরিচিত। মুখের আগে তার চোখ কথা বলে। এসব লোকরা স্বভাবতই কথা দিয়ে কথা রাখে না। প্রশান্তদাই এই লোকটার সঙ্গে শঙ্খর আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। শঙ্খ তখন কলকাতার বুকে নিজস্ব একটা ফ্ল্যাটের স্বপ্ন দেখছে। ফ্ল্যাট না হোক, নিদেনপক্ষে একফালি জমিও যদি পাওয়া যেত। এখানে ওখানে কথা বলে বেড়ায়,

কিছুতেই সুবিধা হয় না। সাধ আর সাধ্যের মধ্যে দূরত্বটা যে বড্ড বেশি। শেষে প্রশান্তদা বলল,—কী তোমরা কলকাতা কলকাতা করে মরো? একটু বাইরে যাও, দেখবে কত চমৎকার সব জায়গা পেয়ে যাবে।

রাখী আপত্তি জানিয়েছিল,—ও বাবা, কলকাতা থেকে দূরে গিয়ে আমি থাকতেই পারব না। এখানে আজীবন থেকে....

—দূর কোথায়? নরেন্দ্রপুর তো কাছেই। তোমাদের বালিগঞ্জ থেকে ট্রেন ধরলে মাত্র কুড়ি মিনিট। স্টেশন হওয়ার পর পূর্বদিকের ধানিজমিগুলোও সব হুই হুই করে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। ছুটির দিনে দ্যাখো গে যাও, তোমাদের মতো ভূমিহীন বাবুবিবিরা কেমন রঙিন প্রজাপতির মতো উড়ে উড়ে ফাঁকা মাঠে নিজেদের সীমানা মাপছে। দামও তোমাদের নাগালের মধ্যেই।

কথাটা ঠিক। বাসরাস্তা থেকে এ জায়গাটা যদিও দূর তবে স্টেশন হয়ে যাওয়াতে অনেকেই ধারণা এখানেও শহর পৌঁছোতে আর দেরি নেই। গড়িয়ার দিক থেকে ঝাঁক ঝাঁক বাড়ি এগিয়ে আসতে শুরু করে দিয়েছে। সোনারপুর আসবে ওদিক থেকে। শহর আর শহরতলির মিলন হবে। এভাবেই তো নগর ডালপালা ছড়িয়ে দেয় নানাদিকে, ঝুরি নামিয়ে নতুন শিকড় গাড়ে। টুটুবাবু ছাড়াও আরও দু-একজন দালালের সঙ্গে আলাপ হয়েছে শঙ্খর। ইদানীং কিছু হাউসিং এজেন্সিও এদিকে ব্যবসায় নেমে গেছে। দিনকেদিন নীচু ধানজমির দামই লাফিয়ে বেড়ে চলেছে। আজ পাঁচ হাজার কাঠা তো কাল ছ হাজার, পরশু আট হাজার।

শঙ্খ প্ল্যাটফর্মে ফেরার আগে সিগারেট ধরাল। আলগাভাবে ঠান্ডা হাওয়া উঠছে মাঝে মাঝে। কোথাও হয়তো বৃষ্টি নেমে গেছে। চাপা গুমগুম শব্দে আকাশ ডেকে উঠল। ডাকতে ডাকতে গড়িয়ে গেল দূরে আবছাপ্রায় ঘরবাড়িগুলোর দিকে। এই পশ্চিম পারটায় তবু যা হোক জনবসতি আছে। মেঠো পথ বেয়ে খানিক গেলেই বাসরাস্তা, রামকৃষ্ণ মিশন। পূর্বদিক একেবারেই জনহীন। যতদূর চোখ যায় শুধু হা-হা মাঠ। খামচা খামচা ভাবে চাষও হয়েছে কোথাও কোথাও। মাঠের শেষপ্রান্তে গ্রাম। এখান থেকে শুধু তার সবুজ আভাস পাওয়া যায়।

টুটুবাবু ওই কামরাবাদের দিকেই থাকে। এগিয়ে গিয়ে লোকটাকে

খুঁজলে কেমন হয়? ধ্যুৎ বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। তার থেকে ফিরে যাওয়া ভালো।

প্ল্যাটফর্মে ঢুকতে ডানদিকে তারজালে ঘেরা সদ্যকিশোরী এক গুলমোহর গাছ। তার ওধারে চুপচাপ দাঁড়ানো রাখীকে দেখাচ্ছে ঠিক নির্বাসিত রানির মতো। শঙ্খ মনে মনে হেসে ফেলল। সত্যি, এসব জায়গায় রাখীর মতো শহুরে মেয়েদের একেবারে বেমানান লাগে। তাকেও কি ঠিক মানায়? এই বিশাল প্রাকৃতিক পটভূমিতে? না মানাক, জায়গাটা শঙ্খর ভীষণ ভালো লেগে গেছে। কলকাতার এত কাছে, বলতে গেলে প্রায় নাগালের মধ্যে, এমন বিশাল নির্জনতা পাওয়া যায় ভাবলেই গা ছমছম করে ওঠে। এ ধরনের নির্জনতার আলাদা একটা চোরা টান আছে।

প্রথম দিন এখানে এসেই অদ্ভুত এক অনুভূতি হয়েছিল তার। চারধারের অনন্ত নীল আর সবুজের মাঝখানে তাকে দাঁড় করিয়ে টুটুবাবু বলেছিল, —এই দেখুন, এই আপনার জমি। পছন্দ হয়?

মাঠের গায়ে টালমাটাল ঢেউ উঠেছে তখন। সোনালি রোদে ভেসে গেল কিছু শুকনো ধুলোমাটি। গাছগাছালি তিরতির নাচছে।

লোকটা বলল,—স্টেশনের কাছেও দু-একটা প্লট আছে। দাম একটু বেশি পড়বে। দেখবেন?

উত্তর দেবে কি, শঙ্খ কোথায় চলে গেছে তখন। সে যেন সে নয়, সে হয়ে গেছে পৃথিবীর সেই আদি পুরুষ যে প্রথম অধিকার করেছিল ভূমিকে, তারপর প্রথম ঘর বেঁধেছিল মাটির ওপর। কথাটা রাখীকে গিয়ে বলতে সে তো হেসে কুটিপাটি, —আশ্চর্য কল্পনাশক্তি যা হোক। ওসব কাব্য আমার পোষায় না।

—আহা, তুমিও একটু ভাবো না। মনে করো ওখানে গিয়ে প্রথম আমরাই ঘর তৈরি করলাম। ভেবে দ্যাখো, চারদিকে কোনো হট্টগোল নেই, প্রতিবেশীদের রেষারেষি নেই, ধু ধু মাঠের ভেতর আমরাই শুধু থাকি। যে দিকে তাকাও আকাশ মাটি আর সবুজ গাছপালা। ছেলেমেয়ে দুটো উদ্দাম খেলা করবে ধুলোতে। যেমন তেমন বাতাস দৌড়োবে আমাদের ঘরের ভেতর দিয়ে। সে বাতাসে ধোঁয়া নেই, ডিজেলের গন্ধ নেই....

—তুমি ভাবো বসে বসে। রাখী মুখ বেঁকিয়েছিল,—একটা কথা মনে

রেখো, ওসব পাণ্ডববর্জিত জায়গায় বাড়ি করলে তুমিই গিয়ে থাকবে। আমরা কেউ যাব না।

শঙ্খ পা দিয়ে চেপে সিগারেট নেবাল। রাখী একমনে হাতের নখ খুঁটছে। একটু দূর হলেও শঙ্খ বুঝতে পারল ওর নিচের ঠোঁট বেশ কাঁপছে। ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করতে হলেই রাখীর ঠোঁট অভিমানী বালিকা হয়ে যায়। আহা বেচারি, কত সাধই যে ওর অপূর্ণ থেকে গেল। নিজস্ব এক ফালি বাড়ির জন্য কবে থেকে শুধু কল্পনার জাল বুনে চলেছে আর উদ্বাস্তুর মতো বাসা বদল করতে হচ্ছে একের পর এক। কোথাও একটু পুরোনো হলেই বাড়িওয়ালা বাঁকা হয়ে যায়। অন্যের তৈরি ঘরে কী যে শংকা আর আড়ষ্টতায় দিনযাপন করতে হয় মানুষকে। কেমন হীনমন্যতা বোধও এসে যায় মনে। আসতে বাধ্য। তার নিজেরই আসে।

শঙ্খ বউ-এর কাছে এগোল,—লোকটা এরকম ঝোলাবে ভাবতেও পারিনি। যাক গে, এরপর যে ট্রেনটা দাঁড়াবে তাতে ফিরে যাব।

রাখী ঠান্ডা চোখ তুলে তাকাল,—শখ মিটে গেল?

কথাটায় যথেষ্ট খোঁচা আছে। শঙ্খর এবার সামান্য রাগ হচ্ছিল। তার কি নিজের কোনোই ইচ্ছে অনিচ্ছে, শখ-আহ্লাদ থাকতে নেই? রাখী ধরেই নিয়েছে সে যা চাইবে তাই হবে। তার যদি এখানে জমি পছন্দ না হয়...। শঙ্খর গলা ভারী হল,—আজ না হল তো কি আছে? কিনব মনস্থ যখন করেছি, আরেকদিন আসব।

—আমি আর আসব না।

—এসো না। আমি একাই বায়না করে যাব।

আকাশ বেয়ে হুড়মুড় করে মেঘ ছুটতে শুরু করেছে। বিদ্যুৎ চমকাল বারকয়েক। রাখী গুম হয়ে আছে। হাওয়ার দিকে পেছন ফিরে আরেকটা সিগারেট ধরাল শঙ্খ,—কলকাতা কলকাতা করে মরছ, চেষ্টা তো করা হল। আমাদের জন্য ওখানে জায়গা আছে কোথাও? থাকলেও তুমি ছুঁতে পারবে?

—তেমন চেষ্টা আর হল কই। এই তো ইস্টার্ন বাইপাসের বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল...

—ওখানে লটারি হবে। আমাদের কোনোদিনও লটারি উঠবে না।

—এটাও তোমার কল্পনা।

—কল্পনা নয়, বাস্তব। লটারি পাওয়ার কপাল থাকা দরকার।

—লেজিদের কপাল কখনও খোলে না। রাখী যেন ঠিকই করেছে তর্ক চালিয়ে যাবে,—লটারি ছাড়াও কতরকম স্কিম হচ্ছে চারদিকে। মধ্যবিত্তদের জন্যও....

—তারাও কেউ তোমাকে প্রপার কলকাতায় জায়গা দিতে পারবে না। এরকম শহরতলিতেই...

—সে যেমনই হোক, এমন ভূতুড়ে জায়গা তো হবে না।

—আশ্চর্য। শঙ্খ হতাশভাবে দু-দিকে মাথা নাড়ল—এমন একটা সুন্দর পরিবেশ তোমার ভালো লাগছে না? কলকাতাতে মাথা খুঁড়লেও এমন নির্মল জায়গা পাবে তুমি?

—নাহ, পাব না। রাখীর ঘাড় শক্ত হল,—তা সুন্দরবনে গিয়েও তো বাড়ি করা যায়। সেখানে প্রকৃতি আরও সুন্দর।.....উঠোনে বাঘ-ভাল্লুক হামা টানবে। কুমড়ো ডগায় সাপ ঝুলবে, তবে না নিজের বাড়ি।

—ভুল করছ। এ জায়গা ক'দিন পরে মোটেই এরকম থাকবে না।

—অসম্ভব। দশ বছরের আগে এখানকার কোনো ডেভেলপমেন্ট হতেই পারে না। কবে ইলেকট্রিসিটি আসবে, জলের ব্যবস্থা হবে.....আমি বাজি ধরতে পারি....

—বেশ তো। শঙ্খ নরম হল,—তখনই না হয় তুমি এসে বাড়ি কোরো। এখন যখন সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে, কিনে রাখতে ক্ষতি কী? কাঠা চারেকে কত সুন্দর মনের মতো বাড়ি করা যাবে ভাবো তো।

—ভালো। এভাবেই ফাঁকা মাঠে কষ্টের টাকাগুলো ব্লক করে রাখো আর বাড়িওলাদের তোয়াজ করতে করতে কাটিয়ে দাও জীবনটা।

এ কথার পিঠে কথা হয় না। শঙ্খ চুপ করে গেল। প্রচণ্ড দাপটে একটা ডাউন ট্রেন ছুটে যাচ্ছে চোখের ওপর দিয়ে। শিশু প্ল্যাটফর্ম দুটো ধুকধুক কেঁপে উঠল। গাড়িটা বেরিয়ে যেতেই চতুর্দিকে ধুলোঝড়। রাখী নাকে আঁচল চাপা দিল। অনেকক্ষণ পর দুটো জাগন্ত মানুষের মুখ দেখা যাচ্ছে। স্টেশনের ঢাল বেয়ে আধাশহুরে দুজন লোক উঠে আসছে প্ল্যাটফর্মে। তাদের বিস্মিত চোখ শঙ্খ-রাখীর দিকে। যেন এরকম দিনে স্টেশনে কাউকে

দেখবে ভাবেনি। শঙ্খ তাদের দিকে গটগট এগিয়ে গেল,—দাদা, এরপর কোন্ গাড়ি দাঁড়াবে?

ধুতিপরা লোকটি বগল থেকে ছাতা নামাল,—কোন্‌দিকে যাবেন?

যেন রাখী শুনতে পায়, সেভাবে গলা চড়াল শঙ্খ,—কলকাতায়।

—এখন কলকাতায়? পাশের লোকটি আরও অবাক,—যখন তখন দুর্যোগ নামতে পারে.....

শঙ্খ শুকনো হাসল,—না, না। যাব না—ফিরব।

—এখন তো গাড়ি নেই। ক্যানিং থামবে সেই বারোটা পাঁচে।.....তবে হেঁটে যদি সোনারপুর চলে যেতে পারেন....

শঙ্খ ঘড়ি দেখল। এগারোটা বাজতে পঁচিশ। তার মানে দেড় ঘন্টার কাছাকাছি। আকাশ নেমে এসেছে আরও। একটু আগেও ঝিমঝিম আলো ছিল, আর বোধহয় বৃষ্টিকে ধরে রাখা গেল না। লোক দুটো প্ল্যাটফর্ম বেয়ে নেমে যাচ্ছে। ভুল। ওরা ট্রেন ধরতে আসেনি। রাখী সরে দাঁড়িয়েছে। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ফোলডিং ছাতা বার করেও রেখে দিল। শঙ্খর হঠাৎ খুব মনখারাপ হয়ে গেল। কী দরকার ছিল অযথা ঝগড়া করার? প্রতিদিন একই কথা ছোঁড়াছুঁড়ি....? শঙ্খ সামনের বেঞ্চিতে বসে পড়ল। সোনারপুর অবধি এখন আর হেঁটে যাওয়া যায় না। রাখী হাঁটতেও পারবে না অতটা। এধার একটা আপ-ট্রেন পাস করছে। অনেক দূর চলে যাওয়ার পরও তার ধাতব রেশ শুনতে শুনতে শঙ্খ মত বদলে ফেলল। মরুক গে যাক, এখানে কিনবেই না জমি। ঘর-বাঁধা নিয়েই যদি স্বামী-স্ত্রী একমত না হতে পারে.....

শঙ্খ যখন এভাবেই বিমর্ষ, তখনই আশ্চর্য কাণ্ডটা ঘটে গেল। বৃষ্টির প্রথম ফোঁটাটা রাখীর শরীরকেই ছুঁল আগে। সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ কেমন আলুথালু হয়ে গেল রাখীর মনটা। বৃষ্টির সম্ভাবনা আর বৃষ্টি আসা এ দুটোর মধ্যে এত তফাত! রাখী আকাশের দিকে চোখ তুলল। আবার একটা ফোঁটা ঝরল। আরও একটা। চোখ নামিয়ে রাখী শঙ্খর দিকে তাকাল। আচমকা ভেতরে একটা গোলমাল বেধে গেছে। একটু আগের ক্ষোভ, বিষাদ সব যেন ধুয়ে যেতে চাইছে। বৃষ্টি আর মাটির মিলনে বুনো সুখের গন্ধ ছড়িয়ে যাচ্ছে বাতাসে। শঙ্খ উঠে দাঁড়ানোর আগেই তার কাছে ছুটে গিয়েছে রাখী, —এই ওঠো, উঠে পড়ো।

শঙ্খ উঠে দাঁড়াল। টিকিটঘরের দিকে যাচ্ছে।

—ওদিকে নয়। পিছন থেকে টানল রাখী,—ওইদিকে চলো। তোমার পছন্দ করা জমিতে—মাটিতে।

রাখীর স্বরে কি ব্যঙ্গ? শঙ্খ বুঝতে পারছিল না। চোখদুটো তবে ঝিকঝিক হাসে কেন? মেয়েদের মনের রং কখন কীভাবে যে বদলায়! বৃষ্টির ফোঁটারা ঘন হচ্ছে ক্রমশ। শঙ্খ নিজের মনে বিড়বিড় করে উঠল, —ধুর। রোববারের সকালটাই মাটি হয়ে গেল। এমন জানলে কোন্ শালা....ওদিকে ছেলেমেয়ে দুটোও হয়ত না খেয়ে বসে থাকবে......

—থাকবে না। চাপা অস্থিরতায় গলা কাঁপছে রাখীর,—আমি আশার মাকে ওদের খাইয়ে দিতে বলেছি।

—লন্ড্রি থেকে জামাকাপড়গুলো আনা হল না.....দুপুরে বাবুলের অ্যাডমিশানের জন্য ব্যানার্জিবাবুর কাছে যাওয়ার কথা ছিল......কেরোসিনও ধরা হল না মাঝখান থেকে....

মেঘে মেঘে যুদ্ধ বেধে গেছে। এমন জোরে চেঁচিয়ে উঠল আকাশ যেন শুধু ধমকেই থামিয়ে দেওয়া যায় বৃষ্টিকে। রাখী শঙ্খর হাত চেপে ধরল, —কথা বোলো না। তাড়াতাড়ি চলো।

—কোথায়?

—বললাম তো আমাদের জমিতে....ঝড়ে....বৃষ্টিতে....। শঙ্খ ফ্যালফ্যাল তাকাল। রাখীর কথাগুলো ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। ঝোড়ো হাওয়ার তালে নাচছে বৃষ্টি। রাখী আচমকা সেদিকে ছুটে গেল। ছুটতে ছুটতে নেমে যাচ্ছে প্ল্যাটফর্ম বেয়ে।

—আরে কী হল? শঙ্খ হতচকিত,—ওদিকে কোথায় যাচ্ছ? এই রাখী....এই .....মিছিমিছি ভিজছ কেন?

রাখী উত্তর দিল না। ঝমঝম বৃষ্টি মাথায় একেবারে খালপাড়ে চলে গেছে।

শঙ্খও এক ছুটে পৌঁছে গেল সেখানে,—কী আজব খেয়াল মাথায় চাপল, অ্যাঁ?

রাখী শুনেও শুনল না। প্রকাণ্ড আকাশ জুড়ে নাচছে হিসহিস বিদ্যুৎ। সেদিকে চোখ মেলে দিয়েছে,—জানো, সেদিন না আনোয়ার শাহ রোডের

দিকে গিয়েছিলাম। তোমাকে বলিনি।.....আমাদের সেই ফ্ল্যাটটায় না লোক এসে গেছে।

টাপটুপ জল গড়াচ্ছে রাখীর চুল বেয়ে, কপাল বেয়ে। শঙ্খ তার হাত থেকে ব্যাগ কেড়ে নিয়ে ছাতা বার করতে চাইল।

—নিশ্চয়ই সেই ডাক্তারটা কিনেছে, তাই না? রাখীর চোখ থেকে বৃষ্টি ঝরল,—অথচ ফ্ল্যাটটা প্রথমে আমাদের নামে অ্যালটেড হয়েছিল। বাড়তে বাড়তে শুনলাম দু'লাখ আশিহাজারে বিক্রি হয়েছে।

হাওয়াতে ছাতা উলটে-পালটে যাচ্ছে। শঙ্খ প্রাণপণে সোজা রাখার চেষ্টা করছে সেটাকে। রাখী দেখেও দেখল না,—ওরা প্রথমে যা এস্টিমেট দেয়, তা আর কিছুতেই ঠিক রাখে না। নইলে বলো দেড়লাখ টাকার ব্যবস্থা তো আমরা করেছিলাম। আশি হাজার লোন......আমার গয়না.......তোমার প্রভিডেন্ড ফাণ্ড....

রাখীর গলা ক্রমশ ডুবে যাচ্ছে। ভয়ংকর শব্দে বাজ পড়ল কোথাও। মেঘেরা প্রায় ঘিরে ফেলেছে দুজনকে। খানিক তফাতে, বাঁপাশে কারা আধখানা ঘর বানিয়ে ফেলে রেখে গেছে। হয়ত শেষ করতে পারেনি। ঘর নয়, ঘরের খাঁচা। একটা গোরু ভীষণ ভয় পেয়ে লাফাতে লাফাতে আশ্রয় নিতে যাচ্ছে খাঁচাটার দিকে। যেন ওখানে পৌঁছোলেই বাঁচা যায় তাণ্ডবের হাত থেকে। রাখী সেদিকে তাকিয়ে খিলখিল হেসে উঠল বাচ্চা মেয়েদের মতো। লাফিয়ে বাঁশের সাঁকো পার হল। আবার বাজের শব্দ। শঙ্খ এবার ভয় পেয়ে গেল,—কী পাগলামি করছ রাখী? এসো—ফিরে চলো।

রাখী তাকাল না। হাওয়ায় হাওয়ার দুলে বৃষ্টি ছুটছে পূর্বদিকে। সেই বৃষ্টিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল,—বাড়িওলা কাল কী বলছিল জানো? বলে ছেলের বিয়ে দেবে। ওদের আর ওপরের ঘরে কুলোচ্ছে না। শিগগিরি মনে হয় আমাদের উঠে যেতে বলবে। বলতে বলতে জোরে হেসে উঠল,—বাজে কথা। বাড়িওলা মাত্রই ভাড়াটে ওঠাতে ও কথা বলে। আমরা চলে গেলে আবার বেশি ভাড়া, আবার মোটা অ্যাডভান্স.....শিবুদালাল মাঝেমাঝেই আজকাল যাতায়াত করছে.....বৃষ্টির সঙ্গে রাখী ছুটে চলেছে পাল্লা দিয়ে। কখনও আগে, কখনও পেছনে, —এই তোমার মনে আছে আগের বাড়িওলা কিরকম কায়দা করে....ইস জল নিয়ে ওরা কষ্ট দিয়েছিল খুব।

আর প্রথম যে বাড়িটায় ছিলাম.....সেই যে গো ঢাকুরিয়ায়....তিনঘর ভাড়াটের কমন বাথরুম......

চরাচরে বুঝি রাত নেমে আসছে। কামরাবাদের দিক থেকে এদিকের বৃষ্টিকে তাড়া করে আরেক দল বৃষ্টি ঝাপটে এল ছিপছিপ শব্দে। শূন্য মাঠে ঝড়ের শব্দ কী ভয়ংকর। শঙ্খ দুহাতে কান চাপল। রাখী কেমন অনায়াস ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছে। যেন আজই সমস্ত গ্লানি আর হতাশা ভাসিয়ে দেবে জলঝড়ে। খুব নীচু দিয়ে একটা কাক উড়ে গেল। রাখী পা থেকে চটিজোড়া খুলে ছুঁড়ে দিল দূরে। এমন তরতর হাঁটছে যেন এ পথে রোজই আসা-যাওয়া। শঙ্খর বুক কেঁপে উঠল। বৃষ্টির ধোঁয়ায় রাখিকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। নিজের বউকেই এই মুহূর্তে কেমন অলৌকিক লাগছে। যেন মানবী নন। যেন বৃষ্টি কিংবা আকাশ মাটি। আবছায়া হাতড়ে শঙ্খ চিৎকার করে বলতে চাইল—দোহাই রাখী, এবার ফেরো। মাথার যখন তখন বাজ ভেঙে পড়তে পারে।—কিছুই বলতে পারল না। বৃষ্টির ধোঁয়ায় শব্দরা হারিয়ে গেছে। সেই ধোঁয়াতে আবছা রাখীও। প্রকাণ্ড মাঠে ভাসছে শুধু অশরীরী নারী। শঙ্খর পছন্দ করা ভূমিতে নিজেকে ছড়িয়ে দিল। একটা জমি দখল করে অন্য জমিতে যাচ্ছে। তারপর আবার একটায়। আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। এবার বুঝি ধারণ করে নেবে আকাশটাকেও।

শঙ্খ স্তব্ধ দাঁড়িয়ে রইল। রাখী যেন ভাবেভঙ্গিতে বলতে চাইছে,—ভয় কিসের গো? ঝড় তো নিত্যি উঠছে। বাজও পড়ছে। শুধু হঠাৎ এই কুড়িয়ে পাওয়া বৃষ্টিটা....এই বৃষ্টিটা....

ভাবতে ভাবতে শঙ্খও দু হাত বাড়িয়ে দিল আকাশের দিকে। পুরোনো ছড়াটার মানে খুঁজে পাচ্ছে যেন.....ঝড়বাদলে ধু ধু মাঠে......।



তত্ত্বতালাশ



নেওয়ার মতো অনেক কিছুই ছিল। অথচ কিছুই নেয়নি। শুধু সাজানো গোছানো ঘরটাকে একেবারে তছনছ করে রেখে গেছে। স্ট্যান্ড থেকে রঙিন টিভি মেঝেতে নামানো। টেলিফোন এমনভাবে টেবিলের তলায় লটকে আছে যেন কেউ তাকে ফাঁসি দিয়েছে। সোফা আর ডিভানে সাজানো ডজন খানেক বাহারি কুশন স্থানচ্যুত হয়ে গড়িয়ে আছে যেখানে সেখানে। বাবলুর প্রিয় টু-ইন-ওয়ানটাও মুখ থুবড়ে পড়ে। তার পিঠে হুমড়ি খেয়ে আছে মিহিরের শখের ভিসিপি। জাদুঘর থেকে কেনা শ্যামলীর অবলোকিতেশ্বর দু-টুকরো। শ্যামলীর সাধের সংগ্রহ ছোট ছোট পিতলের শো-পিসগুলোকেও যত্রতত্র ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। দেখে মনে হয় কেউ যেন হিংস্র আক্রোশে এলোপাথাড়ি ঘেঁটেছে শৌখিন ঘরটাকে।

মিহিরের মাথা ঝিমঝিম করছিল। অফিস থেকে হঠাৎ ফিরে ঘরের এই দৃশ্য দেখলে কারই বা মাথা সুস্থ থাকে। তবু কপাল ভালো অন্য ঘর দুটো রক্ষা পেয়ে গেছে। মিহিরের ঘর আর বাবলু ঝুম্পার ঘর রোজ যেমন থাকে তেমনই তালা বন্ধ।

আশ্চর্য! এ কেমন ধারা চুরি করতে আসা!

মিহির হতভম্ব মুখে বেতের মোড়াটা টেনে বসে পড়ল। এই মুহূর্তে বাড়িতে পরিবারের সদস্য বলতে সে ছাড়া আর কেউ নেই। শ্যামলী অফিসের পর কোথায় যাবে বলে গেছে। ফিরতে রাত হবে। ঝুমাও বাড়ি নেই। থাকেও না এ-সময়ে। সামনের বছর হায়ারসেকেন্ডারি, স্কুল ছুটির পর তিন-চার জন বন্ধুর সঙ্গে সে টিউটোরিয়ালে চলে যায়। ফিরতে সেই সন্ধে। আর বাবলুর তো এখন বাড়িতে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। কলেজে

ঢোকার পর থেকেই উড়তে শিখেছে ছেলে। কলেজে আড্ডা। কলেজের পর আড্ডা। তারপরও আড্ডা। শ্যামলী আবার তার আদরের ছেলেকে রাত নটা অবধি বাইরে থাকার অনুমতিও দিয়ে দিয়েছে। মিহিরেরও এ-সময়ে আসার কথা নয়। আজই হঠাৎ দুপুরবেলা শরীরটা একটু খারাপ লাগায় ট্যাক্সি নিয়ে সোজা বাড়ি চলে এসেছিল। কিন্তু এসেই যে এরকম একটা দৃশ্য দেখতে হবে কে জানত।

পুলিশ অফিসার এখনও ঘুরে ঘুরে দেখছে ঘরটাকে। হঠাৎ ঘুরে প্রশ্ন করল—তাহলে শুধু এই মেয়েটাই বাড়িতে একা ছিল বলছেন? মানে আপনার স্ত্রী বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে?

—হ্যাঁ, তাই তো থাকার কথা। মিহির উঠে দাঁড়াল,—আমার স্ত্রীর সরকারি চাকরি, একটু দেরি করেই কাজে বেরোয়। তার আগে আমার ছেলেমেয়ে বেরিয়ে যায়।

অ। তা এই মেয়েটা আপনাদের এখানে চব্বিশ ঘণ্টাই থাকে?

—হুঁ। ঘরের টুকটাক কাজের জন্য রাখা হয়েছে আর কি। রান্নায় হেল্প করা। ঘরদোর পরিষ্কার। চা-ফা বানানো। অন্য ভারী কাজের জন্য আরেকটা লোক আছে। ঠিকে। সে আমার স্ত্রী থাকতে থাকতেই কাজ সেরে চলে যায়।

কথাটা বলে মিহির আড়চোখে তাকিয়ে নিল ঘরে ভিড় জমানো কৌতূহলী প্রতিবেশীদের দিকে। যেন তাদেরই শোনাল কথাটা। জানুক সকলে মিহিররা হৃদয়হীন নয়। কমবয়সি মেয়েটাকে তারা মোটেই পশুর মতো খাটায় না।

পুলিশ অফিসার আবার প্রশ্ন করলো,—এ মেয়ে কদ্দিন ধরে আছে আপনাদের কাছে?

মিহির বলল,—নতুনই বলতে পারেন। মাসখানেক হল এসেছে।

—রাখার আগে ভাল করে খোঁজখবর করেছিলেন?

—মোটামুটি। আমার শালির বাড়িতে এক বুড়ি কাজ করে, সেই দেশ থেকে এনে দিয়েছিল। তার গ্রাম সম্পর্কের নাতনি না কি যেন হয়। গরিবের মেয়ে। বাপ মরে গেছে....

—ব্যস? একটুকু রেফারেন্সেই একটা মেয়ের হাতে সংসার ছেড়ে দিলেন? যার কাছে সারাদিনের জন্য বাড়ি ছেড়ে সকলে বেরিয়ে যাচ্ছেন, সে কেমন, তার পাস্ট হিস্ট্রি কী দেখে নেবেন না? পুলিশ অফিসারের গলায়

আলগা ধমক,—এত করে আপনাদের বলা হয় নতুন লোক রাখলে থানাতে ইনফরমেশান দিয়ে রাখুন, ছবি দিন, ঠিকানা দিন, আপনারা কিছুতেই কথা শোনেন না। এই ক্যালাসনেসের জন্য চারদিকে চুরিডাকাতি কত বেড়ে যাচ্ছে জানেন?

মিহির ঢোক গিলল,—এই মেয়েটা কিন্তু একদমই হাবাগোবা। সত্যিই একেবারে গ্রাম থেকে এসেছে, কলকাতার কিছুই চেনে না।

—বাহ, তাতেই একজনের চরিত্র পড়া হয়ে যায়? দশাসই চেহারার ভদ্রলোক বেশ বিরক্ত এবার, জানেন গ্রাম থেকেই আজকাল বড় বড় ডাকাতের গ্যাং তৈরি হচ্ছে?

কথাটা ভুল নয়। যেখানে অন্ন নেই, যেখানে অভাব বেশি, সেখান থেকেই তো অপরাধ জন্ম নেওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তবু মিহির তর্কের খাতিরেই তর্ক করে ফেলল,—আমার শালির বাড়িতে যে কাজ করে সে কিন্তু খুব বিশ্বাসী। দশ বছর আছে।

—হাহ্‌। দশ বছর। পুলিশ অফিসার স্বরে বিরক্তি থেকে ব্যঙ্গ, —বিশ্বাসের সঙ্গে সময়ের কোনো সম্পর্ক নেই মশাই। বাইরের লোকই বলুন, আর ঘরের লোক, বিশ্বাস ভাঙতে এক সেকেন্ড সময় লাগে না। এই তো ভবানীপুরের কেসটায় দেখলেন না, পনেরো বছরের বিশ্বাসী চাকর বুড়োবুড়ি দু-জনকেই খুন করে দিল।

মিহির চুপ করে গেল। সত্যিই তো, বিশ্বাস শব্দটা এখন ক্রমশ দুর্লভ। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই।

পুলিশ অফিসার বলল, আরেকবার মেয়েটাকে ডাকুন তো মশাই। সত্যি কথাটা বার করা যায় কিনা দেখি।

বেস্পতিকে ডাকতে হল না, পাশের ফ্ল্যাটের মিসেস রায় তাকে টানতে টানতে নিয়ে এসেছে। ষোলো বছরের টলটলে যুবতী। খুব রোগা হলেও মুখে একটা আলাদা শ্রী আছে মেয়েটার। মাসখানেক শহরের জল পড়ে তার কালো রঙ বেশ উজ্জ্বল এখন। ঝুম্পার একটা পুরোনো সালোয়ার কামিজে এই ক্লিন্ন মুহূর্তেও এক অন্য ধরনের সৌন্দর্য ফুটে আছে তার শরীরে। তীব্র ভয়ে ঠকঠক কাঁপছে মেয়েটা।

পুলিশ অফিসার একবার অপাঙ্গে দেখে নিল তাকে, তারপর হঠাৎই হুঙ্কার ছাড়ল, অ্যাই ছুঁড়ি, এখনও বল কাকে ঘরে ঢুকিয়েছিলি? নইলে এমন মার মারব....

মিহির এসে মুখের বাঁধন খুলে দেওয়ার পর মেয়েটা চোখ খুলেছিল। না, ঠিক তখনও চোখ খোলেনি। আশপাশে ফ্ল্যাটের মহিলারা বেশ কয়েকবার জলের ঝাপটা দিয়েছিল তার মুখে। চোখ খুলে প্রথমে ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর সে কী ডুকরে ডুকরে কান্না!

এখন আর কাঁদছে না বেস্পতি। তার কালো গালে খড়ির দাগের মতো জলরেখা শুকিয়ে আছে শুধু।

অফিসার চিৎকার করে উঠল, কি হল কি? চুপ মেরে আছিস যে? তোর কোনো নাগর এসেছিল ঘরে?

বেস্পতি কি চমকে উঠল সামান্য? বোঝা গেল না। ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে বাঁ-পায়ের আঙুল ঘসছে।

তোর নাগর কিছু না নিয়েই পালাল যে? সুবিধা হল না?

বেস্পতি চুপ।

মিহির অধৈর্যভাবে বলে উঠল, কিরে, বল কিছু। জবাব দে।

এতক্ষণ বেস্পতি চোখ তুলেছে। মিহিরের দিকেই তাকাল, বলেছি তো। আবার বল। প্রথম থেকে বল।

আমি কাউকে দরজা খুলে দিইনি। বেস্পতির স্বর নতুন করে কাঁপছে, আমি জানি না কি করে লোকটা ভেতরে এসেছিল।

মারব তিন থাপ্পড়। অফিসারের গর্জনে ফ্ল্যাটটাই কেঁপে উঠল যেন, বন্ধ দরজা আপনা-আপনি খুলে গেল, না? ফাজলামি হচ্ছে?

সত্যি বলছি আমি খুলিনি। লোকটা ভেতরে ছিল।

তার মানে বলতে চাইছিস এ-বাড়ির লোকেরাই ভেতরে লোক রেখে গেছিল?

বেস্পতি মুখ নামাল, মামি বেরিয়ে যাওয়ার পর লোকটা এসে আমার মুখ চেপে ধরল।

তারপর?

আমি ছাড়াবার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। আমার মাথায় জোরে মারল লোকটা। তারপর কিছু আর মনে নেই।

কি রকম দেখতে ছিল লোকটা?

বললাম তো।

আবার বল।

সুন্দরপানা। সুটবুট পরা। হাতে ব্যাগ ছিল।

কে লোকটা? আগে দেখেছিস?

বেস্পতি দু-দিকে মাথা নাড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ অফিসার আবারও গর্জে উঠেছে, লোকটা তোর হাত বাঁধল না, পা বাঁধল না, শুধু মুখ বেঁধে রেখে গেল, অ্যাঁ? তুই কি আমাদের পাঁঠা ভেবেছিস? সেই সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে তিনটে, পাঁচ ঘণ্টা অজ্ঞান ছিলি তুই। বিশ্বাস করতে বলিস এ কথা? চল থানায় চল। তোর কাছ থেকে কি করে কথা বার করতে হয় দেখছি।

পুলিশ অফিসার তার নিজস্ব ভঙ্গিতে চিৎকার করে চলেছে, বেস্পতি হঠাৎ একটা আজব কাণ্ড করে বসল। আচমকাই মিহিরের পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়েছে—মামাগো আমাকে বাঁচাও গো। ও মামাগো, আমি কিছু জানি না গো।

মিহিরের এখনও সব কিছু কেমন ধন্দ লাগছে। তিনটে, সওয়া তিনটে নাগাদ বাড়ি ফিরেছিল সে। বেশ কিছুক্ষণ বেল বাজিয়েও বেস্পতির সাড়া না পেয়ে সে যখন নিজের চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢোকে, তখন বেস্পতি বাথরুমের সামনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। মুখ আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। তবে হাত-পা সত্যিই খোলাই ছিল মেয়েটার। আর খোলা ছিল বাথরুমের পিছনের দরজাটা, যেটা সচরাচর বন্ধই থাকে। ঝাড়ুদারনি সপ্তাহে একদিন বাথরুম পরিষ্কার করতে আসে, সেদিনই একমাত্র ওই দরজা খোলা হয়। হ্যাঁ, তখনই মিহির তন্নতন্ন করে দেখে নিয়েছিল সব কিছু। ডাইনিং টেবিল বা ফ্রিজের দিকে কেউ যায়ইনি। রান্নাঘর বাথরুমও যেভাবে থাকে ঠিক সেই সেই ভাবে রয়েছে। ঘর দুটোর তালাতেও হাত পড়েনি। শুধু তাণ্ডব চলেছে বাইরের ঘরেই। কেন এমন হল? না, সদুত্তর পাওয়া যাচ্ছে না কিছুতেই। বেস্পতিকে অসংখ্যবার জেরা করেও। মেয়েটা কি তাহলে একেবারে ঝানু মিথ্যেবাদী? পাড়াপ্রতিবেশী, মিহির, পুলিশের কাছেও সাজিয়ে বলতে জিভ কাঁপছে না?

তবু মিহিরের কেমন যেন একটু মায়াও হচ্ছিল মেয়েটার ওপর। তার পায়ের ওপর মেয়েটা হাপুস নয়নে-কাঁদছে, মামাগো, আমাকে পুলিশে দিয়ো নি। মামাগো, আমি কিছু করিনি গো।

মিহির চিন্তা করতে একটুক্ষণ সময় নিল। এক মাস ধরে মেয়েটাকে দেখছে, সেরকম কোনো বেচালপনা লক্ষ করেনি একদিনও। শান্ত নিরীহ স্বভাব। যে যা হুকুম করছে ঘাড় গুঁজে তামিল করে যাচ্ছে। বাবলু জল চাইল, সঙ্গে সঙ্গে জল এনে দিল। শ্যামলীর মুখের কথা খসতে না খসতে রান্নাঘরে দৌড়োচ্ছে। ঝুম্পার পায়ে পায়ে ঘুরছে সারাক্ষণ। ঝুম্পার চুল আঁচড়ে দিচ্ছে, বইখাতা গুছিয়ে দিচ্ছে। সপ্তাহে একদিন রাত্তিরে মাথায় তেল দেয় ঝুম্পা, বেস্পতির কী আগ্রহ সেই তেল মালিশ করাতে। দোষের মধ্যে মেয়েটার টিভি দেখার নেশা খুব। তা সে আজকাল কে না দেখে। তার মধ্যেও তো উঠে যায় হাজার বার। চা করে। আটা মাখে। দুধ জ্বাল দেয়। সেই মেয়ে এত সপ্রতিভ হয়ে মিথ্যে বলতে পারে? সুদূর কাকদ্বীপ থেকে পেটের জ্বালায় কাজ করতে এসেছে, মাঝে মাঝে বাড়ির জন্য লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে, এমন একটা সরল মেয়ে এর মধ্যেই কলকাতার প্রেমিক জুটিয়ে ফেলবে, এও কি সম্ভব?

পুলিশ অফিসারকে একটু আলাদা ডেকে নিয়ে গেল মিহির, আপনার কি সত্যিই মনে হয় ও মিথ্যে কথা বলছে?

অফকোর্স। রাশভারী ভদ্রলোকের চোখে সন্দেহের ঝাঁঝ, এসব মেয়েদের আপনারা চেনেন না, এদের দল থাকে, সুযোগ বুঝে.....

আমি বলছিলাম কি। মিহির মাঝপথে থামিয়ে দিল ভদ্রলোককে, আমাদের যখন কিছুই চুরি যায়নি, ওকে আর থানায় নিয়ে গিয়ে কি লাভ?

না, ওকে থানায় নিয়ে যাওয়াই দরকার। ওর পেছনে সত্যিই কোনো গ্যাং আছে কিনা জানতে হবে।

হয়তো মেয়েটাকে পুলিশের হাতেই তুলে দেওয়া উচিত, তবু কেমন যেন দুলে যাচ্ছিল মিহির। ষোলো বছরের একটা সোমত্থ মেয়েকে পুলিশ তুলে নিয়ে গেলে অনেক অঘটনই ঘটে যেতে পারে। দিনকাল মোটেই ভালো নয়। হয়তো থানার লকআপে....। মিহির তখন কি জবাব দেবে বেস্পতির বিধবা মাকে? নিজের বিবেকের কাছেও কোনো উত্তর আছে কি? তাছাড়া শ্যামলীরা কেউ বাড়ি নেই, তারা কি সিদ্ধান্ত নেয়।

মিহির আমতা আমতা করে বলেই ফেলল, আমার মনে হয় আমরা ওকে বরং ছেড়ে দিই। আজকেই আমি ওকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি।

কথাগুলো বলে মিহির ভয়ে ভয়ে তাকাল পুলিশ অফিসারের দিকে। নাহ, ভদ্রলোকের সেরকম কোনো সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া হল না। মিহিরকে খানিকক্ষণ সরু চোখে দেখে নিয়ে বলল,—তাহলে কেস লিখব না বলছেন?

না....মানে....

বুঝেছি। মেয়েটাকে তাহলে আজকেই সরিয়ে দিন। এরপর আর কিছু হলে আমরা কিন্তু দায়িত্ব নিতে পারব না।

মিহির দেখল বেস্পতির কান্না থেমে গেছে। গাঢ় কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে মিহিরের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

মিহির চোখ ঘুরিয়ে নিল।

ঝুম্পা জিজ্ঞাসা করল, বেস্পতিকে ওভাবে মুখ-বাঁধা অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তুমি নার্ভাস হয়ে যাওনি বাবা?

মিহির মৃদু হাসল, তাতো একটু হয়েছিলামই। বেল বাজালেই রোজ মেয়েটা দৌড়ে এসে দরজা খুলে দেয়, হাত থেকে ব্রিফকেস নিয়ে নেয়....প্রথমে ভেবেছিলাম ঘুমোচ্ছে। তারপর খুলে দেখি......

রাত অনেক হয়েছে। প্রতিবেশীদের আলোচনার ঝড় থেমে গেছে অনেকক্ষণ। বেহালা থেকে মিহিরের ভায়রাভাই এসে নিয়ে গেছে বেস্পতিকে। এখন খাবার টেবিলে নতুন করে শুরু হয়েছে গবেষণা।

শ্যামলী বলল, বদমাইশি। সব ওই মেয়েটার বদমাইশি। অজ্ঞান হয়েছিল না ছাই। ভান করে পড়ে ছিল। ও নির্ঘাত কাউকে বাথরুমের দরজা খুলে দিয়েছিল। যে কোনো কারণেই হোক কাজ হাসিল করতে না-পেরে পালিয়েছে লোকটা। মেয়েটাকে পুলিশের হাতেই তুলে দেওয়া উচিত ছিল। তোমার ছেড়ে দেওয়া মোটেই ঠিক হয়নি।

মিহির ভুরু বাঁকাল, তুমি এত শিয়োর হচ্ছ কী করে?

আশ্চর্য। একটা লোক ভেতরে ঢুকে ওর মুখ বাঁধল, মেরে অজ্ঞান করে দিল, অথচ হাত পা বাঁধল না, এটা হয়? এতো জানা কথাই মেয়েটা জ্ঞান ফিরলে প্রথমেই মুখ খুলে ফেলবে। এতক্ষণ ধরে ও অজ্ঞান হয়েছিল, এটাও সম্ভব নয়। তাহলে ও মুখ খুলে লোকজনকে ডাকেনি কেন? আমি বলছি গোটা ব্যাপারটাই সাজানো।

ঝুম্পা বলল, রাইট। মা বেরিয়ে যাওয়ার পরই লোক ঢুকেছে এটা সম্পূর্ণ বাজে কথা। আমার মনে হয় লোক বাবা আসার ঠিক আগেই এসেছিল। বেস্পতিই ডেকেছিল তাকে। বাবার বেল শুনেই লোকটা পালিয়েছে। মানে বেস্পতিই তাকে পালাতে বলেছে। বেস্পতি তো আর

জানত না বাবা তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। হিসেবে গণ্ডগোল করে ফেলেছে আর কি।

শ্যামলী বলল, ওই আলাভোলা মেয়ের পেটে এত শয়তানি ছিল। আগে একটুও বুঝতে পারলাম না।

বাবলু আয়েস করে রুটি মাংস চিবোচ্ছিল, অনেকক্ষণ পর পাকা গোয়েন্দার মতো বলে উঠল, দাঁড়াও। দাঁড়াও। অত সহজে একে একে দুই কোরো না। ধরে নিলাম একটা লোককে ও দরজা খুলে দিয়েছে, ঠিক? লোকটা বাথরুম দিয়ে ভেতরে ঢুকল, আমাদের ঘর দুটো বন্ধ দেখে ড্রয়িংরুমে গেল, ও কে? কিন্তু ড্রয়িংরুমে গিয়ে লোকটা ছোট ছোট খেলনাগুলোকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলবে কেন? কুশনগুলোকে নিয়েও বা কেন খেলা করবে? তার তো কাজ একটাই ছিল। হাতের কাছে ভি সি পি রয়েছে, টু-ইন-ওয়ান রয়েছে, এগুলো নিয়ে মানে মানে কেটে পড়া।

ঝুম্পা হি হি হেসে উঠল, তুই কি বোকারে দাদা!

কেন? বোকা কেন?

বারে, এটুকু বুঝতে পারছিস না, বাবা এসে গেছে বলেই তো কিছু নিতে পারেনি। এটাই তো ন্যাচারাল।

না। ন্যাচারাল নয়। বাবলু, রীতিমতো গম্ভীর, বাবা এসে বেল বাজিয়েছে, দু-চার মিনিট ওয়েট করেছে, এর মধ্যে লোকটা হ্যাড গট এনাফ টাইম। ইজি সে অন্তত ভি সি পি বা টু-ইন-ওয়ানটাকে হাতে করে নিয়ে চলে যেতে পারত। আর বাথরুমের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলে বাবা কেন, কেউই কিছু ধরতে পারত না।

শ্যামলী বলল, সে সময়ে লোকটা হয়তো বেস্পতির মুখ বাঁধছিল।

নো। ফাঁকটা কোথায় তোমরা বুঝতেই পারছ না। বাবলু খাওয়া শেষ করে উঠে পড়েছে। বেসিনে গিয়ে হাত ধুল। মুখ মুছতে মুছতে আবার সাজাল তার যুক্তিদের, তোমাদের কথা ধরতে গেলে বলতে হয় চোর নয়, কোনো পাগল এসেছিল। ড্রয়িংরুমটা তোমরা ভালো ভাবে লক্ষ করেছিলে? ঘরটাকে যেভাবে লণ্ডভণ্ড করা হয়েছে তাতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লেগেছে। চোর চুরি করতে এলে আগে টিভি, ভি সি পি, টেপ, এগুলোকেই নেওয়ার জন্যই খুলে ফেলবে। অকারণে সেগুলোকে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে দেবে না। যার অবলোকিতেশ্বর দু-টুকরো করার

পেছনে কি যুক্তি আছে? শোকেস থেকে খুদে খুদে ফালতু জিনিসগুলোকে বার করেই বা ঘর জুড়ে ছড়াবে কেন? এগুলো কি অযথা সময় নষ্ট নয়?

ঝুম্পা বলল,—হয়তো ওগুলো সরিয়ে আমাদের ঘরের চাবি খুঁজছিল।

এই তো নিজের কথায় নিজেই আটকে গেলি। বাবলু হাসছে বিজ্ঞের মতো, বেস্পতিই যদি লোক ঢুকিয়ে থাকে, তাহলে বেস্পতি ভালোমতোই জানে আমরা বাড়িতে কেউই ঘরের চাবি রেখে যাই না। ও রোজই দেখে যে যার ঘর লক করে আমরা চাবি নিয়েই চলে যাই। তবে চাবি খুঁজে লোকটাকে সময় নষ্ট করতে দেবে কেন?

হুঁ। সেটাও ঠিক। ঝুম্পা মাথা নাড়ল, আমরা চলে যাওয়ার পর বেস্পতি সোফা ডিভান সবই তো ঝাড়ে। ও ভালোমতোই জানে ওখানে চাবি থাকে না। তাহলে কুশনগুলোকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলার মানে কী?

ঠিক। ঠিক কথাই। মিহির শ্যামলীর দিকে তাকাল, আমার মনে হয় কেউই আসেনি। মেয়েটা নিজে নিজেই করেছে সব কিছু। মানে গোটা নাটকটাই।

শ্যামলী বলল, তাই আবার হয় নাকি।

হবে না কেন? হতেই পারে। মেয়েটা হয়তো সাইকিক কেস। নিজেই নিজের মধ্যে ভয় তৈরি করে। এসব কেসে মানুষ টোটাল অ্যাবনরমাল হয়ে যায়। সে তখন কি করছে নিজেও জানে না। হতে পারে বেস্পতির অ্যাড্রিনালিন সিক্রিয়েশান তখন এত বেশি হতে শুরু করেছিল যে সেই সিক্রিয়েশানের ঘোরেই নিজে নিজের মুখ বেঁধেছে। মানে ওর মনে হয়েছে কেউ ওর মুখ বাঁধছে। বাইরের ঘরটাও লণ্ডভণ্ড করার সময় ও ভাবছিল ব্যাপারটা কোনো গুণ্ডা এসে করছে। তারপর হয়তো টলতে টলতে গিয়ে বাথরুমের দরজাটা খুলে দিয়েছে।

ঝুম্পা বলল, বাথরুমের দরজাটাই খুলল কেন? কেন মেইন দরজা খোলেনি?

মিহির বলল, এটাও একটা সাইকোলজিকাল ব্যাপার। মেন দরজা দিয়ে সবসময় লোক আসা-যাওয়া করে, সে তুলনায় বাথরুমের দরজা দিয়ে কেউই আসে না বলা যায়। বেস্পতির কাছে ওই দরজাটাই তাই বেশি সেফ আর সিকিওরড মনে হয়েছে।

বাবলু ফিরে এসে চেয়ারে বসল, না বাবা। তোমার থিয়োরি পুরোপুরি

মেনে নেওয়া গেল না। বেস্পতি যদি সাইকিক কেসই হবে, তবে এতদিনে তার কোনো সিম্পটম দেখা যায়নি কেন? ও তো একা বাড়িতে থাকতে খুব একটা বেশি ভয় পেত বলে মনে হয় না।

হয়তো পেত। তোরা জানিস না। মিহিরের আচমকা রাগ উঠে গেল। সেই দুপুর থেকে একটা ঘটনাকে চটকানো চলেছে তো চলেছেই। মেয়েটাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, বাড়ির একটা আলপিনও খোয়া যায়নি, ব্যস, চুকেই তো গেছে সব। এখন আর এত অভিজ্ঞ মতামতের কী দরকার? রাগ রাগ মুখেই মিহির বলল, থাক হয়েছে। বারোটা প্রায় বাজে, এবার সব শুয়ে পড়ো।

সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলী তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়েছে তার দিকে, কেন? থাকবে কেন? বাড়িতে একটা এত বড় দুর্ঘটনা ঘটল, কেন ঘটল, তা ভাবতে হবে না?

ভেবে কী হবে? মিহির প্রায় ভেংচে উঠল এবার, ভেবে কি সমাধান হবে কিছু? হলেও-বা করবে কী? একটা ষোলো বছরের মেয়েকে পুলিশের হাতে দেবে?

পরিবেশ গম্ভীর হয়ে উঠছে ক্রমশ। শ্যামলী আর কোনো কথা বলছে না। টেবিল থেকে খাবার তুলছে ফ্রিজে। বাবলু দাঁত মাজার জন্য ব্রাশে পেস্ট লাগাচ্ছে। ঝুম্পা উঠে গেল বাথরুমের দিকে।

বাথরুমে ঢুকেও আচমকা ছিটকে বেরিয়ে এসেছে ঝুম্পা।

শ্যামলী চমকে তাকাল কী হল?

ঝুম্পার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, বাথরুমে কেউ আছে মা।

যাহ। কে আবার থাকবে?

হ্যাঁ আছে। আমার ভয় করছে। মা তুমি এসো। আমি একা একা বাথরুমে যাব না। শ্যামলী আর মিহির মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে, বাবলু হো হো করে হেসে উঠল, দূর পাগল।

ঝুম্পা তবু কাঁপছে, আমার মনে হয় সকালেও কেউ ঢুকে এসেছিল। হ্যাঁ। নিশ্চয়ই।

তুই কী করে জানলি?

বেস্পতি মিথ্যে কথা বলবে না। ও খুব ভালো মেয়ে। আমি জানি।

মিহির উঠে ঝুম্পার কাছে গেল। একরম একটা ঘটনাতে মানুষের মনে ভয় আসতেই পারে। তাছাড়া ঝুম্পাটা এমনিতেই এত নরম মনের। মেয়ের

মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে মিহির বলল, বোকা মেয়ে। বাথরুমের দরজা যদি কেউ খুলে থাকেও, ভেতরে যে ছিল সেই খুলেছে।

ঝুম্পা বিড়বিড় করে উঠল, সেই লোকটাই ওই দরজা খুলে পালিয়ে গেছে।

বাবলু আবারও শব্দ করে হেসে উঠল, হ্যাঁরে, আমি খুলেছিলাম বুঝলি? আমি।

আমি। বোকা বেস্পতিকে ভয় দেখানোর জন্য।

বাবলু হাসছে, খ্যাপাচ্ছে বোনকে, ঝুম্পা কিন্তু একটুও হাসছে না। তার ভিতু চোখ কেমন ধারালো হয়ে উঠছে ক্রমশ, ঠাট্টা করিস না দাদা, সত্যি করে বল তো, তুইই সেই লোকটা নোস তো?

বাবলু হাসছে তবু, হতেও পারে।

হতেও পারে না, হয়েছিল। ঝুম্পার স্বর সহসা ভয়ঙ্কর রকমের নির্দয়—বাথরুমের দরজা নয়, তুই হয়তো চাবি খুলে মেন দরজা দিয়েই ঢুকেছিলি?

বাবলু এবার যেন থমকেছে একটু, কী করে বলছিস?

তোর বেস্পতির ওপর নজর ছিল। আমি জানি। তুই বেস্পতিকে বিরক্ত করার চেষ্টা করতিস।

ভ্যাট।

ভ্যাট নয়, আমি দেখেছি তুই একদিন ইচ্ছে করে বেস্পতির হাত চেপে ধরেছিলি।

বাজে কথা। বাবলু হাসার চেষ্টা করছে, হাসি ঠিক ফুটছে না তার মুখে—বলতে চাস আমিই বেস্পতির মুখ বেঁধে রেখেছিলাম?

কী করেছিলি তুই ভালো জানিস।

আমি এসে নিজেদের ঘর নিজে লণ্ডভণ্ড করেছি।

হয়তো ওটাই তোর শো। সকলকে মিসগাইড করার জন্য। তোর নাম বেস্পতি হয়তো লজ্জায় বলতে পারেনি।

বাবলু হতচকিত হয়ে গেছে। স্তম্ভিত মিহির শ্যামলীও। মাথার ওপর পূর্ণ গতিতে পাখা ঘুরছে, তবু ভাদ্রের গুমোট ঝাঁপিয়ে এল ঘরে।

মিহির বেশ খানিকক্ষণ পর কথা বলল, বাবলু, ঘরে যা। এখানে আর ভ্যাবলার মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না।

বাবলু চোখ তুলল। বুঝি বাবা মার কাছ থেকে এ ধরনের কোনো কথা

শোনার জন্যই থমকে দাঁড়িয়েছিল সে। ঝুম্পাকে দেখল একবার। মিহিরকে দেখল। তারপর চোখ শ্যামলীর দিকে স্থির, মা, তুমি ঝুম্পার কথা বিশ্বাস করছ?

শ্যামলী চুপ।

বাবলু বলল, ও আমার নামে চার্জ আনছে। অ্যাবসলিয়ুটলি নোংরা চার্জ। আমি যদি বলি ও নিজের দোষ ঢাকার জন্যই......!

দোষ। কী দোষ। ঝুম্পা পলকে ফণা তুলেছে।

বাবলু ঝুম্পাকে আমল দিল না, শ্যামলীর দিকেই তাকিয়ে আছে, তোমরা কি জানো কেউ বাড়িতে না থাকলে ঝুম্পা কি করে? এক-একদিন এক-একটা বয়ফ্রেন্ড নিয়ে আসে বাড়িতে। বয়ফ্রেন্ডদের নিয়ে ঘর বন্ধ করে দেয়।

ঝুম্পা নির্বিকার, বেস্পতি আমাকে বলে ফেলেছিল মা। আরও শুনবে? ঝুম্পা সেটা জানতে পেরে বেস্পতিকে লাথি মেরেছিল।

ঝুম্পা আবারও বলল, মিথ্যে কথা।

মিহিরের মাথা ঝিমঝিম করছিল। ঠিক দুপুরবেলার মতো।

মাথা চেপে মিহির ঘরে চলে এল। একটা বিশ্রী অবসাদ আচ্ছন্ন করে ফেলছিল তাকে। চোখে হাত চেপে শুয়ে রইল চুপচাপ।

শ্যামলী এল আরও খানিকক্ষণ পর। থমথমে মুখে ড্রেসিংটেবিলের সামনে বসেছে। আয়নায় দেখছে নিজেকে।

কথা বলতে গিয়ে মিহিরের গলা ঘড়ঘড় করে উঠল, হল তো শিক্ষা। এবার অন্তত ছেলেমেয়েদের দিকে একটু নজর দাও।

শ্যামলী কথা বলল না।

মিহির বলল, শুনছ আমার কথা? এবার নিজের ফুর্তিফার্তাগুলো কমাও।

শ্যামলী ঝট করে ঘুরল, আমি অফিসে ফুর্তি করতে যাই?

অফিসের পরও তুমি বেশিরভাগ দিন বাড়ি ফেরো না।

সে তো তুমিও ফেরো না। তোমার ক্লাব আছে। আড্ডা আছে।

আমার কথা আলাদা।

কিসের আলাদা? দেরি করে বাড়ি ফেরার অধিকার একা তোমাদের? ছেলেদের? আর ছেলেমেয়েদের দায়দায়িত্ব, সংসার সামলানোর কাজ, সব আমার? আমারও বাইরে কাজ থাকতে পারে।

থাক। কাজ দেখিয়ো না। মিহির দুম করে ধৈর্য হারিয়েছে, অফিসের পর তুমি কোথায় কি করে বেড়াও আমার জানা আছে।

শ্যামলীও গলা চড়েছে?—দ্যাখো, তুমি আমাকে অপমান করছ।

অপমান এতদিন করিনি। ভদ্রতার খাতির চুপ করে ছিলাম।

কী বলতে চাইছ?

মিহির বহু কষ্টে সংযত করল নিজেকে, গলা নামাল, তোমাকে আমি তিন দিন এসপ্ল্যানেডে দেখেছি। কে ছিল তোমার সঙ্গে? তোমার সেই পুরোনো প্রেমিক, তাই না?

শ্যামলী মূক হয়ে গেল।

মিহির আবার তির হানল, দ্যাখো, তোমাকে একটা স্পষ্ট কথা বলে দিচ্ছি। তুমি যা খুশি করে বেড়াও, আমার দেখার ইচ্ছে নেই। জানারও রুচি নেই। শুধু বলে দিচ্ছি আমার ছেলে-মেয়ে যদি নষ্ট হয়ে যায় তোমাকে আমি ক্ষমা করব না।

থাক। শ্যামলীর কথা ফুটেছে এতক্ষণে, রুচি তুমি দেখিয়ো না। বাবলুরই একা নজর ছিল বেস্পতির ওপর, না? তোমার চোখ আমি দেখিনি? ভুলে গেছ একদিন রাত্তিরে বাথরুম যাওয়ার নাম করে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিলে বেস্পতিকে? মেয়েটা ঘুমোচ্ছিল? গা থেকে কাপড় সরে গেছিল? কেউ দেখেনি ভেবেছ?

মিহির গুম হয়ে গেল।

শ্যামলী বলল, ছেলের আর দোষ কী! যেমন বাপ, তেমনই তো হবে ছেলে!

মিহির বলতে যাচ্ছিল, হ্যাঁ যেমন তোমার মেয়েকে দেখে তোমাকে চেনা যায়। বলল না।

মিহির বুঝতে পারছিল শুধু তার বাইরের ঘর নয়, তার অন্দরমহলটাকেও আজ তছনছ করে দিতে চাইছে কেউ।

কে সে? কোনো বাইরের চোর? নাকি ওই উটকো উড়ে এসে জুড়ে বসা কাজের মেয়েটা? নাকি শুধুই একটা ভয়? একটা মনস্তাত্ত্বিক ভয়?

মিহির জানে না।

অবগাহন



অমাবস্যা পূর্ণিমা একাদশীতে গঙ্গাস্নান যাওয়া হেমলতা আর স্মৃতিকণার বহু দিনের পুরোনো অভ্যাস। বিশেষ কোনো তিথি বা যোগ থাকলে তো কথাই নেই। কাকভোরে বেরিয়ে পড়েন দুজনে। ছোট পিতলের ঘটি, একখানা কাপড় আর গামছা হাতে যখন রওনা দেন, আশপাশে বাড়িঘর আধবোজা চোখে সবে শরীরের আড় ভাঙছে তখন। রাতের গ্লানি গায়ে মেখে সরু গলিটা এলিয়ে আছে বাজারের মেয়েদের মতো। রাতজাগা রাস্তার বাতি মাতাল চোখে পিটপিট তাকাচ্ছে। দুই বুড়ি বড় সন্তর্পণে দেখেশুনে পথ চলেন। গলি পেরোলে বড় রাস্তা। তারপর বাস রাস্তা। তারপর ফাঁকা বাসের কোলে চড়ে হুহু করে কালীঘাট।

হেমলতা হাঁটু বরাবর কাপড় তুলে এক দলা কফ পার হলেন, —ম্যাগোঃ। এত বৃষ্টিতেও রাস্তাটা একটু পরিষ্কার হল না গো।

—হবে কী করে? পোড়ারমুখোরা ধোয়ামোছা থাকতে দেয় কিছু? দেখুন না, এই সাতসকালেও কেমন এক নাদা হেগে রেখেছে।

গোড়ালি তুলে ডিং মেরে হাঁটছেন স্মৃতিকণা। দুই বুড়িকে দেখাচ্ছে ঠিক থপথপে ব্যাঙের মতো। অনেক কসরত করে গলিটুকু পার হতে হবে। কাল রাতে জোর এক চোট বৃষ্টি হয়ে গেছে, এখন সেখানে জমে গেছে ঘোলাটে জল। আঁশটে গন্ধে ম-ম করছে চতুর্দিক। ছড়িয়ে থাকা নোংরা ন্যাকড়া, এঁটোকাঁটা, মানুষ কুকুরের পায়খানা সব মিশে একাকার। বহু কাল

এ গলির কোনো সংস্কার হয়নি। জায়গায় জায়গায় ভুমো গর্ত। পিচ ঢালাই ঢেউ খেলে গেছে।

খানাখন্দ ভরা রাস্তাটাকে টপকে এসে নাক থেকে কাপড় নামালেন দুই বৃদ্ধা। ফুটপাতের বাসিন্দারা রকদালানে উঠে যাওয়াতে এ রাস্তাটা একটু ফাঁকা ফাঁকা আজ। নেড়িকুত্তার দল যত্রতত্র গুটলি মেরে শুয়ে। পানসে আকাশ থেকে ভারী হাওয়া মাঝে মাঝে গতর নাড়াচ্ছে অলসভাবে। নিঝুম বাড়িগুলো থেকে ভেসে আসছে ফ্যান চলার চাপা শব্দ। খোলা জানলার লুটোপটি খাচ্ছে পরদারা।

দুই বুড়ি বাসস্টপে পৌঁছে দম নিলেন একটু। বাসস্ট্যান্ডের শেডের নীচে দুতিনটে লোক মাথা মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। উল্টোদিকের ফুটপাতে বসে ঘনঘন গা চুলকে চলেছে এ পাড়ার মৌরি পাগলি। নাড়িভুঁড়ি চটকানো একটা বেড়াল থেঁতলে পড়ে আছে রাস্তার ঠিক মাঝখানে। সারা রাত জলে ফুলে শরীরটা তার এতখানি, রক্ত মাংস চামড়া লোম সব দলামলা। হেমলতা আর স্মৃতিকণা একপাশে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়ালেন।

—হাড়হাভাতেগুলো একটু দাঁড়ানোর জায়গাও রাখেনি গো।

—একটা বৃষ্টি হলেই শহরটা যেন নরক হয়ে যায়। এক সময় রোজ সকালে গঙ্গাজলে রাস্তা ধোওয়া হত। কোথায় যে গেল সে সব দিন।

—ঝাঁট এখনও পড়ে। তবে ওপর ওপর। হেমলতা ঠোঁট বেঁকিয়ে আরেক বার তাকালেন চারপাশে। তখনই নজর গেছে ওদিকের ফুটপাতে। উলটোমুখো একটা বাস থেকে এই মাত্র নামল মেয়েটা। হেমলতার মুখে ভাঙচুর হল,—মণ্ডলদের মেয়েটা না।

স্মৃতিকণা ঘাড় ঘুরিয়ে জরিপ করলেন মেয়েটাকে,—এত সকালে খদ্দের ধরতে বেরিয়েছিল অ্যাঁ।

—সকাল নয় দিদি, রাত বলুন। হেমলতার মুখে ভাঙচুর হল,—রাতের অভিসার সেরে মহারানি এখন ঘরে ফিরছেন।

—ছ্যা ছ্যা, দিনটাই আজ খারাপ যাবে গো। স্মৃতিকণা নতুন করে নাকে কাপড় চাপা দিলেন।—ভোর না হতেই বেবুশ্যেটার মুখ দেখতে হল।

—মেয়েটার চেহারাটা কেমন হয়েছে দেখেছেন? কদিন আগেও কত জলুশ ছিল। অত্যাচার করে করে এখন একেবারে পোড়া কাঠ।

মেয়েটা দুজনের পাশ কাটিয়ে উদাসভাবে মোড় ঘুরে গেল। বাসি চুল তার এলোমেলো, ফোলা ফোলা চোখের নীচে গাঢ় কালি, রং জ্বলা সিল্কের ছাপা শাড়িটা লেপটে আছে শরীরে।

স্মৃতিকণা কটমট তাকালেন,—দু কানকাটা বেহায়া কোথাকার।

—ঝরনার বর বলছিল আজকাল নাকি খদ্দের ধরার জন্য ধর্মতলায় গিয়ে দাঁড়ায়।

—কান্তু বলে ওদের নাকি ঘরটরও ঠিক করা থাকে। খদ্দেরদের সেখানেই নিয়ে তোলে।

—কী ঘেন্না বলুন তো দিদি? ভদ্রলোকের পাড়ায় এমন একটা নোংরা মেয়ে। স্মৃতিকণা থুক করে থুতু ফেললেন।

হেমলতার গলায় বমি ওঠার আওয়াজ,—পাড়ার ছেলেদের একদিন বলেছিলাম, হ্যাঁরে, তোরা কিছু বলতে পারিস না? তা তারা বলে, পাড়ার মধ্যে তো কিছু করে না ঠাকমা.....তেমন নোংরামি দেখলে আমরাও কি চুপ করে থাকতাম।

—ওদের আর দোষ কি। উঠতি বয়সের ছোকরা সব, অমন একটা ডগডগে ছুঁড়ি নাকের ডগায় খেলে বেড়ালে......

—পাড়াটা দিন দিন কেমন পালটে যাচ্ছে দেখেছেন? এই তো মুখুজ্জেদের সেজ বউ শুনি সেদিন দেওরের সঙ্গে..........

—মেয়ে বউ কে এখন বাদ আছে দিদি। অনাছিষ্টি অনাচারে ভরে গেল দেশটা। কারুর একটুকু পাপবোধ নেই।

একটা সরকারি বাস এসে দাঁড়িয়েছে। কথা বলতে বলতেই দুই বুড়ি সেঁধিয়ে গেলেন বাসের খোলে।

নির্জন রাস্তা ছিঁড়ে ছুটে চলেছে বাস। ফাঁকা বাসে গুছিয়ে বসে দুই বুড়ি পয়সা বার করছেন। বন্ধ শার্সির ঝনঝন শব্দের সঙ্গে ইঞ্জিনের আওয়াজ মিশে কানে তালা লাগার জোগাড়। দরজার দিক থেকে ছুটে আসছে কনকনে জোলো বাতাস।

হেমলতা সরে বসার চেষ্টা করলেন, একটু,—আবার মনে হয় বৃষ্টি নামবে।

—নামুক। নামুক। সব ভাসিয়ে নিয়ে যাক। হেমলতা হাতে পয়সা চেপে আঁচলের গিঁট শক্ত করে বাঁধলেন,—ভগবান নেয়ও না আমাদের। আরও কত কি যে দেখতে হবে।

—যা বলেছেন। অসভ্য বেহায়াদের যুগ এটা। ওই মেয়েটাকেই দেখুন না। দাদাটা যাহোক বিয়ে তো দিয়েছিল একটা। তুই ঘর করতে পারলি না, বছর না ঘুরতে ফিরে এলি। তোরই তো চরিত্তির.....

—নাগো দিদি, মেয়েটা আগে এরকম ছিল না। হেমলতার গলা আচমকা নরম যেন, অনেকদিন থেকে দেখছি। বাপ-মা মরা মেয়ে। দাদাটা তো পাঁড় মাতাল। বউদিও শুনি দজ্জাল খুব। বিয়ে দিয়েছিল এক লম্পটের সঙ্গে। তা সে হারামজাদা নাকি মারধোর করত খুব। খেতে পরতেও দিত না। আরেকটা মাগির সঙ্গে পিরীত করে এটাকে ঘাড় ধরে বার করে দিয়েছে।

—লেখাপড়াও তো শেখেনি কিছু।

—শিখলে কি আর এই গতি হয়। তবে লেখাপড়া শেখা মেয়েবউও তো দেখছি অনেক। তফাত নেই কোনো।

—তা যা বলেছেন। অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন স্মৃতিকণা। লেখাপড়া জানা মেয়েদের অবজ্ঞা আর অবহেলা সম্বল করেই তো তাঁর এখন বেঁচে থাকা। কোন যুবতী বয়সে বিধবা হয়েছিলেন। এঘাট সেঘাট ঘুরে শেষবেলায় এসে ঠেকেছেন ভাইপোদের সংসারে। আত্মীয়-পরিজনদের হেঁশেল ঠেলে জীবন কেটে গেল। ভাইপো দুটোর তাও কিছু টান আছে। শত হলেও পিসির হাতে মানুষ। দুই বউ মিলে মাথা চিবোচ্ছে তাদের। আজকালকার মেয়েদের সঙ্গে তাঁদের এত তফাত। পিসিশাশুড়িই হোক আর শাশুড়ি হোক, কাউকে অভক্তি অবহেলা করার জো ছিল না সেকালের মেয়েদের। তাঁর দুই ভাইপো বউ তাঁকে উল্টো ট্যাঁকে গোঁজে। পিসি নাকি বাতিকগ্রস্ত, পিসি নাকি হিংসুটে, দিনরাত এঁটোকাটা ছোঁয়াছুয়ি নিয়ে খিটমিট করছে। তা তোরা সব চোখের সামনে অনাচার করবি, বলা যাবে না কিছু? ভাইপো দুটোও আজকাল তাল দেয় বউদের সঙ্গে। স্মৃতিকণার চোখের কোণে জলীয় বাষ্প জমে গেল। হেমলতার স্পর্শে চমকে তাকালেন।

—কী ভাবছেন? আবার ভাইপো বউরা মুখ করেছে তো?

—ও তো দিদি নিত্যদিনের ব্যাপার। স্মৃতিকণা ফোঁস করে শ্বাস ফেললেন,—ভাবছি মরণ এত দেরি করছে কেন? আর কতদিন এই দুনিয়ার বাস করতে হবে?

—এত ভেঙে পড়ছেন কেন দিদি? হেমলতা আলতো হাত রাখলেন স্মৃতিকণার উরুতে,—আমার অবস্থা ভাবুন তো। আপনার তো তবু কপাল ভালো, ভগবান দিয়ে কাড়েন নি। আর আমার? ছ ছটা ছেলের একটাও বাঁচল না। জন্মেই মরে গেল। রাগে দুঃখে কর্তা আবার বিয়ে করল। সতিনের ঘর করার কী জ্বালা, যে করেছে সেই শুধু জানে। রাগ করে চলে এলাম বাপের বাড়ি। এক ঝিগিরি থেকে আরেক ঝিগিরি। কর্তাও আর নিতে এল না। আমার মতো দজ্জাল মুখরা মেয়ে নিয়ে নাকি ঘর করা যায় না। ভালো। তা লক্ষ্মীমন্ত বউও তো কপালে সইল না তোমার। সেই থেকে একবার এ ভাই-এর বাঁদি হই, তো ও ভাই-এর রাঁধুনি। বোনঝি এখন এত আদর করে কেন রেখেছে বোঝেন না? দুটিতে চাকরি করতে বেরোয়। সারাদিন তাদের কচিটাকে সামলাবে কে?

—হুঁ। স্মৃতিকণা মাথা দোলালেন,—আয়া রাখতে খরচা অনেক।

কালীঘাট আসছে। দুই বুড়ি ছলছল চোখে উঠে দাঁড়ালেন। রাস্তায় নেমে কোমর টান করার চেষ্টা করলেন দুজনেই। অমাবস্যাতে দুজনেরই বাতের ব্যথা বড় বাড়ে।

সেই যে সেদিন বৃষ্টি নামল, তারপর একটানা শুধু বর্ষা আর বর্ষা। ঢালাও জলে কদিন কলকাতা একেবারে ডুবুডুবু। স্মৃতিকণা হেমলতা দুজনের বাড়িতেই জল উঠেছিল। এঁদো গলিটা জুড়েই তো এক কোমর জল। শেষে দিন আটেক পর এক ফালি ঝকঝকে রোদ উঠতে দুপুরে নাতনিকে ট্যাঁকে করে হেমলতা বেরিয়ে পড়লেন বাড়ি থেকে। স্মৃতিকণার সঙ্গে কটা দিন গল্প করতে না পেরে মনে মনে হাঁপিয়ে উঠেছেন,—ও দিদি, খবর শুনেছেন? মণ্ডলদের মেয়েটার নাকি খুব অসুখ?

—মরুক। ও মেয়ের মরাই উচিত। হেমলতা ঝামটে উঠলেন।

—এবার বুঝি মরবে। রথীনের বউ বলছিল কী সব খারাপ রোগে ধরেছে।

—সেকি? আমি যে কাল শুনলাম মেয়েটার পেট হয়েছে?

—পেট তো হয়েইছে। স্মৃতিকণার চোখ নাক মুখ সব একসঙ্গে কথা বলে উঠল,—সঙ্গে খারাপ রোগও। পাশের বাড়ির খুকু বলছিল, এই কদিনেই নাকি শয্যা নিয়েছে।

—কই, সেদিন তো দেখে এতটা বোঝা যায়নি।

—আমিও তো তাই বললাম খুকুকে। তা খুকু বলে ওই রোগ নিয়েই নাকি বেরোত। কদিন ধরে নাকি আর ওঠার ক্ষমতা নেই। চাকা চাকা ঘা বেরিয়েছে। শুনছি দাদাই নাকি লাইনে নামিয়েছিল বোনকে।

—সেকি গো? হেমলতা শিউরে উঠেছেন।

—হ্যাঁ দিদি, আমাদের কালে বাপভাইরা ঝিগিরি করালেও ঠাঁই দিত ঘরে। দু'মুঠো ভাত দিত। এখন নিজের পেটের ভাত নিজেকেই জোগাড় করতে হয়।

—নুড়ো জ্বেলে দিই এমন যুগের মুখে। হেমলতা আর দাঁড়ালেন না। নাতনিকে সাপটে তুলে বাড়ি ফিরলেন। বুকটা হঠাৎই টিপটিপ করতে শুরু করেছে। নাতনিকে দুধ খাইয়ে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গেলেন। ঝরনাদের জন্য আজ কিছু ভালো জলখাবার করে রাখবেন। তবু যা হোক তাকে তো দুবেলা খেতে পরতে দিচ্ছে ঝরনা। মুখ ঝামটা একটু বেশি দেয়, তা দিক, কে আর কবে তার সঙ্গে মধু ঝরিয়ে কথা বলেছে।

রাতে সেদিন এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন হেমলতা। পাঁকভর্তি এক পুকুরে পড়ে হাঁসফাঁস করছেন তিনি। চারদিকে তার নিকষ অন্ধকার। পেটের ভেতর এক শিশু হাত পা ছুঁড়ছে। শিশুটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠেই মিলিয়ে গেল। হেমলতার সামনে এবার পতপত করে উড়ছে একটা সাদা থান। তারপর আবার অন্ধকারই অন্ধকার। আচমকা সেই অন্ধকার ফুঁড়ে গনগন করে উঠল একউনুন আঁচ। হেমলতা হাতা কড়া খুন্তি খুঁজছেন। কে যেন বলে উঠল,—খাওয়া পরা দিতে পয়সা লাগে না? হেমলতা ঠিক বুঝতে পারলেন না কথাটা কে বলল। একবার মনে হল দাদার গলা, একবার মনে হল বাবার। আবার মনে হল না, ওটা তাঁর কর্তারই গলা ছিল। হেমলতা ছটফট করে উঠলেন। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন। পারছেন না। নিজের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠছেন বার বার। তাঁর গা হাত ভর্তি দগদগে ঘা।

অন্ধকার ঘরে, ঘুম ভাঙার পরও, অনেকক্ষণ স্বপ্নটা লেগে রইল চোখে। ভোর হয়ে আসছে। সকালের মুখে এখন বেশ ঠান্ডা পড়ে, তবু ঘামে ভিজে গেছে গোটা শরীর। হেমলতা উঠে মুখে চোখে জল দিলেন। তারপর দরজা খুলে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন বাইরে।

মেয়েটার মাথার কাছে বসে আছেন স্মৃতিকণা। হেমলতা ঘরে ঢুকতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন দরজায়।

হেমলতাকে দেখে স্মৃতিকণা অপ্রস্তুত মুখে উঠে দাঁড়ালেন,—দিদি, আপনিও এসেছেন? আসুন।

হেমলতা যেন এক ঘোরের মধ্যে হেঁটে চলেছেন। ভেতরে এসে বসে পড়েছেন মেয়েটার মাথার কাছে। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে মেয়েটা। তার দু গাল বেয়ে দুটো মোটা জলের দাগ।

স্মৃতিকণা ম্লান হাসলেন,—মেয়েটার জন্য সারা রাত খুব মন খারাপ লাগছিল। শুনলাম দাদা নাকি একতলার এই ঘরে চালান করেছে বোনকে। বউদি দূর থেকে খাবার ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিয়ে যায়।

হেমলতা ঢোক গিললেন—এখন আছে কেমন?

—কথা বলতে পারছে না। রোগ জোর কামড় বসিয়েছে। গুরুদেবের আশ্রম থেকে কিছু টোটকা এনে দিলে......

—আমিও তাই ভাবছিলাম। হেমলতা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে উঠছেন।

—দাদাটা ডাক্তার দেখায় নি নিশ্চয়ই?

—বোধহয় দেখিয়েছে। দেখুন না, এই তো এখানে কটা ওষুধ আর মলম রাখা। তা মলম লাগাবেটা কে? কেউ আর কাছে ঘেঁসছে না।

—কই, দিন দেখি মলমটা আমার হাতে।

হেমলতা যত্ন করে মলম লাগিয়ে দিচ্ছেন শরীরের ঘায়ে। স্মৃতিকণা মেয়েটার মাথায় বালিশ তুলে দিলেন ভালো করে। কপাল ছুঁয়ে তাপ দেখলেন। মেয়েটা অস্ফুটে কী যেন বলে উঠল। কী বলল বোঝা গেল না।

সারা শরীর তার ফুলে উঠছে। চোখের নীচে চাপ চাপ কালি। জড়ানো স্বরে একবার যেন ডেকে উঠল,—মা। মাগো........

দুই বুড়ি এক সঙ্গে ঝুঁকে পড়লেন,—শোন রে, তোর কোনো ভয় নেই। আমরা তোর কাছে আছি। তুই ঠিক ভালো হয়ে উঠবি।

মেয়েটা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

—এই দ্যাখ, কাঁদিস কেন। একদম কাঁদবি না। লড়াই করতে গিয়ে কাঁদলে চলে? মেয়েটা তবু কাঁদছে।

দুই বুড়ি এবার মেয়েটার খুব কাছে মুখ নামিয়ে আনলেন, —পেটেরটাকে বাঁচাতেই হবে রে। খবরদার। ওটা যেন নষ্ট না হয়।

দিনের আলো উজ্জ্বল হচ্ছে ক্রমশ। মেয়েটাকে ঘুম পাড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন দুই বুড়ি। বাইরে এসে পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন।

হেমলতা বললেন,—চলুন দিদি, গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আসি।

স্মৃতিকণা চোখ রাখলেন হেমলতার চোখে,—আমিও তাই ভাবছিলাম। এখন আর গঙ্গাস্নান না করে ঘরে ফেরা যায় না।

দুই বুড়ি পথের সব ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে বাস রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন।

বাইরে রাস্তা, ভেতরে রাস্তা



রাস্তাটা একেবারে জানলার ধারে। এত ধারে যে মাঝে মাঝে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। ঘরটাকেই রাস্তা ভেবে ভ্রম হয় তখন। কিংবা রাস্তাটাকে ঘর। কী যে গা ছমছম করে। গোপন একটা ভয় হিমবাহ হয়ে গড়াতে থাকে তুলিকার শরীরে। ভয়ঙ্কর শীতলতায় মন অবশ হয়ে আসে। কেন এমন হয়? কেন শুধু তারই এমন হয়? প্রভাতবেলার সূর্যটা যেই জানলা দিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো আলো ছড়াতে শুরু করে, অমনি রাস্তাটা গুটি গুটি সেঁধিয়ে আসে ভেতরে। জোর জোর ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙায়।

—তুলি... অ্যাই তুলি...

তুলি ধড়ফড় করে উঠে বসে। বুক থেকে খসে যাওয়া আঁচলটাকে তাড়াতাড়ি তুলে নিজেকে ঢাকে।

রাস্তা আবার ঠেলা দেয়,—শুনতে পাস না? কী রে? অ্যাই?

কোনো কোনো দিন তুলিকা সাহস করে বলে ফেলে,—না, শুনতে পাই না, কী চাই তোমার? কেন আসো?

—কেন আসি জানিস না?

—চলে যাও। এবার আমি কিছুতেই দেব না। তুলিকা প্রাণপণে নিজের হাঁটু দুটোকে জাপটে ধরে। থুঁতনি গুঁজে দেয় দু হাঁটুর মাঝখানে। যেন একমাত্র ওভাবেই গর্ভস্থ ভ্রূণটাকে লুকিয়ে ফেলা যায়। সব অঘটনের হাত থেকে। অমঙ্গলের হাত থেকে।

রাস্তা তবু সামনে থেকে যায় না। তুলিকা চোখ বুজে ফেলে। বন্ধ চোখেও সে স্পষ্ট দেখতে পায় সমস্ত ঘর জুড়ে নীলচে আবছায়া। সেই আবছায়ায় রহস্যের মতো ফুটে রয়েছে তার ঘরগেরস্থালি। ড্রেসিং টেবিল, আলমারি, শোকেস, আলনা। আলনায় রাখা ডুরে শাড়ির গায়ে থোকা থোকা আলো-আঁধার। তারই গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শয়তান রাস্তাটা। গাভর্তি বিশ্রী ক্ষতচিহ্ন। ঘিনঘিন করে ওঠে শরীর। মাগোঃ চাউনিটাও কী নোংরা! যেন চোখ দিয়েই চেটেপুটে নেবে সব কিছু। কালো মাড়ি বার করে খ্যাক খ্যাক হাসে আবার! অসহ্য! তুলিকা বন্ধ চোখেই ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বামীর গায়ে।

—এই শুনছ? এই? ওঠো না।

অঞ্জন সাড়া দেয় না। ভোরবেলার ঘুম তার বড় গভীর। তুলিকার ধাক্কায় ঘুমন্ত শরীর সামান্য নড়াচড়া করে মাত্র। পাশ ফিরে শোয়। অস্ফুট শব্দে ওঠে গলা থেকে।

তুলিকা কাতর ভাবে তাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ে। শিশুর মতো মুখ গুঁজে দেয় ঘুমের গন্ধমাখা খোলা পিঠটায়। পিঠটা বেশ বড়সড়। অনেকখানি চওড়া। মাঝখানে আলতো খাঁজ। সেই খাঁজে মুখ ডুবিয়ে তুলিকা মানুষটার শরীরে জমা রাতের বাষ্পগুলোকে নিজের নিশ্বাসে ভরে নেয়। ভরসা খোঁজে। যতক্ষণ না আরও আলো আসে ঘরে। যতক্ষণ না রাস্তাটা বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

এরকমই হয় প্রতিদিন। নতুন একটা দিন আসার আগে।

নতুন একটা দিন আসার আগে ঘুম ভাঙে শিবদাস পাগলারও। তার ফালিমতন ঘরটার পিঠে আরেকখানা ঘর। অন্য ভাড়াটের। সেখান দিয়ে দিনটা ঠিক এসেও আসতে চায় না তার কাছে। কেন যে রোজই এত দেরি করে শিবদাস বুঝতে পারে না। মাথার ওপর টিনের ছাউনিতে অজস্র ছোট-বড় ফুটো। সেই ফাঁকগুলো দিয়ে সকালটা অনেকক্ষণ লুকোচুরি খেলে তার সঙ্গে। একসময় পেছনের গলিতে লোকজনের হাঁটাচলা শুরু হয়। টুকরো টুকরো কথা তন্দ্রার মতো ভেসে ওঠে। ডুবে যায়। ফের ভাসে। মিলেমিশে এক হতে থাকে পচা নর্দমার ভ্যাপসা গন্ধগুলোর সঙ্গে। শিবদাস

তখনও ঠিক বুঝতে পারে না সকাল এল কিনা। রাত থেকে দিনটাকে আলাদা করতে একটু বেশিই সময় লাগে তার। পিটপিট চোখে চারদিকে তাকায়। শতজীর্ণ ঘরের একটা কোণে তখন গুটিসুটি মেরে বড়ো ক্লান্ত ভঙ্গিতে ঘুমিয়ে থাকে শিবদাসের দুঃখী বউটা। আবছা অন্ধকারে শিবদাস তাকে দেখেও দেখে না। আচ্ছন্নের মতো উঠে গিয়ে দরজা খোলে। পাশের ভাড়াটের ঘর পেরোলে মাটির উঠোন। উঠোনের পর সদর দরজা। তারপর কাঁচা রাস্তা। শিবদাসই প্রথম সদর দরজা খোলে রোজ। বাইরে এসে আধভাঙা লাল রোয়াকটায় পা মুড়ে বসে। সদ্যফোটা দিনটার দিকে বোবা চোখে তাকায়।

রাস্তা জিজ্ঞাসা করে—কী হে শিবদাস? সকাল এসেছে তবে?

শিবদাস ঘটঘট মাথা নাড়ে।

—চলো তবে বেরিয়ে পড়ি।

শিবদাস বিড়বিড় করে—এখন বেরোলে খোকার মা বকবে যে।

—বকুক। তুমি এসো তো আমার সঙ্গে।

শিবদাস দাঁড়িয়ে উঠেও বসে পড়ে। খোকার মা উঠোন পেরিয়ে ঠিক এদিকেই আসছে। এত পা টিপে বার হয় রোজ, তবু কী করে যে টের পেয়ে যায় বউটা? রোজ পেছন পেছন চলে আসে। সময় বুঝে পথ আগলে দাঁড়ায়—চলো। চোখমুখ ধুতে হবে না?

কোনোদিন বলে—চা করেছি। ঘরে এসো।

শিবদাস আমতা আমতা করে—একটু এদিক ওদিক দেখে আসি না হয়। বেশি দূরে যাব না।

—না। বউ গলায় শাসন আনে—এখন নয়, পরে।

শিবদাস সুড়সুড় করে ঘরে ফেরে। পৃথিবীতে একমাত্র এই বুড়ি বউটার ধমককেই ভয় পায় সে। উঠোন ডিঙিয়ে পেছন ফিরে তাকায়। দরজা ধরে রাস্তা তখনও ডাকতে থাকে—ও শিবদাস, এলে না তবে? এত কষ্ট করে তোমার জন্য সকাল নিয়ে এলাম...

শিবদাস নিজের মনে বলে ওঠে—আসছি, আসছি। রোসো একটু।

রাস্তা তবু তার পা ধরে টানে। টানতেই থাকে।

দুই

ঘুম থেকে উঠেই জানলার পরদাটাকে ভালো করে টেনে দিল অঞ্জন। এত ভারী পরদা কী করে যে বারবার সরে যায়। রাতে শোবার আগেও টেনেছিল ভালো করে। তবু দ্যাখো...। অঞ্জন মনে মনে বেশ বিরক্ত হল। জানলাটাকে একেবারে বন্ধ রাখাও চলে না। ওখান দিয়েই যা একটু হাওয়া-টাওয়া আসে ঘরে। তার দোলাতেই রাতে কখন টুক করে সরে যায় কমলারং পরদাখানা। পুরো সরে না। ছেনাল মেয়েদের মতো এলোমেলো করে রাখে নিজেকে। ফাঁকফোকর দিয়ে টুকুসটুকুস রাস্তা উঁকি মারে। তাই দেখেই ভোরবেলা কেন যে এত ভয় পায় তুলিকা!

জানলা থেকে সরে এসে অঞ্জন গোমড়া মুখে বলে উঠল—আসলে এ বাড়িতে উঠে আসাটাই ভুল হয়েছে আমার। কে জানত এখানেই এলেই তোমার মাথায় নতুন ভূত চাপবে!

তুলিকা ম্লান হাসল। কিছু কিছু ব্যাপার থাকে যা কাউকে বলা যায় না। অনেক কাছের আপনজনকেও না।

অঞ্জন নরম হওয়ার চেষ্টা করল একটু—কেন কিছুতেই তুমি মনে জোর আনতে পারছ না বলো তো? এসময় মনটা একেবারে ফ্রি রাখা দরকার। সব সময় এভাবে ভয় পেলে...

—এ বাড়ি এখন আর চেঞ্জ করা যায় না, না? তুলিকা ফস করে বলে ফেলল। বলেই লজ্জিত হল। মাত্র দেড়মাস হল বাড়ি বদলেছে। শরীরের মধ্যে আবার একজন এসেছে টের পেয়েই জেদ ধরে বসেছিল—অন্য কোথাও চলো। তাড়াতাড়ি। এখানে থাকলে আবার কিছু একটা হয়ে যাবে।

অঞ্জন প্রথমটা আমল দেয়নি—বাজে চিন্তা বাদ দাও তো! যত সব কুসংস্কার।

হয়তো কুসংস্কার। হয়তো অন্যায় বায়না। তবু তুলিকা কী করে ভোলে আগের বাড়িতে পর পর তিনবার তার...উফ্। তার নাকি জরায়ু দুর্বল! ফেলোপিয়ান টিউবেও কিসব গণ্ডগোল! তার জন্যই...। বাজে কথা। তুলিকা বিশ্বাস করে না। ওখানে কেউ নির্ঘাত তুকতাক করত কোনো। মাসিমা সেরকমই বলেছিলেন। ওই যে বাড়িওয়ালার মেজ মেয়েটা, ওই যাকে বিয়ের পর থেকে স্বামী নেয় না, সেইই নির্ঘাত বাণ মারত। নতুন বউদিও সেই রকম বুঝিয়েছিল তুলিকাকে। নইলে পাঁচ মাস ছ মাস পেটে থাকার পরও তরতাজা প্রাণগুলো নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া বাড়িটাও ছিল কেমন অন্ধকার মতো। দুটো ঘরের একটাতেও আলোবাতাস ঢুকত না। গলি দিয়ে সামনের বাড়ি পেরোলে তবে রাস্তা, ইচ্ছে করলেও মানুষের মুখ দেখার উপায় নেই। শেষের দিকে তুলিকার তো দমবন্ধ হয়ে আসত।

—এবারও কিছু হয়ে গেলে তুমি কিন্তু দায়ী হবে, হ্যাঁ।

অঞ্জন রেগে যেত—চাইলেই কি মনের মতো সব পাওয়া যায়? কম তো খুঁজছি না। বাড়িভাড়ার রেট কী হয়েছে জানো? একটু পছন্দসই ফ্ল্যাট মানেই মোটা অ্যাডভান্স। সেলামি। সব দিক ভাবতে হবে তো, না কি?

এসব কথা তুলিকা বোঝে না তা তো নয়। এখন প্রতিটি কড়ি হিসেব করে চলার সময়। এক কামরার এই ফ্ল্যাটের জন্যই আগাম দিতে হয়েছে পাঁচহাজার। এর ওপর সামনে আবার একটা বিরাট খরচা। তবু বলে ফেলল।

—এ বাড়ি এখন ছাড়লে বাড়িওয়ালা অ্যাডভান্স ফেরত দেবে না?

অঞ্জন উত্তর দিল না। বড় অসহায় দেখাচ্ছে তাকে। তুলিকা সেদিকে তাকিয়ে নিজেকে শাসন করার চেষ্টা করল। ছি, এই ফ্ল্যাটটা নিজেই না সে পছন্দ করেছিল! একেবারে রাস্তার ধারে বলে! জোর করে হাসি ফোটালো ঠোঁটে—তুমি আজকাল কথায় কথায় এত রেগে যাও কেন বলো তো?

অঞ্জনের রাগ নেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। বউটাকে বড় ফ্যাকাশে লাগছে। রক্তশূন্যতার জন্য কী? চোখ আর গলা দুটোও বেশ ফোলা। এবারও বাচ্চাটা থাকবে কিনা কে জানে। অস্থির হাতে তুলিকার কাঁধ খামচে ধরল—প্লিজ তুলি, একটু সেনসিবল হবার চেষ্টা করো। এত ভেঙে পড়লে চলে নাকি?

তুলিকা জানলার দিকে তাকাল। নাহ, রাস্তাটা এখন আর ধারেকাছে নেই। পরদার আড়াল থেকে দেখাও যাচ্ছে না তাকে। অনেকটা হালকা লাগল নিজেকে। স্বামীর পাশ ঘেঁষে বসল,—ভেঙে পড়লাম কোথায়?

—পড়োনি?

—না-আ।

—তবে হঠাৎ হঠাৎ অমন পাগলামি করো কেন?

তুলিকা ছলছল তাকাল—ভয় করে যে।

—কিসের ভয়? কাকে ভয়?

রাস্তাকে। বলতে গিয়েও ঢোঁক গিলে নিল তুলিকা। থাক। ভয় যে পায়, ভয় শুধু তারই। অন্য কারুর নয়।

অঞ্জন কাছে টেনে আদর করল বউকে—পাগলি মেয়ে! কাকে ভয় তোমার? আমি আছি না?

তুলিকা হাসল নরম করে। হাসতে হাসতেই টের পেল আর একটুও ভয় করছে না তার। কাউকে না। একটুখানি মুখের কথাও অনেক সময়ে বড় আশ্বাস এনে দেয়।

হাসতে হাসতে চিমটি কাটল স্বামীর হাতে,—কোথায় আর তুমি আছ মাশাই? এই তো একটু পরে বেরিয়ে যাবে। ফিরবে সেই সন্ধেবেলা। এর মধ্যে এতটা সময়... দশটা থেকে সাতটা, সাড়ে সাতটা, কোনো কোনো দিন আটটা নটা... তুলিকা কড় গুনে গুনে হিসেব করতে থাকল,—তাহলে ধরো গিয়ে ন ঘন্টা, দশ ঘন্টা বারো ঘন্টা...

—তা অবশ্য ঠিক। অঞ্জনের কপাল জড়ো হল,—তোমাকে অনেকক্ষণ একা থাকতে হয়।

—তবে?

—তবে এক কাজ করা যায়। তোমাকে রানিগঞ্জে রেখে আসি কটা মাসের জন্য।

রানিগঞ্জ মানে তুলিকার বাপের বাড়ি। সেখানে থাকার মধ্যে আছে মাত্র দুই দাদা-বউদি। প্রথমবারের বাচ্চাটা ওখানেই নষ্ট হয়েছিল। যাবার ঠিক সাতদিনের মাথায়। ভাবতে গিয়েই আঁতকে উঠল তুলিকা—কখ্খনো না। আমি এখন মোটেই রানিগঞ্জ যাব না।

—তাহলে মাকে নিয়ে আসি বড়দার ওখান থেকে। কিংবা বড়দিকে যদি বলি...

—না, না। সজোরে মাথা নাড়ল তুলিকা—এত তাড়াতাড়ি কাউকে ব্যতিব্যস্ত করার কোনো মানেই হয় না। মা বুড়ো মানুষ। আগেরবারই ওনার খুব কষ্ট হয়েছে। আর বড়দিই বা সংসার ফেলে এতদিন ধরে এখানে...

—বেশ, তবে রাতদিনের লোক দেখি একটা?

—দুর! এই একটা ঘরে তাকে শুতে দেব কোথায়! দুশ্চিন্তা কোরো না তো। সবে সাড়ে তিনমাস চলছে। এর মধ্যে এত ব্যস্ত হবার কোনো প্রয়োজন নেই। তুলিকা চোখ ঘুরিয়ে হাসল—আসলে নতুন বাড়ি, নতুন পরিবেশ... আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে, দেখো।

তুলিকা এরকমই। ভয় পায়, তবু ভয়টাকেই সঙ্গী করে রাখতে চায় সবসময়। অঞ্জন তল পায় না তার মনের। অফিস বেরোনোর আগে তাও একবার বলে,—দুপুরে খেয়ে উঠে লক্ষ্মী মেয়ের মতো ঘুমোবে, বুঝলে? একদম জানালায় গিয়ে বসবে না। খেয়ে উঠে মনে করে ওষুধ খেয়ো কিন্তু।

—হুঁ। তুলিকা মাথা নাড়ে।

নাড়ে বটে তবে কিছুক্ষণ পর সেকথা আর মনে থাকে না। থাকবেই বা কী করে! দুপুর হলেই জানলাটা যে চুম্বকের মতো টানে তাকে। খাওয়াদাওয়ার পর জানলার উঁচু ধাপিটায় পা মুড়ে রাস্তার মুখোমুখি বসে। আজই যেন একটা বোঝাপড়া করে নেবে, এভাবে কটমট তাকায় রাস্তার দিকে। এই সব রাস্তায় লোকজন থাকে না বড়। গ্রীষ্মের দুপুর দশ দিক ফাঁকা করে রাখে। আশপাশের বাড়ির জানলা-দরজাও বন্ধ সব। দু-একটা কাক রোদে ভিজে ক্লান্তভাবে ঝিমোয়। কুকুররা ছায়া খুঁজে ফেরে। হায় রে, ছায়া কোথায় তখন! আকাশ পৃথিবী চলে গেছে তেজি রোদের দখলে। বৈশাখী বাতাস রুক্ষ, হিংস্র। তুলিকা ব্যাকুল হয়ে এদিক ওদিক তাকায়। এক-আধটা ফেরিওয়ালাও যদি দেখা যেত এসময়! তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে রাস্তাটা বেলেল্লাপনা শুরু করে দেয় নিরালা দুপুরের সঙ্গে। দুপুরও ফুঁসতে থাকে ফণাতোলা সাপের মতো। তখনও তুলিকা কিছুতেই জানলাটা বন্ধ করতে পারে না। রাস্তার সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত যে করতেই হবে। শক্ত হয়ে বসে থাকে। প্রতিদিন লড়াইটা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, এভাবেই প্রতিদিন হেরে যায়। রোদের পিঠে, চেপে রাস্তা ক্রমে আরও কাছে চলে আসে।

একেবারে গায়ের ওপর। অদৃশ্য হাত এইবার বুঝি...। তুলিকা দুহাতে নিজের পেট চেপে ধরে। আঁচল দিয়ে আড়াল করতে চায় গর্ভকে। মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। রাস্তা যেন তার অলক্ষ্য নিয়তি, তার হাত থেকে মুক্তি নেই তুলিকার। নেই। নেই।

তিন

মুক্তি নেই শিবদাস পাগলারও। রাস্তা তাকে পাকে পাকে বেঁধে রেখেছে। সারাটা দিন পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। লোকে তাকে পাগল বলে। এই সব লোকদের মধ্যে তার আপন বউটাও আছে। হ্যাঁ, আপন বউ। পাগলা শিবদাস সেরকমই ভাবে। কারণ ওই বউ ছাড়া দুনিয়ায় তার আপন বলতে আর কেউ নেই। উঁহু, ভুল হল। আরেকজন আছে। নিশ্চয়ই আছে। সে হল শিবদাসের খোকা। একমাত্র ছেলে। অনেকদিন আগে তার বাড়ি ফেরার কথা ছিল। অনেকদিন ধরে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে শিবদাস। লোকে বলে ছেলেটা নাকি তার কবেই মরে গেছে। সবাই নাকি নিজের চোখে তাকে মরে যেতে দেখেছে! ধুস! একথা আবার সত্যি হয় নাকি? অতবড় জোয়ান ছেলেটা তার। সূর্যের মতো টকটকে রং। ঘোড়ার মতো টগবগে তেজ। সে ছেলে অমন ভুস করে মরে যেতে পারে! যত সব অলক্ষুণে কথা।

শিবদাসের কথা শুনে খোকার মা মুখে আঁচল গুঁজে কাঁদে। কপাল ঠোকে দেওয়ালে—দোহাই তোমার, এবার একটু ঠান্ডা হও। খোকা সত্যি আর ফিরবে না।

—ফিরবে না বললেই হল। শিবদাস ঠোঁট উলটে হাসে। মেয়েমানুষের যেমন বুদ্ধি, তেমনই চিন্তার গতি। লোকে কী বলল না বলল বিশ্বাস করে বসে আছে। খোকা তাদের মরলটা কবে? এই তো শিবদাস চোখ বুজলেই পরিষ্কার দেখতে পায় খোকা ঠ্যাং ছড়িয়ে শুয়ে আছে চৌকিতে। ঘর আঁধার করে। ভরসন্ধেবেলা। কদিন ধরে কী যেন তার হয়েছে। কথা বলছে না ভালো করে। খাচ্ছে না। গোঁজ হয়ে শুয়ে আছে সর্বসময়। শুধোতে গেলে দাঁত খিচিয়ে উঠছে,—বিরক্ত করো না তো। নিজেদের কাজ করো গিয়ে!

কী জমাট ভারী গলা! ঠিক যেন ঢাকের বাদ্যি। খোকার মা ভয়ে কাঁপছে। শিবদাস অফিস থেকে ফিরতেই ফিসফিস করছে এসে কানের কাছে,—কী হল বলো দিকিনি ছেলেটার?

—কী হবে? বলতে গিয়ে বলা কাঁপছে শিবদাসেরও। কবে থেকে যে নিজের ছেলেকে নিজেই ভয় পেতে শুরু করেছে! কখনই বা এমন লায়েক হয়ে উঠল ছেলে! এই তো সেদিনও বাপের কাঁধে চড়ে ঘুরত। বায়না করত এটা-সেটার জন্য। কথায় কথায় আঁচল খুঁজত মায়ের। শেষ বয়সের ছেলে আদরও পেয়েছে খুব। সেই ছেলে, দ্যাখ না দ্যাখ, হঠাৎ একেবারে লাগামছাড়া! চুল ওড়ে ফরফর করে, কবজিতে পেতলের চেন, গলায় হার, পরনে আঁটোসাঁটো রংদার জামাপ্যান্ট। কোনোভাবেই তাকে আর চিনে উঠতে পারে না শিবদাস। দশটা প্রশ্ন করলে একটার জবাব দেয়। স্কুল না পেরোতে পড়া ছেড়েছে। বন্ধুর সঙ্গে কিসের বুঝি ব্যবসা করে। খুলে বলে না কখনও। পার্টিবাজিও রয়েছে। পার্টির হয়ে মিটিং মিছিল করে। ভোটের সময় সদলবলে খাটে।

সেই দলবলই এল সেদিন গভীর রাতে। ছেলে তখন চৌকিতে শোয়া। বাপ মা নিচে, মেঝেতে পাতা বিছানায়।

—খোকা? খোকা বাড়ি আছিস?

শিবদাস আধোঘুমে গলা ওঠাল,—কে-এ? কে রে এত রাতে?

—আমরা মেসোমসাই। খোকা আছে ঘরে? নিরীহ মোলায়েম গলা।

খোকার মার তবু গলা কাঁপল। জানলার তার ধরে গলিতে চোখ বোলাল বার বার—কেন বাবা? এত রাতে তাকে কী দরকার?

—দরকার আছে মাসিমা। ডেকে দিন একটু।

ডাকতে হল না। তার আগে ছেলে নিজেই উঠেছে। অন্ধকারেই প্যান্ট জামা পরছে। শিবদাস আলো জ্বালাতে গেল, ছেলে ধমকে উঠল—আহ্।

তারপর বেরিয়ে গেল। অন্ধকার ছিঁড়ে। রাতটাকে টুকরো টুকরো করে। লোকে বলে খালপাড়েই নাকি শুয়েছিল রাতভর। যেমন শুয়ে থাকে ঘরের চৌকিতে। হাত পা ছড়িয়ে। টুঁটিটাই নাকি ছেঁড়া ছিল শুধু। আর পেটখানা দুফালা। পুলিশও সেরকম শুনিয়েছিল বটে। শিবদাস মানতে পারেনি। অত সব প্রাণের বন্ধু কখনও শত্রু হতে পারে। ওদের সঙ্গেই কোথাও নিশ্চয়ই

চলে গেছে খোকা। কাজ ফুরোলে ফিরবে। ভেবে ভেবে সেই সকাল থেকে লাল রোয়াকটায় বসে থাকে শিবদাস। সারাটা সকাল ফ্যালফ্যালিয়ে তাকিয়ে থাকে। মাস ঘোরে। বছর যায়। একটা...দুটো... পাঁচটা...আটটা বছর। বেলা বাড়লে শিবদাসের বউ ডাকতে আসে—ওঠো দিকি এবার। দুটো খেয়ে নেবে চলো।

শিবদাস বলে—আরেকটু দেখি।

শিবদাসের বউ স্বামীর পিঠে হাত রাখে। এসময় প্রতিদিনই তার গলা ছেড়ে কাঁদতে সাধ যায়। স্বামীর মুখ চেয়ে সামলায় নিজেকে। শিবদাসের চাকরিটাও গেছে অনেককাল। বদ্ধ পাগলকে কে আর চাকরিতে রাখে। দু-দুটো পেটের ভাবনা এখন ভাবতে হয় বুড়িটাকেই। এদিক ওদিক খেটে বেড়ায়। মোয়া, আচার বানায় ঘরে। তাই দিয়েই চলে কোনোক্রমে। দু' মুঠো ভাত বাড়ে স্বামীর পাতে। ছেলেভোলানো গলায় বলে, —আর কতক্ষণ বসে থাকবে গো? ওর আজ ফিরতে দেরি হবে।

শিবদাসের চোখে উজ্জ্বল হয়—খোকা বুঝি বলে গেছে তোমাকে?

—হ্যাঁগো। এখন খাও তো।

কোনদিন দুটো শাকভাত। কোনদিন শুধু পান্তা। তাই চেটেপুটে খেয়ে উঠে পড়ে শিবদাস। ময়লা ছেঁড়া শার্টখানা গায়ে গলায়। ছাতি নেয় বগলে, —তবে আমি একটু বেরিয়ে দেখি। কাছাকাছি পেলে ধরে আনব।

আগে আগে বাধা দিত বউ। আজকাল আটকায় না। সকালে তবু কথা দিয়ে বেঁধে রাখা যায় মানুষটাকে। দুপুরে কোনো বাধাই মানে না শিবদাস। জোর করলে ফল উলটো হয় বরং। ইদানীং তাই মোয়ার ঠোঙা, আচারের শিশি ঝোলায় পুরে হাতে ধরিয়ে দেয়—পারলে পথে এগুলো বেচার চেষ্টা কোরো, কেমন? মোয়া বলবে জোড়া এক টাকা। আচার বড় নিলে সাড়ে সাত, ছোট পাঁচ। কিগো, মনে থাকবে তো? বেশি দূরে যেয়ো না কিন্তু!

—না গো না। খোকাকে পেলেই নিয়ে চলে আসব। দূরে যাব কেন?

শিবদাস হনহন করে বেরিয়ে পড়ে। এ মোড় ঘুরে ও-মোড়ে যায়। এ রাস্তা থেকে ও-রাস্তা। কোন রাস্তায় যে গেছে ছেলেটা! বকবক করে রাস্তার কাছেই খোঁজ নেয়,—এবার কোন্‌দিকে যাই বলো দিকি?

রাস্তা তার হাত ধরে, ওদিকে চলো। ওই ওপারে।

পুরো একটা পাক খেয়ে শিবদাস ফের প্রশ্ন করে, —এবার কোন্ পথে যাই?

পুরোনো বন্ধুর মতো রাস্তা তার কাঁধে হাত রাখে,—এসোই না আমার সঙ্গে।

বছরভর রোদ-বৃষ্টি মাথায় এভাবেই রাস্তার সঙ্গে ঘোরে শিবদাস। ঘুরতে ঘুরতে ঘোরাটাই নেশা হয়ে যায় একসময়। পাগল মানুষের অবুঝ নেশা। হওয়াই চপ্পল ফটফটিয়ে, দুপুর পিঠে নিয়ে চরকি খেয়ে চলে। উন্মাদ মস্তিষ্কের কোষগুলো দিনে দিনে আরও তালগোল পাকাতে থাকে। খোকার চেহারা ক্রমশ ঝাপসা হয়ে যায়। খোকা যেন ঠিক কত বড়? কার মতো? ওই ছেলেটা? নাকি ওটাই? না আরেকটু লম্বা মাথায়? রাস্তা-ঘাটে ছেলেপুলে কোনো দেখলেই শিবদাস তাকে খোকা বলে ভেবে বসে—, কাছে গিয়ে গদগদ স্বরে ডাকে—ও খোকা, ঘরে ফিরবি না?

বালকের দল ভারি মজা পায়। পাগলকে ঘিরে হাততালি দিয়ে লাফায়, তার ছেঁড়াফাটা ধুতিখানা ধরে টানাটানি করে। শিবদাস মোটেও রাগে না। সামনে যাকে পায় কপাত করে তার হাত ধরে। শিশুর মতো বলে—ধরে ফেলেছি। ধরে ফেলেছি।

ছেলেরা ছটফটিয়ে ছাড়িয়ে নেয় নিজেদের। দূরে গিয়ে হাত ঘুরিয়ে নাচে—ধর তো দেখি, এই পাগলা, ধর তো দেখি!

শিবদাস কাকুতিমিনতি করে—দুষ্টুমি করে না বাবা। ঘরে চল এবার।

—না যাব না। হি হি! না যাব না। ছেলেরা তার দিকে ইটের টুকরো ছোঁড়ে—ঘরপাগলা বুড়ো রে, ছেলেপাগলা বুড়ো।

শিবদাস মরিয়া হয়ে ওঠে, ঘরে গেলে গান শোনাবো চল। সেই গানটা—সেই আলিবাবা আর চোরের গান।

—ধুস! ওসব কে শোনে? হিন্দি গান করো—হিন্দি গান। ছেলেরা হই হই করে।

—ও বাবা! শিবদাস গাল ছাড়িয়ে হাসে। দাঁতগুলোয় সব পোকা লেগেছে। ফোকলা গালে শৈশব নাচানাচি করে—কোন্ গানটা শুনবি বল

দিকি? বলে আর উত্তরের অপেক্ষা করে না, হেঁড়ে গলায় চিৎকার করে ওঠে,—এক দো তিন, চার পাঁচ ছয়... আ জা সনম, আ জা সনম... গাইতে গাইতে বগল বাজায়। জোড়া পায়ে ধিতাং ধিতাং নাচে।

গান থামলেই খোকারা হল্লা করে—আরেকটা হোক। আরেকটা হোক।

—উহুঁ, আবার কাল। বুড়ো মানুষটা হাপরের মত হাঁপায়। দম নেয় জোরে জোরে—ঘরে মা ভাত বেড়ে বসে আছে। এবার বাড়ি ফেরার পালা।

বলতে বলতে নিজেই গটগট করে এগিয়ে যায়। পথ হারিয়ে অন্য পথের বাঁকে আসে। মনে মনে গান খোঁজে নতুন। খোকাদের জন্য আজকাল শুধুই গান বেঁধে রাখতে হয় মাথায়। পথের গান। বাজারচলতি গান। সাবেকি বাংলা গান। দেশাত্মবোধক গান। সব গানের একটাই সুর। সুর নয়, নিজস্ব বেসুর। কলিগুলোও নিজের মতো করে তৈরি করে নেওয়া। কাউকে না পেলে রাস্তাকেই শোনায় গান। শেষ ধাক্কায় কালোয়াতি ছোঁয়াও রাখে অল্প। এইভাবে গানই শেষে জীবন হয়ে যায় কবে। পৃথিবীর সব শিশু হয়ে যায় নিজের সন্তান। আর দুপুরের রাস্তাগুলো হয় বেঁচে থাকা। অন্তহীন। অবিরাম।

এইভাবে চলতে চলতে একদিন হঠাৎ খোকার মাকেও পথের ধারে খুঁজে পেয়ে গেল শিবদাস। গান থামিয়ে পাগল থমকে দাঁড়াল। জানালা ধরে কে ওই বিষাদমূর্তি ছবি হয়ে বসে আছে? সেই মুখ, সেই রঙ, সেই ভাসাভাসা চোখ? শিবদাস চিৎকার করে উঠল,—ও খোকার মা? ওভাবে বসে আছিস কেন একা একা? খোকা এখনও ফেরেনি বুঝি!

তুলিকা ভয়ানক চমকে উঠল। ছিটকে সরে গেল জানলা থেকে।

শিবদাস ভাঙা গলায় আবার চেঁচাল—ভয় পাস কেন? ও খোকার মা, গান শুনবি, গান?

বৃদ্ধ উন্মাদটা জানলার ধারে এসে গেছে একেবারে। তুলিকা ঝাঁপিয়ে পড়ে জানলা বন্ধ করে দিল। মাগো, কী লাল লাল চোখ। বাজ পড়ার মতো গলার আওয়াজ। জানলার ছিটকিনি তুলে দিয়ে হাঁপাতে থাকল তুলিকা।

চার

শ্রাবণ মাসের গোড়া থেকে পেটের ভেতর নাড়াচড়া শুরু করেছে বাচ্চাটা। কুটকুট আড়মোড়া ভাঙে হঠাৎ হঠাৎ। বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে তুলিকা হাত রাখল পেটের ওপর—এই তো এখানটায় নড়ছে! ছোট্ট ঢেউয়ের মতো ফুলে উঠল একটু। উঠেই থেমে গেল। তুলিকার বুক টিপটিপ করে উঠল। আর নড়ছে না কেন? ফোলা পেটে হাত বুলিয়ে আদর করল গর্ভের কুঁড়িটাকে। ছেলেভোলানো গান ধরল গুনগুন—

খোকন আমার সোনা...
স্যাকরা ডেকে মোহর কেটে গড়িয়ে দেব দানা...

ঠিক তখনই জানলার ওপারে পাগলা শিবদাসের গলা—কই গো খোকার মা, আজ গান শুনবে না?

তুলিকা হেসে ফেলল ফিক করে। পাগল বুড়োর মুখে খোকার মা ডাকটা শুনতে কেন যে এত ভালো লাগে তার! লজ্জাও করে একটু একটু। এ ডাক শুনেই প্রথম দিন কী ভয় পেয়েছিল। ভাগ্যিস তখখুনি ঠিকে-ঝি এসে গিয়েছিল কাজে!

শিবদাস আবার ডাকছে,—কী হল রে? ও খোকার মা?

তুলিকা বিছানা ছেড়ে জানলার ধারে গেল। গলায় হালকা অভিমান—তিন দিন আসোনি যে বড়, কোথায় ছিলে?

— পথেই ছিলাম গো। এ রাস্তা, সে রাস্তা। ধুতির খুঁটে মুখের ঘাম মুছল বুড়ো। ঝোলা থেকে আচারের শিশি বার করল একটা—নে, তোর জন্য এনেছি।

তুলিকা হাত বাড়িয়ে শিশিটা নিল। গুছিয়ে বসল জানালার ধাপিতে—এবার কিন্তু দাম নিতে হবে, কত দেব বলো?

বুড়ো হাসল ফিকফিক—দাম দিয়ে কী হবে রে! নিয়ে এসেছি, খা।

—তা খাব। তুলিকা মাথা দোলালো—কিন্তু দাম এবার নিতেই হবে। নিশ্চয়ই তুমি এগুলো বেচতে নিয়ে আসো।

—তা আসি। নইলে বুড়ি বড় বকে যে।

—তবে দাম বলো।

—দুর! শিবদাসও মাথা দোলালো,—সব জিনিস কি দাম দিয়ে কেনা যায় রে?

তুলিকা চমকিত হল। হঠাৎ হঠাৎ এরকমই দার্শনিকের মতো কথা বলে ফেলে শিবদাস। বলে শিশুর মতো হাসে। এমন মানুষ কী করে যে পাগল হয়! কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে একপশলা। ভেজা আকাশটা এখনও ভারী তবু। ম্লান আলোয় টিমটিম করছে চতুর্দিকে। সূর্য আজ আর রোদ পাঠাতে পারবে না। রাস্তাকেও মটকা মেরে পড়ে থাকতে হবে ভিজে বেড়ালের মতো। তুলিকা একটু বঝি নিশ্চিন্তও বোধ করল। রাস্তা থেকে মুখ ফিরিয়ে বুড়োর চোখে চোখ রাখল,— তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

—কী রে?

—তুমি কেন মিছিমিছি রাস্তায় ঘুরে মরো বলো তো?

—বারে, না ঘুরলে তাকে পাব কী করে! শিবদাসের মুখে নির্মল হাসি—ঘুরি বলেই তো খুঁজে পাই।

—ছাই পাও। তুলিকা ঠোঁট কামড়াল—কতদিন তোমাকে বলেছি না এভাবে ঘুরবে না রাস্তায়?

—বাহ! না ঘুরলে তাকে তোর কাছে রোজ পাঠাই কী করে?

—আমার কাছে! তুলিকা চোখ কপালে তুলল।

—হাঁরে হ্যাঁ, তোর কাছে। খুঁজে দ্যাখ, তোর ঘরেই রয়েছে সে।

কাকতালীয় কিনা কে জানে, তুলিকার পেটের ভেতর বাচ্চাটা নড়ে উঠল তখখুনি। ঢেউ তুলে এপাশ থেকে ওপাশে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সব কেমন গণ্ডগোল হয়ে গেল তুলিকার। কেমন ঘোর-ঘোর লাগছে। ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে চেতনা। জানালার গ্রিল আঁকড়ে নিজেকে সামলাল। পাগলা বুড়ো যেন কত আপন এভাবে তাকাল তার দিকে—আমার খুব ভাবনা হয়, জানো?

—উহুঁ, একদম ভাববি না। শিবদাস চুকচুক শব্দ তুলল গলায়,—গান শুনবি? গান?

নতুন করে উদাস হল তুলিকা।

শিবদাস ডাকল ব্যস্তভাবে—ও খোকার মা, নাচ দেখাই তবে একটা! সেই যে সেই নাচ... ...বলেই চড়া গলায় গান ধরল,

—মাগো, বলো কবে শীতল হবো... ...কত দূর আর কত দূর...

শিবদাস পাগলের নাচের তালে মৌসুমি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে আচমকাই। বুড়োর হুঁশ নেই কোনো। ঘুরে ঘুরে উদ্দাম নেচে চলেছে, সজোরে পা ঠুকছে ভেজা রাস্তার পিঠে। প্যাচপ্যাচ আর্তনাদ করছে রাস্তা। তুলিকা খিলখিল হাসছে। হাসতে হাসতে মনখারাপগুলোকে উড়িয়ে দিচ্ছে বাতাসে।

মোড়ের মাথায় থমকে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা কয়েক সেকেন্ড দেখল অঞ্জন। ঠিক যেন কাচের অ্যাকোয়ারিয়ামে দুটো রঙিন মাছ খেলছে, হাসছে। শূন্যে লাফিয়ে বাতাস ভরতে চাইছে বুকে। পুরোটাই একটা পুরিপূর্ণ ভালো লাগার দৃশ্য। কিন্তু সব ভালো লাগার দৃশ্যকে তো আর চিরন্তন করে রাখা যায় না। বুক নিংড়ে দীর্ঘশ্বাস গড়িয়ে এল। মাথা নীচু করে নিঃশব্দে বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল অঞ্জন।

বৃষ্টি নেমেছিল আবার। অঝোরে ধারায়। রাত যত গাঢ় হচ্ছে, তেজ বাড়ছে তত। নির্জীব হয়ে আসছে পৃথিবী। এখন বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই কোথাও। এখনই কথাটা বলে ফেলা দরকার। কিন্তু কিভাবে যে শুরু করা যায়! অঞ্জন ছটফট করে উঠল—তুলি, আজ আমি ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়েছিলাম।

কথাটা কি খুব নিচু স্বরে বলল? নাকি মনে মনে? তুলিকা শুনতেই পেল না। নিজের মনে গুনগুন গান গাইছে। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুল খুলে ফেলল। ঘুরে ঘুরে দেখল গর্ভবতী যৌবনটাকে।

বুক ভারী হয়ে আসছে অঞ্জনের। তুলিকা আজকাল খুশিতে ঝলমল করে সারাক্ষণ। আশ্চর্য! একটা বদ্ধ পাগলের অর্থহীন বিশ্বাস কী করে যে এত শক্তি এনে দিতে পারে! ভয়কে জয় করার শক্তি। অঞ্জন বিছানা থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিল। অসম্ভব, এখন আর তুলিকাকে কিছুতেই ওই ভয়ঙ্কর কথাগুলো শোনানো যায় না।

বিনুনিতে গার্ডার বেঁধে তুলিকা কাছে এল তার—শোনো, এবার তুমি মাকে একটা খবর দিতে পারো, বুঝলে?

অঞ্জন অন্যমনস্ক হওয়ার ভান করল।

—কী হল, শুনছ না? তুলিকা আলগা ঠেলা দিল কাঁধে—বেশ, মাকে নয় আর কদিন পরেই আনলে। রাতদিনের লোক পাচ্ছি একটা, তাকেই না হয় রেখে দিই, কী বলো? ডাইনিং স্পেসটায় শোবে।

অঞ্জন মুখ ঘুরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল বাইরের দিকে। একেবারে গায়ের পাশে দাঁড়িয়ে তুলিকা। দুর্বল জরায়ুতে উলটোমুখো সন্তানধারণ করে। অস্থির অঞ্জন সিগারেট ফেলার ছল করে জানালার ধারে চলে এল। উদভ্রান্ত মুখে তাকাল রাস্তার দিকে। জোলো হাওয়ায় চারদিক ঝাপসা। আধো অন্ধকারে রাস্তাটাকে কী কুৎসিত লাগছে। ঠিক যেন এক চুল খোলা ডাইনি লক্ষ লক্ষ দাঁত বার করে তার দিকে তাকিয়েই হাসছে খলখল। মাথাটা কেমন দুলে উঠল অঞ্জনের। গলার কাছে দমবন্ধকরা কষ্ট। রাস্তার কি সত্যি কোনো ভূমিকা থাকে? কেড়ে নেওয়ার? ফিরিয়ে দেওয়ার? অঞ্জন বুঝতে পারছে না। শুধু টের পাচ্ছে রাস্তাটার হাত থেকে কোনো ভাবে নিস্তার নেই কারোরই। তুলিকার না, শিবদাসের না। কারোর না। বিফল আক্রোশে জ্বলন্ত সিগারেটটা রাস্তার গায়ে ছুঁড়ে মারল অঞ্জন। তারপর আচমকাই প্রচণ্ড শব্দ করে বন্ধ করে দিল জানলাটাকে।

বিস্ফোরণের প্রতীক্ষায়



ট্রেজার হান্টের প্রথম কটা পাতায় সেই কখন থেকে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে রুমি। বোলাচ্ছে তো বোলাচ্ছেই। এখনও পর্যন্ত একটা লাইনও পড়ে ওঠা গেল না। কোনো শব্দই মাথায় ঢুকছে না। একরাশ কালো দাগের দিকে তাকিয়ে থাকা শুধু। কাল রাতে সেই মারাত্মক কথাগুলো কানে যাওয়ার পর থেকে কী যেন হয়ে গেছে মস্তিকের ভেতর। মাথা ছড়িয়ে হৃৎপিণ্ড, হৃৎপিণ্ড ছাড়িয়ে আবার মাথায় গড়িয়ে ফিরছে গুমোট কষ্ট। ভেতরে ভেতরে নিঃশব্দে একটা চাপা রাগও গুটি পাকিয়ে চলেছে। যে কোনো মুহূর্তে সেই রাগ বুঝি কান্না হয়ে ফেটে বেরোয়।

ডিভানে চিত হয়ে শুয়ে রুমি বইটাকে উলটে রাখল বুকের উপর। ভালো লাগছে না। কিচ্ছু ভালো লাগছে না। এনিড ব্লাইটন, হার্ডি বয়েজ, এমনকি মিলস অ্যান্ড বুনস পর্যন্ত না। সন্দেহটা কদিন ধরেই মনে মনে চরকি খাচ্ছিল। খুব শিগগিরই কিছু যে একটা হতে চলেছে তার গন্ধ ক্রমশ তীব্র হচ্ছিল এ বাড়ির বাতাসে। নীচু গলার আলোচনা, দাদুর অধৈর্য পায়চারি, রাতে ঘুম থেকে উঠে ব্যালকনিতে মায়ের স্থির দাঁড়িয়ে থাকা আর মাঝে মাঝে দিদানের ফোঁচ ফোঁচ কান্না। সব কিছুকে মিলিয়ে দিলে অনেক কিছুই বুঝে ফেলা যায়। কপালের ওপর শুয়ে থাকা চুলগুলোকে আঙুল দিয়ে পাকাতে থাকল রুমি। নাইটি থেকে অকারণে টেনে ছিঁড়ল দুগাছা নীল নাইলনের সুতো। ঘুম থেকে উঠে আজ নাইট-ড্রেস পালটানো হয়নি। ব্রেক-ফাস্ট খেতে হয় তাই খাওয়া। কোনোরকমে একটু কিছু গিলে

শুয়ে পড়েছে। তারপর থেকে এই অবিশ্রান্ত শুয়ে থাকা। এর মধ্যেই শুনতে পেল মা আর সোনামামা বেরিয়ে গেল। দিদান বোধ হয় রান্নাঘরে। দাদুর তো সাড়াশব্দই পাওয়া যাচ্ছে না সকাল থেকে। রুমি নাইটি থেকে আরেকটা সুতো ছিঁড়ল। মা দেখলে বকত, নাইটি রাতের পোশাক রুমি, ঘুম থেকে উঠে ওটাকে চেঞ্জ করতে হয়। তাছাড়া তুমি বড় হচ্ছ, নাইটির ওপর অন্তত হাউসকোট পরতে শেখো।

মা নির্ঘাত আজ লক্ষ করেনি তাকে। করবেই বা কখন? নিজেকে নিয়েই যা ব্যস্ত। রুমি সজোরে নীচের ঠোঁটটাকে কামড়ে ধরল। নরম পাতলা ঠোঁট দাঁতের চাপে জমাট লাল। বেশ করেছে বদলায়নি। এবার থেকে কোনদিন পালটাবে না নাইটি। সারাদিনই ঘুরবে নাইটি পরে। বড়দের যদি যা খুশি করার অধিকার থাকে, তারই বা থাকবে না কেন? ঝুম এবার দুষ্টুমি করলে কেউ এসে বকে দেখুক, কথা শোনাতে রুমিও জানে।

ঝুমের কথা মনে পড়তে বুকের পাঁজরগুলো নতুন করে চিনচিন করে উঠল রুমির। ঘাড় ঘুরিয়ে গাঢ় চোখে তাকাল বোনের দিকে। আহা, বেচারি এখনও কিছুই জানে না। মেঝেতে উপুড় হয়ে একমনে ছবি এঁকে চলেছে। চোখের ব্রাশ ব্রাশ পাতাগুলো ড্রইংপেপার ছুঁই ছুঁই। চারদিকে এলোমেলো ছড়ানো কাগজ, প্যাস্টেল, ফেল্ট পেন। সব সময়ই ঘর জুড়ে এইভাবে বসে ছবি আঁকে ঝুম। পা মুড়িয়ে কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত ঝুঁকিয়ে রাখে ড্রয়িং পেপারের গায়ে। বই পড়ার সময়েও তাই। চোখ আর কাগজে দূরত্ব থাকে না বড়।

—ঝুম, অ্যাই ঝুম। বিষণ্ণ গলায় ডাকল রুমি।

ঝুম মাথা ওঠাল না। কাঁধ-ছোঁয়া থোকা থোকা চুলের রাশি দুলে উঠল সামান্য। বাঁ হাতের উলটোপিঠে কপাল চুলকোল।

—কী কালা রে বাবা। ডাকছি শুনতে পাচ্ছিস না?

—উঁ?

—দেখে আয় তো দিদান কী করছে। সঙ্গে দাদুকেও।

—কী হবে?

—আঃ, যা বলছি শোন। রুমি অধৈর্য হল।

ঝুম আবার চোখ ডোবাল আঁকায়, আমি এখন খুব ব্যস্ত আছি। তুই গিয়ে দেখে আয় না।

এই কারণেই বোনের ওপর রাগ হয় রুমির। কী যে ছাইপাঁশ আঁকে দিনভর। স্কুলে না যেতে হলেই হয়, হয় স্পাইডারম্যান, সুপারম্যান, নয় এই তুলি পেন্সিল নিয়ে বাসা। দিন দিন আদরে বাঁদর হচ্ছে। এত বেশি মুখ আর এমন অবাধ্য। চোখ পাকিয়ে উঠতে গিয়েও রুমি নিজেকে সামলে নিল। কাল যা শুনেছে তা যদি সত্যি হয়, ঝুম হয়তো চিরদিনের মতো...। রুমির গলা মমতায় ভিজে গেল, লক্ষ্মীসোনা, একবারটি দেখে আয়।

এবার পুরোপুরি চোখ তুলেছে ঝুম। বড় বড় দুচোখ ছড়িয়ে একদৃষ্টে দেখছে দিদিকে। এভাবে কেন তাকিয়ে আছে? ও'ও কি তবে খবরটা জানে? রুমির বুক শিরশির করে উঠল, যা না। প্লিইইজ।

ড্রয়িং পেপারটাকে আস্তে আস্তে গোল করে মোড়াল ঝুম। সযত্নে হলদে গার্ডার জড়াল গায়ে, আমার কোনো জিনিস টাচ করবি না কিন্তু।

রুমি আবার গাড়িয়ে পড়ল বিছানায়। অস্থির অস্থির লাগছে। দাদু দিদানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করছে। সাহস হচ্ছে না। এমনও তো হতে পারে কাল রাতে সে ভুল শুনেছে। হয়ত অন্য কাউকে নিয়ে কথা হচ্ছিল ওদের মধ্যে? তাই বা কী করে হয়? দাদু তবে এত গম্ভীর কেন? মা'র মুখও সকাল থেকে রেক্টর আন্টির মতো স্টিফ। সোনামামাই যা একটু কথাটথা বলছিল। মন ভোলানোর চেষ্টা আর কি। রুমি কি কিছুই বোঝে না?

মনে মনে একের পর এক প্রশ্ন শানাতে থাকল রুমি। দাদু না হলে দিদানই উত্তর দিক,

—মা আর সোনামামা খেয়েদেয়ে কোথায় বেরোল?

দিদান সহজে সত্যি কথা বলতে চাইবে না। বড়রা সব সময়ই ছোটদের মিথ্যে দিয়ে ভোলায়।

—কেন, তোর মা অফিস গেল। মামাও কাজে যাবে।

—লাই। আমি সব জানি।

—কী জানিস?

—আজ কেসের রায় বেরোবে। ওরা কোর্টে গেছে।

দিদান কি খুব চমকে উঠবে? নাকি মুখে আঁচল চেপে কাঁদতে বসবে কাল রাতের মতো? সেই সময়ই রুমি শেষ প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেবে, শুনলাম আমরাও ভাগ হয়ে যাচ্ছি? ঝুম একজনের দিকে আর আমি আরেকজনের? কে অপ্ট করছে আমাকে? মা, না বাবা? ঝুমই বা কার ভাগে যাবে?

দুহাতের তালুতে মুখ ঢেকে কান্না চাপবার আপ্রাণ চেষ্টা করল রুমি। ভেতরের কষ্টগুলো বাষ্প হয়ে চোখের পাতায় দানা বাঁধছে। না, কিছুতেই কাঁদবে না সে। কাঁদা মানেই তো বোকা হয়ে যাওয়া।

দুই

একটু একটু করে আকাশ বেয়ে নেমে যাচ্ছে সূর্য। বড় ধীর, মন্থর তার গতি। দুপুরটা ঠিক দুপুরের মতোই শান্ত। সময়ও শুয়ে পড়েছে তার পাশে। রুমি আরেকবার ভেতর থেকে ঘড়ি দেখে এলে। সবে দুটো পনেরো। সময় বুঝি ঠিকই করেছে আজ কিছুতেই নড়াচড়া করবে না। শুধুই ঝিমোবে সন্ধেবেলা অফিমখাওয়া করালীর ঠাকুমার মতো। কেস নিশ্চয়ই এতক্ষণে উঠে গেছে কোর্টে। বাইরে থেকে অনেকগুলো কোর্ট সে দেখছে। কোর্টসিন দেখেছে নানান ফিল্মে। একই রকম হয় কি সত্যিকারের দৃশ্যগুলো? সেই টানা টানা কিছু বেঞ্চি! কাঠের রেলিংতোলা এভিডেন্স বাক্স! আসামির কাঠগোড়া! লাল শালুতে মোড়া জজের ডায়াস! যে জজ একবার রায় দিলেই জীবন ওলোটপালোট হয়ে যায়! ভেঙে যায় মানুষের সম্পর্ক! চুলচেরা হিসেবে ভাগাভাগি হয় জমি, বাড়ি, বিষয়সম্পত্তি অথবা গোরু, ভেড়া, ছাগল, হাঁস, মুরগি। অথবা রুমিরা। ভাবতে ভাবতে পেছনে ফিরতেই রুমি দেখতে পেল ঝুম কখন উঠে এসেছে ঘুম থেকে।

রুমি হাসার চেষ্টা করল, কী রে, ঘুমোলি না?

ঝুম দুদিকে মাথা নাড়ল। ঠোঁট দুটো সামান্য ফোলা ফোলা, আমাকে একটা কাজ কমপ্লিট করতে হবে।

—কি কাজ রে?

—আছে। আচ্ছা দিদি, ডিভোর্সের মানেটা ঠিক কী রে?

রুমি দেওয়ালের পাশে রাখা বেতের মোড়ায় বসল। মুখে চিন্তার কুয়াশা। ঝুম তবে আজকের ব্যাপারটা জেনে গেছে। কতটা জানে? সবটাই কি? নইলে আজ যে বড়ো নিজে থেকে তাকে 'দিদি' বলে ডাকল! হাজার চেষ্টাতেও ওর রুমি ডাকটা বদলাতে পারেনি মা।

—বল না দিদি।

—কী করবি জেনে?

—দরকার আছে। ঝুম কাছে এগিয়ে এল, ডিভোর্সের মানে যে ছাড়াছাড়ি হওয়া তা আমি জানি। তবে ঠিক কী কী যে আলাদা হয়ে যায়...

—সব কিছু আলাদা হয়। যা এখন, ভাগ এখান থেকে। রুমি আচমকা চিৎকার করে উঠল, আমাকে আর একদম ডিস্টার্ব করবি না।

অন্যদিন হলে এ ধরনের উত্তর শুনে ঝুম ভেংচি কাটে। কিংবা কথা শোনায় কুটকুট করে। আজ সে সব কিছুই করল না। হতবাক চোখে ছলছল তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ছোট্ট ছোট্ট আঙুলগুলো দাঁতে কামড়ে ঢুকে গেল ঘরে। রুমি ওকে ডাকতে চাইল। কোনো শব্দই এল না জিভে।

ঝুমটার হাঁটাচলা, ভাবভঙ্গি অবিকল বড়দের মতো। সবসময় মা'কে নকল করে। খালি তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যেতে চায়। চোখের কাছে বই নিয়ে পড়ে বলে বাবা একদিন বলেছিল, ঝুমের মনে হয় চোখ খারাপ হয়েছে। চশমা লাগবে।

কবে যেন বলেছিল বাবা? দিদানের বাড়ি তারা চলে এসেছে সেই শীতকালে। তারও আগে। তারপর এই ক'মাসে বেশ কয়েকবার বাবার কাছে গেছে দুজনেই। বাবাই আসে নিতে। ওপরে ওঠে না। রাস্তা থেকে হর্ন বাজায়। কই, এর মধ্যে তো একবারও বাবা বলল না চোখ দেখাবার কথা! ভুলেই গেছে হয়তো।

সেদিন চশমার নাম শুনে ঝুমের সে কী ফড়িং নাচ, আমি একটা কালার্ড কাচের চশমা পরব বাপি। আলোয় নীল, অন্ধকারে সাদা।

রুমি হেসেছিল চোখ টিপে, দূর ও তো ফোটোসান। ওগুলো বড়দের চশমা।

—আমি কি কিছু ছোট আছি নাকি? ঝুম গাল ফুলিয়েছিল। বোকা মেয়ে, জানে না বড় হওয়া কী বিশ্রী ব্যাপার। শরীরটাকে ভেঙে দুমড়ে নিদারুণ

যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে হঠাৎই একদিন দুম করে বড় হওয়া আসে। কয়েকমাস আগে রুমি তা প্রথম টের পেয়েছে।

নাঃ, ঝুমটাকে বকা ঠিক হয়নি। যতই পাকা সেজে থাকুক, ছেলেমানুষ তো বটে। তাছাড়া...! রুমি ঘরে উঁকি দিল। ঝুম আবার ঘাড় গুঁজে ছবি এঁকে চলেছে। বুক নিংড়ে একঝলক কাঁপা কাঁপা বাতাস গড়িয়ে এল। আহা রে, ডলপুতুলের মতো অ্যাত্তটুকু ছোট্ট বোনটা তার। ওকে ছেড়ে কী করে যে থাকবে রুমি! কেন এমন হয়? সম্পর্ক যদি ভেঙেই যাবে, তবে তা তৈরি হয় কেন? রুমির দু চোখ টলটল করে উঠল।

সোজাসুজি ঘরটাতে দাদু খাটে ঠেস দিয়ে বসে বই পড়ছে। থমকে দাঁড়াল। আজ থেকে বাবা আর মার ভেতর কোনো সম্পর্ক থাকবে না। সে যদি বাবার ভাগে পড়ে তবে এই দাদু, দিদান সোনামামারাও পর হয়ে যাবে জন্মের মতো। আর মা? যতই এখন রাগ হোক মার ওপর...

—কে রে ওখানে? রুমি নাকি?

রুমি চমকে তাকাল। দাদু তাকে দেখতে পেয়ে গেছে।

—ওখানে দাঁড়িয়ে কী করছিস? এদিকে আয়।

রুমি পায়ে পায়ে এগোল। নিজেকে জোর করে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে।

—কী বই পড়ছিলে?

—জুকভের মেময়ার্স। দাদু চোখ থেকে চশমা নামাল, দারুণ ইন্টারেস্টিং বই।

—জুকভ কে? রুমি আলতো প্রশ্ন ছুঁড়ল। অনেকক্ষণ পর কথা বলতে পেরে বেশ ভালো লাগছে। দমবন্ধ ভাব একটু কম যেন।

দাদু বইয়ের পাতা মুড়ল, জুকভ হচ্ছেন সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের একজন রাশিয়ান জেনারেল...

—তোমার যুদ্ধের বই পড়তে ভালো লাগে দাদু? যত সব বোমা, কনসেনট্রেশন ক্যাম্প আর কাতারে কাতারে লোক মরে যাওয়া। বিচ্ছিরি।

—তুই এত সব জানলি কোত্থেকে? দাদু হাসল, পড়িস তো যত লাইট অ্যাডভেঞ্চারের বই।

—বারে ক্লাসে আমাদের ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি পড়তে হয় না? দাদুর খাটে গিয়ে

এবার বসল রুমি, হিরোসিমা, নাগাসাকিতে কত লক্ষ লক্ষ লোক মরে গিয়েছিল বলো তো!

—হুঁ। দাদু আবার চশমা পরল, তার থেকে হাজার হাজার গুণ শক্তিশালী বোমা এখন রাশিয়া আমেরিকার হাতে। যদি দুজনে যুদ্ধ বাধে...

—আমাদের হিস্ট্রির আন্টিও বলছিল, এবার যুদ্ধ বাধলে এই গ্লোবটাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

—তাহলে তো সব চুকেই গেল। দাদু ভুরু কুঁচকোলেন—হিরোশিমাতে বোমা পড়ার পর কত মানুষ বিকলাঙ্গ হয়েছিল জানিস? যুদ্ধের পরও জন্ম হয়েছিল কত বিকলাঙ্গ শিশুর।

—কী নিষ্ঠুর এই পৃথিবীটা, তাই না? রুমির নরম মুখ জুড়ে দুঃখ ঝেঁপে এল, বেচারা শিশুগুলো। কিছু জানে না, বোঝে না, তারা পর্যন্ত...

—এই তো দুনিয়ার নিয়ম রে। দুই শক্তিমানে যুদ্ধ হলে মরে নিরীহ মানুষেরা। শিশুরা বিকলাঙ্গ হয়। এখন রাশিয়া আমেরিকার লড়াই হলে নিরপেক্ষ দেশগুলো সব...

রুমির শরীর শক্ত হয়ে আসছে। দাদুর কথাগুলো মিসাইল হয়ে ছুটে আসছে তার দিকে। পৃথিবীর নিয়ম বুঝি সব ক্ষেত্রেই এক। তা দুটো মহাদেশই হোক কিংবা তাদের বাবা মা। আজও সেই দুই শক্তিমানেরই যুদ্ধের চূড়ান্ত পরিণতি হতে চলেছে। রুমি চোখ বুজে ফেলল। বাবা-মা'র মধ্যে রাশিয়া কে? কেই বা আমেরিকা?

রাশিয়া বলছে, এভাবে আর চলতে পারে না। তুমি সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছ।

আমেরিকা বলল, সহ্যের সীমা আমি ছাড়াইনি। তুমি ছাড়িয়েছ। তোমার সঙ্গে আর কোনোরকম অ্যাডজাস্টমেন্ট আমার সম্ভব নয়। একটা কিছু ফাইনাল হয়ে যাওয়া দরকার।

—বেশ। রাশিয়ার কণ্ঠস্বর চড়ছে, মেয়ে দুটোকে রেখে দিয়ে তুমি যেখানে খুশি চলে যেতে পারো।

—অসম্ভব। আমেরিকা হিসহিসিয়ে উঠল, রুমি ঝুম আমার। আমিই ওদের নিয়ে যাব।

—তোমার মতো একটা নোংরা মেয়েছেলের হাতে আমি আমার মেয়েদের কিছুতেই তুলে দেব না। দরকার হলে...

—তোমার মতো একটা ডিবচের কাছেও আমার মেয়েরা থাকবে না। আমি কালই ওদের নিয়ে চলে যাচ্ছি।

রুমি একছুটে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ঝাঁক ঝাঁক গুলিতে এক্ষুনি বুঝি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। কার মেয়ে আমি? কার মেয়ে ঝুম? বাবার? মার? সত্যি সত্যি তারা আসলে কাদের?

তিন

খাবার ঘরে টাঙানো বড় ঘড়িটার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে আছে ঝুম। এখনও সে ভালোমতন সময়ের হিসেব বোঝে না। ছোট কাঁটাটা যদি চার আর পাঁচের মাঝখানে থাকে আর বড় কাঁটা আটের ঘরে তবে যেন ঠিক কটা বাজে? অধৈর্য ভাবে ঝুম দুধের গ্লাস সরিয়ে রাখল। একটু আগে দাদু বেরিয়ে গেছে বাড়ি থেকে। তাকে খেতে দিয়ে দিদান গেল ঠাকুরঘরে। মা আর সোনামামার ফেরার সময় বুঝি হয়ে এল। ঝুম তার ছোট্ট ছোট্ট কপাল চেপে ধরল। রুমিটা কিছুতেই কথা বলছে না। ব্যালকনিতে বসে আছে তো বসেই আছে। দিদানের বাড়িটা তাদের ফ্ল্যাটের থেকে অনেক বড়। একদিকে এলে অন্যদিকে কী হচ্ছে বোঝাই হয় না। এই মুহূর্তে গোটা বাড়ি ভূতুড়ে রকমের থমথমে। নিশ্বাস ফেললেও শব্দ শোনা যায়। ঝুমের গা ছমছম করে উঠল। একটু বাদেই মনে হয় সেই দমকা হাওয়াটা উঠবে। সাইরেনের মতো কেঁদে কেঁদে শব্দ বাজবে আকাশ থেকে। আর সেই শব্দ চিরে হিহি হাসির তালে নেমে আসবে ভূতগুলো। তাদের কখনই স্পষ্ট দেখা যায় না। আবছা নীল ছায়ার মতো তারা নেচে বেড়ায় চারদিকে। আচমকা দরজা জানলা ঝনঝন কেঁপে ওঠে। দেওয়াল দোলে নাগরদোলার মতো। পাগলা বাতাসে লণ্ডভণ্ড হতে থাকে ঘরের সব জিনিসপত্র। ঝুমের মনে হল, সে রকমই যদি কিছু একটা হয়ে যায় ভালো হয়। হলুদ আলো ছড়িয়ে ফ্লাইং সসার থেকে নেমে আসুক মিস্টার স্পক। ইয়া লম্বা চেহারা। লম্বাটে মুখ। খরগোশের মতো খাড়া খাড়া কান। মিস্টার স্পককে সে অনুরোধ করবে তাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে। সঙ্গে রুমিকেও নেবে। থুড়ি, দিদি। তারপর যেমন করে আকাশের ওপার থেকে একদিন নেমে

এসেছিল পৃথিবীতে, সেভাবেই চলে যাবে অন্য কোনো গ্রহে। সেখানে বাবা-মা থাকে না। মা-বাবাদের নিয়ে এত সমস্যাও থাকে না। থাকে না বাড়িঘর, টিচার, স্কুল আর খারাপলাগা এরকম হিজিবিজি সময়। সে আর দিদি দিব্যি সেই ধু-ধু বালির দেশে কিংবা বরফের পাহাড়ে জীবন কাটিয়ে দেবে।

ঝুম হঠাৎ চমকে লাফিয়ে উঠল। ভয়ানক শব্দ তুলে ঝনঝন বেজে উঠেছে কলিংবেলটা। ওরা তবে এসে গেছে। হোঁচট খেয়ে, চেয়ার উলটে ঝুম দৌড়োতে শুরু করল। দৌড়, দৌড় দৌড়। খাবার ঘর থেকে প্যাসেজ, প্যাসেজের পর দাদু দিদানের ঘর, তারপর সোনামামার। তারপর আরও কিছুটা গেলে তবে ড্রয়িংরুম। দরজা অবধি পৌঁছে ঝুম ভীষণ হাঁপাতে লাগল। আতঙ্কে ফরসা মুখ কাগজের মতো সাদা। ঘোলাটে দুচোখ শুধু রুমিকে খুঁজছে।

রুমিও শুনেছে শব্দটা। আবার বেল বাজল। আবারও। ধাতব ধাক্কায় দেয়াল দরজা সব যেন চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। পায়ের নীচে অজানা ভূমিকম্পের অনুভূতি। এখখুনি অ্যাটম বোমায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এতদিনকার শৈশব, ভালোবাসা, কাছে টানা। রুমি ছুটে ধরতে চাইল বোনকে। তখনই মেঝেতে চোখ আটকে গেল। সমস্ত সকাল ধরে, সাদা দুপুর ধরে এ কী ছবি এঁকেছে ঝুম? তাদের ফ্ল্যাটটার ছবি। খাট, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, সোফা, টিভি, ফ্রিজ সবই আছে। বইপত্র, খেলনাগুলোও। সব কিছুর মাঝখানে তারা দুই বোন হাত ধরে দাঁড়িয়ে। ছবিটা তুলতে যেতেই দু বোন ছিটকে গেল দুদিকে। পুরোটা আঁকার পর ব্লেড দিয়ে ড্রয়িং পেপারটাকে নিপুণভাবে দু ভাগ করে রেখেছে ঝুম।

নীচে দরজা খোলার শব্দ হল। রুমি হঠাৎ টের পেল ঝুম তার হাতের আঙুলগুলোকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছে। দুজনেই স্থির। নিস্পন্দ। এখন শুধু বিস্ফোরণের প্রতীক্ষা।



বুকের কথা



মেয়ের কাছে চলেছে হিরণ্ময়। শিলিগুড়ি। এ-জীবনে কাউকে মনের কথা বলা হল না হিরণ্ময়ের। মেয়েকে বলতে হবে সব। মনে তো কত কথাই জমে মানুষের। হাজারও কথা। লাখো কথা। অর্বুদ কথা। সেইসব কথা ঠিক ঠিক বলে ফেলতে পারলে হিরণ্ময়ের পৃথিবীটা হয়তো আমূল বদলে যেত। অনেক মনোরম, অনেক ভরভরন্ত হয়ে উঠত জীবনটা। কেন যে তাকে নিয়ে এই নিষ্ঠুর খেলা খেলল বিধাতা!

খেলা, নাকি বৈরিতা? মানুষ যা বলতে চায় তার বদলে যদি অন্য কথা বেরিয়ে আসে মুখ দিয়ে, তবে তাকে কী বলে? এই ব্যাপারটাই ঘটে আসছে হিরণ্ময়ের জীবনে। চিরটাকাল। হৃদয়ের সঙ্গে স্বরযন্ত্রের এ এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব। মন যা বলতে চায় কণ্ঠ তাকে ধাক্কা মেরে হঠিয়ে দেয়। স্বরযন্ত্র টপকে যদিও বা মুখে এল কথা, জিভ ঠোঁট অমনি বিদ্রোহ করে বসল। মনের কথা মনেই রয়ে গেল হিরণ্ময়ের।

হিরণ্ময়ের শৈশব কেটেছিল দুটো মানুষকে ঘিরে। মা আর দিদি। হিরণ্ময়ের যখন সবে ছয়, তখন তার বাবা মারা যায়। হঠাৎ। দিব্যি সুস্থ মানুষ খেয়েদেয়ে অফিস গেল, ফিরে এল মৃতদেহ হয়ে। অফিসে নাকি ফাইল দেখতে দেখতে আর্তনাদ করে উঠেছিল একবার, পাশের টেবিলের লোক ছুটে আসার আগেই সব শেষ।

বাবার মৃত্যুর পর অথৈ জলে পড়েছিল মা। আত্মীয়স্বজন জ্ঞাতিগুষ্টি সবাই দূর থেকেই আহা-উহু করে, এগিয়ে এসে দায় নেওয়ার বেলায় একজনও নেই। অর্থ নেই, সম্বল নেই, দু-দুটো ছেলেমেয়ে নিয়ে মা যে

তখন কী করে! শেষে বাবার বন্ধুদের করুণায় মাটিতে পা রাখার একটা জায়গা জুটল। বাবার অফিসে চাকরি পেল মা।

চাকরি পাওয়ার পরও বহুকাল বাবার ছবির সামনে বসে কাঁদত মা। সারা দিন অফিস, সংসারের খাটাখাটুনি, দিদি ছোট থেকেই একটু রোগাভোগা তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা—মা বোধহয় ফিরে ফিরে বাবার কাছেই আশ্রয় খুঁজত।

মার কান্না দেখে বুক ভার হয়ে যেত হিরণ্ময়ের। সন্ধেবেলাই রাত নামত চোখে। মনে মনে বলত, দুঃখ কোরো না মা। আমাকে একটু বড় হতে দাও, তোমার সব কান্না আমি মুছে দেব।

ছোট্ট হিরণ্ময় জানত না এ পৃথিবীতে কেউ কারুর কান্না মোছাতে পারে না। কান্না জিনিসটা জোলো বাতাসের মতো। রুক্ষ পৃথিবীকে কান্নাই খানিকটা সহনীয় করে তোলে।

তা হোক, তবু কথাগুলো শুনলে হয়তো একটু ভালো লাগত মার। শিশুর মুখের কথা হলেও সান্ত্বনা তো বটে।

কিন্তু ওই যে, মনের কথা মুখে আসে না হিরণ্ময়ের। এসে এসেও ফিরে যায়।

হিরণ্ময় জোরে জোরে ঠেলত মাকে,—আর কাঁদতে হবে না। ওঠো। আমাকে খেতে দেবে চলো।

মা সজল চোখে বলত,—তোর কি বাবার জন্য একটুও মন কেমন করে না হীরু?

করে। করে। ভীষণ করে। যে মানুষটা এই সেদিনও ছিল, হাসিখুশিতে ভরিয়ে রাখতে সংসার, তাকে শ্মশানে পুড়িয়ে এলে বুক হু-হু করবে না? বাবা কত ভালোবাসত হিরণ্ময়কে! ছুটির দিন হলেই তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ত রাস্তায়। চিড়িয়াখানা, জাদুঘর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, পরেশনাথের মন্দির কোথায় না যেত। আইসক্রিম ঝালমুড়ি খাওয়াত, বুড়ির মাথার পাকা চুল কিনে দিত, রেস্টুরেন্টেও খাইয়েছে কত দিন। হাঁটতে হাঁটতে হিরণ্ময়ের পা ধরে গেলে তাকে কাঁধে নিয়ে ছুটত বাবা। বাঘের খাঁচার সামনে হিরণ্ময়কে পাঁজাকোলা করে তুলে ছুঁড়ে দেওয়ার ভান করত, আর হাসত গমগম।

লকলকে চিতায় হৃদয় সাপটে রেখে হিরণ্ময়ের ঠোঁট বলে উঠত,—যে মরে গেছে তার কথা ভেবে কী লাভ?

ছোট মুখে বড় কথা শুনে অবাক চোখে তাকাত মা। বুঝি বা বুঝতে চাইত কথাটা কতটা শেখা বুলি, কতটা বা অন্তরের। ভিজে স্বরে ধমকাত, —ও কথা বলতেই নেই হীরু। তোমার বাবা এখানেই আছে। এই আমাদের চারপাশে।

—দুর, বাবা তো কবেই মরে ভূত। সত্যি সত্যি ভূত এলে আমার একটুও ভালো লাগবে না।

একদিন ঠাস করে চড় কষিয়ে দিয়েছিল মা। বিনবিন কান্না ঝেড়ে ডুকরে উঠেছিল,—তোর মনে কি একটুও মায়া নেই? এই বয়সেই এত নিষ্ঠুর?

আশ্চর্য। সেই মা'ও বাবাকে ভুলে গেল। মাঝখান থেকে হিরন্ময়ের কপালে একটা স্ট্যাম্প পড়ে গেল—নিষ্ঠুর।

এক সময়ের যোগিনী বেশ ধীরে ধীরে ঝেড়ে ফেলল মা। চুলে মুখে চোখে রুখুশুখু ভাব, কপালে দিবারাত্র বিষণ্ণতার ভাঁজ, দিব্যি উবে গেল। চড়া রঙিন শাড়ি পরে অফিস যেতে মা আর অস্বস্তি বোধ করে না, ছোট্ট টিপ পরে, পাউডার বুলোয়, পারফিউম মাখে, হালকা কাজলও দেয় চোখে। অফিস থেকে ফিরে যে মা হা-ক্লান্ত বসে থাকত, মাত্র চারটে বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তার মধ্যে কী পরিবর্তন! বাবার অফিসের বন্ধু অরুণকাকুর প্রায়ই আসাযাওয়া বাড়িতে। কাকুকে দেখলেই মার চোখ খুশিতে ঝলমল।

মার ওই সুখী মুখটাই তো আজীবন দেখতে চেয়েছে হিরণ্ময়। অরুণকাকুকেও তার মন্দ লাগত না। শান্ত, কিন্তু কী দিলদরিয়া। কাকু কত খেলনা কিনে দিত হিরণ্ময়কে। দিদিকেও। যখনই আসত হাতে চকোলেট লজেন্স কেক পেসট্রি। হিরণ্ময়দের হারিয়ে যাওয়া খুশিটাকে আবার যেন ফিরিয়ে আনছিল কাকু।

এক রবিবার বিকেলে, সেদিন বুঝি অরুণকাকু রাত্রে হিরণ্ময়দের বাড়িতে খাবে। সকাল থেকে দিদিকে সঙ্গে নিয়ে কত পদ রাঁধল মা। তারপর বিকেল হতে আয়নার সামনে সাজতে বসল। দেখতে দেখতে কী অপরূপ হয়ে উঠছিল মার পানপাতা মুখ। পাতা কেটে চুল আঁচড়েছে, ঘাড়ের কাছে গোল খোঁপা, কপালের খয়েরি টিপও সেদিন যেন একটু বড়। মিষ্টি সৌরভে ভরে যাচ্ছিল ঘরের বাতাস।

হিরণ্ময় মনে মনে বলল, তুমি চিরকাল এমন সুন্দর থেকো মা।

ঠিক তখনই সাদার ওপর নীল ফুটফুট শিফনের আঁচল কাঁধে ছুঁড়ে মা হঠাৎ কথা বলে উঠল,—আমাকে দেখতে কেমন লাগছে রে হীরু?

স্বরযন্ত্র খরখর করে উঠল হিরণ্ময়ের,—তোমার মুখটা কেমন বুড়ি বুড়ি হয়ে গেছে মা। সাজলে তোমাকে সঙের মতো দেখায়।

মার মুখ পলকে মলিন। সমস্ত রঙ মুছে গিয়ে যেন দাঁড়িয়ে আছে এক তেত্রিশ বছরের কঙ্কাল। এক প্রাগৈতিহাসিক মমি।

অবসন্ন মা কপাল থেকে টিপ মুছে ফেলল। চুপটি করে মোড়ায় বসে রইল কিছুক্ষণ। ড্রেসিংটেবিলের আয়নায় কী যেন খুঁজল। তারপর অরুণকাকুর কিনে দেওয়া ঝুরো কুমকুমের কৌটো ফেলে দিল জানলা দিয়ে। নিঃশব্দে।

মা আর কখনও টিপ পরেনি।

অরুণকাকুর সঙ্গে সম্পর্কটাও স্থবির হয়ে গেল।

মা একটা শক্ত লোহার বর্ম এঁটে নিল শরীরে। মনেও।

হিরণ্ময়দের সংসারে আলো জ্বলেও নিবে গেল।

তা সংসারে সুখঅসুখ থাকেই। ঝড়াঝাপটা বিপদআপদও আসে। আবার কখনও কখনও দখিনা বাতাসও বয়। কিন্তু তাদের নিবে যাওয়া সংসারে শুধু মেঘ আর মেঘ। সেই মেঘের আড়াল থেকে এক অদৃশ্য তিরন্দাজ বিষের তির হেনে চলে অবিরাম।

রোগা দিদির ভারি ন্যাওটা ছিল হিরণ্ময়। বাইরের জগৎ তেমন টানতে না হিরণ্ময়কে, চার বছরের বড় দিদিই ছিল তার কৈশোরের পৃথিবী। দিদির সঙ্গে খাওয়া। দিদির সঙ্গে খেলা। দিদির সঙ্গে ঘুম। সেই দিদি পড়ে গেল এক কঠিন অসুখে। বাবাকে অসম্ভব ভালোবাসত দিদি, বাবার মৃত্যুর পর গুমরে গুমরে কাঁদত। দিদির সেই গোপন অশ্রুই বুঝি প্লুরিসি হয়ে বাসা বাঁধল বুকে।

হিরন্ময়ের জগৎ যেন চুরমার হয়ে গেল।

চোদ্দো বছরের দিদি সারা দিন মিশে আছে বিছানায়। বিষণ্ণ। ফ্যাকাশে। শীতের নিষ্পত্র কৃষ্ণচূড়া গাছটির মতো। দিদিকে দেখে ভীষণ মায়া হত হিরন্ময়ের। জ্বরে আচ্ছন্ন দিদির মাথার পাশে বসে হিরন্ময় মনে মনে বলত, দিদি, তুই ভালো হয়ে ওঠ। দিদি, তুই একদম সেরে যা।

একদিন হিরন্ময়ের প্রার্থনার সময়ে চোখ খুলল দিদি। শীর্ণ হেসে বলল, —কী বিড়বিড় করছিস রে হীরু?

হিরন্ময় ভীষণ চমকে উঠল,—কই, কিছু না তো।

—নিশ্চয়ই কিছু বলছিস। কী বলছিলি বল না।

হিরন্ময়ের জিভ ঠোঁট বেমালুম বলে দিল,—তুই আর ভালো হবি না রে দিদি।

—এ কথা কেন বলছিস? দিদি প্রায় ককিয়ে উঠল।

—তোর অসুখটা খুব খারাপ। আমি জানি। এ রোগ সেরেও সারে না।

নিমেষে দিদির মুখে পাংশু। রক্তহীন মুখমণ্ডলে প্রাণের আভাটুকুও যেন আর রইল না। অসাড়ে জল গড়িয়ে গেল গাল বেয়ে।

হিরণ্ময়ের দিকে পিছন ফিরে শুল দিদি।

মাস দুই পর দিদি মোটামুটি সুস্থ হল। তবে দিদির বুকের দোষটা পুরোপুরি গেল না কোনওদিন। সামান্য অনিয়মেই অসুখে পড়ে, ঘুষঘুষ জ্বর লেগেই আছে, একটু হাঁটাচলা করলেই হাঁপায় কুকুরের মতো।

লেখাপড়াটাও হল না দিদির। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দিদি বড় খিটখিটেও হয়ে গেল। বিনা কারণে মার সঙ্গে গলা ফাটিয়ে ঝগড়া করে, তুচ্ছ অজুহাতে দিনরাত শাপশাপান্ত করে ভাইকে। বারবার পাত্রপক্ষের সামনে বসা আর বাতিল হওয়াই যেন হয়ে উঠেছিল তার জীবনের পরিণতি।

হিরণ্ময় তখন একটা ওষুধের কোম্পানিতে কাজে ঢুকেছে। ক্যানভাসার। সেও তখন বুঝে গেছে দিদির রূপ নেই গুণ নেই, যদি দিদির বিয়ে হয়ও, তার জন্য লাগবে প্রচুর টাকা। দিনরাত খেটে টাকা জমিয়ে চলেছে সে। তার মনের কোণে এক সূক্ষ্ম অপরাধের কণা নোংরা ঝুল হয়ে জমে আছে। যদি একদিন মুখ ফুটে দিদিকে মনের কথা বলে ফেলতে পারত, তা হলে কি আর একটু সতেজ হয়ে ফুটে উঠত না দিদি!

এ বড় কঠিন দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের কূলকিনারা পায় না হিরণ্ময়। পায় না বলেই সে আরও অসুরের মতো খাটে, আরও টাকা জমায়।

শেষ পর্যন্ত দিদির একটা সম্বন্ধ পাকা হল। পাত্র কার্ডবোর্ডের ব্যবসা করে। খাট আলমারি ড্রেসিংটেবিল, নমস্কারী শাড়ি ছাড়া তাদের আর বিশেষ দাবিদাওয়া নেই। গয়না শাড়ি মেয়েকে যে যেমন দেয় তা তো হিরণ্ময়রা দেবেই।

হিরণ্ময় দিদির বিয়ের তোড়জোড় শুরু করল। কোমর বেঁধে। বহু দিন পরে সংসারে একটা উৎসব আসছে।

বিয়ের মাত্র সাত দিন আগে আবার এক বিষতির ছুঁড়ল অদৃশ্য তীরন্দাজ। পাত্রপক্ষ একটা ছোট্ট লিস্ট পাঠিয়েছে। অতি বিনয়ের সঙ্গে। ব্যবসার কাজে তাদের হঠাৎ লাখ টাকা আটকে গেছে, ছেলের বউভাতের খরচখরচার জন্য দশ হাজার টাকা দরকার। আর আগে বলা হয়নি, ছেলেকে কাজের ধান্দায় নানান জায়গায় ছুটে বেড়াতে হয়, একটা মোটর সাইকেল বা স্কুটার না হলে ভয়ানক অসুবিধে হয় ছেলের।

হিরণ্ময়ের মা সিঁটিয়ে গেল,—এখন কী হবে হীরু?

হিরণ্ময়েরও চোখ ফেটে জল আসছিল। এখন উপায়? কী হবে দিদির?

মা বলল,—আরও পঁচিশ তিরিশ হাজারের ধাক্কা। অত টাকা আমি পাব কোথায়?

হিরণ্ময় দ্রুত হিসেব করে নিচ্ছিল। ব্যাঙ্ক থেকে কুড়িয়ে কাছিয়ে আরও হাজার নয়েক তোলা যেতে পারে, বাকিটা কি কোনওভাবে জোগাড় করা যায় না। দরকার হলে কোম্পানির মালিকের কাছে আত্মাটাও বাঁধা রাখবে সে।

মাকে অভয়বাণী শোনাতে চাইল হিরণ্ময়, কিন্তু স্বরযন্ত্র বেইমানি করল ফের,

—এ বিয়ে ভেঙে দাও মা।

দিদি হাউমাউ তেড়ে এলে.—কেন বিয়ে ভাঙবে? আমার জন্য তুই টাকা খরচ করতে চাস না? তোর জমানো টাকা নেই?

হিরণ্ময় বলতে চাইল, সত্যি অত নেই রে। বলে ফেলল,—থাকলেও দেব না। ওখানে বিয়ে হওয়ার থেকে তোর আইবুড়ো থাকা ভালো।

শুকনো প্যাকাটির মতো দিদি দেওয়ালে মাথা ঠুকতে লাগল,—আমি মরে যাব। আমি বিষ খাব।

ভেতরের হিরণ্ময় বলে উঠল, আমি তোকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসি রে দিদি। তুই শান্ত হ। আমি ব্যবস্থা কিছু করবই।

মা দিদি শুনতে পেল উলটো কথা,—পাগলামি করিস না দিদি। এ বিয়ে আমি কিছুতেই হতে দেব না।

আচমকা মা ছুটে গিয়ে জাপটে ধরল দিদিকে। অনেক কাল আগে এঁটে নেওয়া খোলস ভেঙে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতো চেঁচিয়ে উঠেছে হঠাৎ, —ও আমাদের কারোর ভালো চায় না রে খুকু। টাকা আমি জোগাড় করব। দেখি তোর বিয়ে ও কী করে আটকায়।

চেয়েচিন্তে, প্রায় এর ওর কাছ থেকে ভিক্ষে করে, টাকাটা জোগাড় করে ফেলল মা। পরদিন নতমুখে যথাসর্বস্ব সঞ্চয় তুলে এনেছিল হিরণ্ময়, মা ছুঁয়ে দেখল না। কঙ্কিত শুভ লগ্নে বিয়ে হয়ে গেল দিদির।

মাস চারেক পর জামাইবাবুর সঙ্গে মুসৌরি বেড়াতে গেল দিদি। বিলম্বিত মধুচন্দ্রিমা। সেখানেই পাহাড় থেকে পিছলে পড়ে দিদি মারা গেল।

মা জামাইকে দুষল না। হিরন্ময়ের দিকে আঙুল তুলল,—তুই কি কখনও কারুর সুখ চাইবি না হীরু? তোর মনে এত কু?

হিরণ্ময় কলকাতা ছাড়ল। কপালে একটা দগদগে দাগ নিয়ে। নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর!

দুই

মেয়ের কাছে চলেছে হিরণ্ময়। শিলিগুড়ি। সেখানে মার সঙ্গে থাকে মেয়ে। তাদের দ্বীপ থেকে বহুকাল নির্বাসিত হয়েছে হিরণ্ময়।

মনের কথা হিরণ্ময় মেয়ের মাকে বলতে পারেনি। মেয়েকে বলতে হবে সব।

হিরণ্ময়ের বুকের মধ্যে অনন্ত কথার মিছিল ঝংকার তোলে অবিরাম। শিলাবৃষ্টি হয়ে আছড়ে পড়তে থাকে হৃদয়ের খাঁচায়। মাথা খোঁড়ে। ভাষা চায়।

একটি বারও যদি মনে কথাকে বার করে দিতে পারত হিরণ্ময়!

আরতি বলত,—তুমি একটা কসাই। তোমার মন বলে কিছু নেই।

আরতি হিরণ্ময়ের বউ। আরতি ঝুমুরের মা। কলকাতা ছেড়ে অন্য ওষুধ কোম্পানিতে কাজ নিয়ে শিলিগুড়ি চলে গিয়েছিল হিরণ্ময়। সেখানে আরতির সঙ্গে তার বিয়েটা ঘটে। আরতির বাবা রেলের কন্ট্রাক্টর। সিভিল। দাপুটে মানুষ। কোমরে টোটা ভরা রিভলবার। দু-আড়াই শো কুলির প্রভু। অপার সুখ, অঢেল বিত্ত, অসীম প্রতিপত্তি লুটোপুটি খায় তার পায়ে। পোষা বেড়ালের মতো। এমন একটা লোকের মেয়ের সঙ্গে হিরণ্ময়ের বিয়ে হওয়ার কথা নয়, তবু কেমন করে যেন হয়ে গেল।

হিরণ্ময় তখন ভূতের মতো খাটে। সক্কালবেলা বেরিয়ে পড়ে বাক্স নিয়ে, হিমালয় থেকে তরাই চক্কর মারে দিনভর। তখন তার পরিশ্রম নিজেকে শুধু চেতনার শেষ সীমায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। যাতে দিনশেষে বুকে কোনও কথা জমার অবকাশটুকু না থাকে।

আরতির বাবা কর্মবীর। বোধহয় হিরন্ময়ের এই পরিশ্রমী চেহারাটাই পছন্দ হয়েছিল তার।

হিরণ্ময়ের মধ্যেও তখন এক তীব্র বাসনা। সংসার করতে হবে। আরতির বাবার প্রস্তাবে সেও বেশ প্রলুব্ধ হয়েছিল। একটাই শর্ত ছিল আরতির বাবার। মেয়ে তার চোখের মণি, হিরন্ময় কখনও শিলিগুড়ি ছাড়তে পারবে না।

হিরণ্ময়ই বা তখন আর কোথায় যাবে? মেনেই নিল। বিয়ের খবর জানিয়ে চিঠি দিল মাকে। মা এল না।

ফুলশয্যার রাতে আরতিকে দেখে চোখে জল এসে গিয়েছিল হিরন্ময়ের। ফুলচন্দনে সাজা, বেনারসিতে মোড়া ওই পুতুলের মতো মানবী শুধু তার! তবে কি জীবন আবার...! প্রিয়জন হারিয়ে আবার কি প্রিয়জন পেল হিরণ্ময়!

ফাল্গুন মাস। মহানন্দার দিকে থেকে একটা বাতাস আসছিল ঘরে। ঠান্ডাও নয়, আবার ঠিক উষ্ণও নয়, কেমন এক শান্তির প্রলেপের মতো। দোলপূর্ণিমার চাঁদ উঁকি দিচ্ছিল জানলায়।

আরতি বিছানায় বসে একটা একটা করে কাঁটা খুলছিল খোঁপা থেকে। মৃদু মৃদু পা দুলিয়ে ছুন ছুন নিক্কণ তুলছিল নূপুরে। তেমন একটা লজ্জাশীলা কনেবধূটি ছিল না আরতি, বরং সে যেন একটু বেশিই চপলা।

গ্রীবা হেলিয়ে আরতি প্রথমে কথা বলল,—আমাকে একটু জল দাও তো।

টেবিলে জলের গ্লাস। দৌড়ে নিয়ে এল হিরণ্ময়। জলটুকু নিঃশেষ করে শূন্য গ্লাস হিরন্ময়কে এগিয়ে দিল আরতি। সুগন্ধী রুমালে মুখ মুছল। হঠাৎ বুঝি তার খেয়াল হল ঠায় দাঁড়িয়ে আছে হিরন্ময়।

আরতি কটাক্ষ হানল,—কী দেখছ?

হিরন্ময়ের বুকে মাদল বাজছিল দ্রিম দ্রিম। তুমি সুন্দর। তুমি সুন্দর। তুমি সুন্দর।

স্বরযন্ত্র রুখে দিল কথাটাকে। জিভ আর ঠোঁট বিদ্রোহী হল। কাঁপা কাঁপা গলায় হিরন্ময় বলল,—তোমার কপালটা বড্ড ছোট।

—তো?

—ছোট কপালের মেয়েরা সুখী হয় না। তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে।

ঠিকাদারের ধনী মেয়ে থমকাল মুহূর্তের জন্য। ক্ষণ পরেই হেসে উঠেছে খিলখিল,—সে তো আছেই। বাবা এমন দড়ি-কলসি বেঁধে জলে ফেলে দিল।

—আমাকে বুঝি তোমার পছন্দ হয়নি?

ঠিকাদারের মেয়ে পা দোলাচ্ছে আবার,—ভেবে দেখতে হবে।

—কী?

—এই রকম চালচুলোহীন লোককে মেনে নেওয়া যায় কিনা।

হিরন্ময় নিঃশব্দে বলল,—আমি বড় দুঃখী আরতি। আমাকে দয়া কোরো। আমাকে দয়া কোরো।

হিরন্ময়ের হাত থেকে গ্লাস নিয়ে নিজেই ড্রেসিংটেবিলে রেখে এল আরতি। নতুন বরের গা ঘেঁষে দাঁড়াল সামনে। নরম আঙুল দিয়ে নেড়ে দিল হিরন্ময়ের নাক,—উউঁহ, ওমনি বাবুর ঠোঁট ফুলল! না রে বাবা, তোমার মতো লোকই আমার পছন্দ। বোকা বোকা। ভ্যাবলা ভ্যাবলা।

খুশি হবে, না আহত হবে ভেবে পাচ্ছিল না হিরন্ময়। শুনতে পেল রক্তে যেন কল্লোল উঠেছে। তীব্র সুবাসে আচ্ছন্ন হয়ে এল শ্বাসপ্রশ্বাস।

আরতি হঠাৎ বলল,—তখন কপালের কথা বললে কেন? তুমি জ্যোতিষচর্চা করো নাকি?

নিশ্বাস আরও ঘন হল হিরন্ময়ের। সামান্য হেসে হাল্কা হতে চাইল।

ধনী মেয়ের হাত ভরা গয়না নেচে উঠল ঝমঝম! তুলতুলে দুটো হাত এগিয়ে এল হিরন্ময়ের দিকে,—দ্যাখো তো আমার হাতে কী আছে?

কোমল হাতের স্পর্শে দেহ শিরশির। এ এক অচেনা স্বাদ। রোমহর্ষক।

আরতি বলল, আমার আয়ুরেখাটা কেমন গো? কদ্দিন বাঁচব বলে মনে হয়?

হিরন্ময় মনে মনে বলল, কী হবে জেনে? যতদিন সুখ ততদিনই তো বেঁচে থাকা। বাকি জীবন তো নীরস সালতারিখের হিসেব।

আরতি অধীর হল,—আমার স্বাস্থ্য কেমন যাবে? অসুখ কিন্তু আমার একটুও ভাল লাগে না।

হিরন্ময় মনে মনে বলল,—অসুখের চিন্তাই অসুখ আরতি। আমি চিরকাল তোমার মন ভাল রাখব, অসুখ তোমার হবেই না।

আরতি ঝামরে উঠল,—কই, কিছু বলো। হাত ধরে সখা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

তড়বড়িয়ে সরব হল হিরন্ময়। এবং ভুল কথা বলল,—তোমার হাতে বড় কাটাকুটি। এত দাগ থাকা ভাল নয়। জীবন জটিল হয়।

—আমার জীবন জটিল হবে কী করতে? আমার বাবা আছে না? সব জটিলতা বাবা সিধে করে দেবে। বাবার কাছে আমার সুখ সব থেকে আগে।

হিরন্ময়ের হাত থেকে করতল দুটো খসে পড়ে গেল।

—ভয় খেয়ে গেলে? হেসে লুটিয়ে পড়েছে আরতি,—তুমি একটা ভোঁদা কার্তিক। তুমি একটা হাঁদাগঙ্গারাম। ফুলশয্যার রাতে মেয়েরা কেন বরদের হাত ধরতে বলে বোঝো?

হিরন্ময়ের সত্যি ভয় করছিল। বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করে কি ভুল করল সে!

পরদিন থেকে আরও পরিশ্রমী হয়ে গেল হিরন্ময়। বড়লোকের মেয়েকে স্বাচ্ছন্দ্যের নকশিকাঁথায় মুড়ে রাখতে হবে। কখনও যেন বাবার ধনের কথা না তুলতে পারে আরতি। কখনও যেন এতটুকু কষ্ট না পায়।

তা এত খেটেই বা কী লাভ হল হিরন্ময়ের! যার জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম, তার মুখ ভার দিনে দিনে। আরতি দর্পী মেয়ে বটে, কিন্তু তার চাওয়া খুব বেশি নয়। হিরন্ময় বাড়ি ফিরলেই সে ছোট ছোট অনুযোগের ঝাঁপি খুলে বসে। তুমি আমাকে নিয়ে বেড়াতে যাও না! শান্তিনিকেতন থেকে অত ভাল নৃত্যনাট্যের দল এসে ঘুরে গেল, তুমি একদিনও সময় করতে পারলে না! সারাটা দিন কিভাবে কাটে আমার, সে খবর রাখো!

হিরন্ময় নিবিড় চোখে তাকাত। তোমাকে ছেড়ে এই খেটে মরা, এ তো তোমারই জন্য আরতি।

বলত অন্য কথা,—ঘরে বসে থাকার দরকার কি। ঘোরো না নিজের মতো।

—কার সঙ্গে ঘুরব?

—যার সঙ্গে খুশি। এ শহর তো তোমার চেনা।

আরতির মুখ থমথমে হয়ে যেত। সরে যেত পাশ থেকে,—জানি। চাইলেই বাবা এক্ষুনি গাড়ি পাঠিয়ে দেয়। একবার তুড়ি দিলে একশোটা সঙ্গী জোটে আমার।

—সত্যি?

—তুমি দেখতে চাও?

—তবে জুটিয়ে নাও সঙ্গী।

হিরণ্ময়ের মুখের বলাটাকে ধ্রুব ধরে নিয়ে সত্যিই সঙ্গী জুটিয়ে নিল আরতি। পাড়ার দেওর, পুরোনো বন্ধু, অনেকেরই আনাগোনা শুরু হল বাড়িতে। আজ এর সঙ্গে মার্কেটিং, কাল ওর সঙ্গে সিনেমা। কখনও বা দলবল নিয়ে পাহাড়, কখনও পিকনিক করতে জঙ্গল। কত দিন রাতে বাড়ি ফিরে বউকে দেখতে পায়নি হিরন্ময়।

তবু সম্পর্কটা ছিল। অম্ল মধুরে। কাঁটায় ফুলে।

এক রাতে হিরণ্ময়ের গলা জড়িয়ে শুয়ে আরতি রাতপাখির মতো রিনরিন করে উঠল,—এই, তুমি তমালকে চেনো?

—কে তমাল?

—চেনো না? আমার বাপের বাড়ির পাশেই যে বিশাল বাড়ি...। দারুণ হ্যান্ডসাম। রোজ নতুন নতুন রঙের টিশার্ট পরে। প্রচন্ড স্পিডে মোটরবাইক চালায়।

হিরণ্ময় চিনতে পারল না। তবু বলল,—হ্যাঁ হ্যাঁ চিনি। কেন?

—তমালটা ভারি অসভ্য হয়ে গেছে।

হিরণ্ময়ের বুক টিপটিপ করে উঠল।

—তমাল কী বলে জানো?

বোলো না আরতি। বোলো না।

—তমাল বলে আমার জন্যই নাকি ও বিয়ে করে উঠতে পারছে না। যে মেয়েকেই দ্যাখে তাকে আমার তুলনায় বাঁদরি মনে হয়।

হিরণ্ময় নিরুচ্চারে বলল, এসব তো আমার বলার কথা। এ কথা তমাল বলে কেন?

মুখ বলল,—অকারণ স্তুতিবাক্য মানুষের ক্ষতি করে আরতি।

আরতি শুনেও শুনল না। ঝটপট বলে উঠল,—তোমার হিংসে হচ্ছে?

বুকের চিনচিন ভাব বুকেই রয়ে গেল হিরণ্ময়ের। স্বর বলল,—হিংসে? কেন?

—কারণ তুমি তমালের মতো হ্যান্ডসাম নও। কারণ তুমি তমালের মতো সুন্দর করে কথা বলতে জানো না। কারণ তুমি তমালের তুলনায় অতি সাধারণ। কথাটা বলেও যেন তৃপ্তি হল না আরতির। ব্যঙ্গের সুরে বলল,—আরও কী বলে শুনবে?

—কি?

—সেই কথাটা। যে কথাটা আমাকে তুমি আজও বলোনি।

হিরণ্ময় মনে মনে বলল, সে কথা কি তুমি এখনও শুনতে পাওনি আরতি? কণ্ঠ বলল, —তুমি কি সে কথা আর আমার কাছে শুনতে চাও?

—না, চাই না। আরতি ছিটকে সরে গেল,—ও কথা তমালের মুখেই মানায় ভালো।

ক্রোধের বদলে এক বিষাদ ঢেকে ফেলছিল হিরণ্ময়কে। পথেঘাটে বনে প্রান্তরে পাহাড়ের আকাশে নদীতে সর্বত্র আরতিকে দেখতে পায় হিরণ্ময়। এই দুনিয়ায় কোনো পুরুষ কোনও নারীকে হিরন্ময়ের থেকে বেশি ভালোবাসতে পারে না।

বুক উজাড় করতে গিয়ে বাধা পেল হিরণ্ময়। উৎকট হাই উঠে কথার পথ রোধ করল। মুখ বলল,—রাত বড় অশালীন ভাবনা ভাবায়। তুমি ঘুমোও আরতি।

আরতি অন্ধকারে হিসহিস করে উঠল,—তুমি কসাই। তুমি মানুষ নও। মন বলে তোমার কিচ্ছু নেই।

কথাটা আরও বহুবার বলেছে আরতি। বহু সময়ে। প্রতিবার একটু একটু করে ছিঁড়েছে সম্পর্কের সুতো! শেষবার বলেছিল বড় কঠিন ভাবে। তখন তাদের মাঝে ঝুমুর এসে গেছে।

দেড় বছরের মেয়েকে নিয়ে সেবার প্রথম আরতির সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল হিরণ্ময়। পাহাড়ে। তখন হিরণ্ময় কোম্পানির এরিয়া ম্যানেজার, সবে একটা গাড়ি কিনেছে। শ্বশুরের সাহায্য ছাড়াই ছোট্ট বাড়িও তুলেছে শিলিগুড়িতে। হিরণ্ময় খুশি। খুবই খুশি।

আরতিও সেদিন বেশ উচ্ছল। শেষ বিকেলে পাহাড় কিনারে দাঁড়িয়ে অনেক নীচের জঙ্গল দেখছিল সে। দেখছিল দুপাশে পাইনের হাতছানি। দেখছিল অপরূপ ক্যাকটাস চতুর্দিকে। পাশে ঝুমুর। পাহাড় চুঁইয়ে আসা আলোয় দুজনেই কী অপরূপ! খানিক দূর থেকে অপলক চোখে দুজনকে দেখছিল হিরণ্ময়।

আরতি এক সময়ে ডেকে উঠল,—এই শুনছ? শুনছ?

—উঁ?

—আমি যদি এক্ষুনি পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিই, কেমন হয়?

এ কি কথা বলে আরতি!

আশংকা চেপে হাসল হিরন্ময়,—ওখানে বড় ঝোপজঙ্গল। একটু নীচে গিয়ে আটকে যাবে।

আরতি ভুরু কুঁচকে তাকাল,—যদি আরও খাদের দিকে গিয়ে ঝাঁপ দিই? ধরো ও দিকটায় গিয়ে?

কেন আরতি। এখন তোমার কিসের অভাব!

হিরণ্ময়ের কণ্ঠস্বর বলল,—তুমি মরতে পারবে না আরতি। তোমার এত পিছুটান।

—কিসের পিছুটান?

আমি। আমি। আমি।

আরতির কাছে পৌঁছেও হিরণ্ময়ের স্বর বিশ্বাসঘাতকতা করে বসল,—তোমার বাবা। যিনি তোমার সমস্ত জটিলতার সমাধান করতে পারেন। তোমার তমাল। যে তোমাকে ভালোবাসার কথা শোনাতে পারে।

আরতি গুম। খানিক পরে ফ্যাসফেসে গলায় বলল,—আর কোনও পিছুটান নেই আমার?

ম্রিয়মাণ আরতিকে দেখে বুক টনটন করছিল হিরণ্ময়ের। আরতি কী শুনতে চায় সে তো স্পষ্ট। তবু কেন ঠোঁট খোলে না হিরণ্ময়ের!

দিব্যি কায়দা করে আরতিও ঘুরিয়ে নিল কথাটা,—আমার মেয়ে নেই?

ভুল বলতে হিরন্ময়ের জিভ সঙ্গে সঙ্গে রাজি,—আমাদের যে একটা মেয়ে আছে, আমার মনেই থাকে না।

—মানে?

—এ মেয়ে যে সত্যিই আমার, বিশ্বাসই হতে চায় না।

—মানে?

কথার পিঠে কথা পড়ে গেছে। মাথা খুঁড়লেও কথা আর ফেরাতে পারবে না হিরণ্ময়।

আরতি বিকারগ্রস্তের মতো চেঁচাচ্ছিল,—তুমি কসাই। তুমি ইতর। তুমি হাটলোক...

বিকেল বড় দ্রুত রাত হয়ে গেল। কালো অন্ধকার রাত।

শিলিগুড়ি ফিরেই মেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেল আরতি। হিরণ্ময় আনতে গিয়েছিল তাদের, আরতির বাবা ফটক দেখিয়ে দিল।

বাড়ি গাড়ি বেচে শিলিগুড়ি ছাড়ল হিরন্ময়। কপালে দগদগে দাগ নিয়ে। কসাই! কসাই!

তিন

মেয়ের কাছে চলেছে হিরণ্ময়। শিলিগুড়ি। সেখানে আরতির সঙ্গে থাকে ঝুমুর। মা মেয়ের-দ্বীপ থেকে বহুকাল নির্বাসিত হয়েছে হিরণ্ময়। বিশ বছর পর হিরণ্ময়কে চিঠি লিখেছে মেয়ে। মেয়ে বিয়ের আগে একবার বাবাকে দেখতে চায়।

কথার ভার আর বইতে পারে না হিরণ্ময়। দেহ ন্যুব্জ হয়ে আসে তার, কান মাথা ভোঁ ভোঁ করে সর্বক্ষণ। মাত্র সাতান্ন বছর বয়সেই এক পলিতকেশ বৃদ্ধ হয়ে নিজেকে খুঁড়ে চলে হিরণ্ময়। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক বিকেল, যে বিকেলে ঝুরো কুমকুমে সাজছিল মা। মা আর নেই। মনে পড়ে এক পাতাঝরা কৃষ্ণচূড়ার জ্বরতপ্ত কপাল। গাছটা মরে গেছে। মনে পড়ে মহানন্দার হাওয়া মাখা দোলপূর্ণিমার রাত। মনে পড়ে পাহাড়ি বিকেলে দ্রুত ফুরিয়ে যাওয়া আলো। আরতিও হারিয়ে গেছে কবেই।

ঝুমুর আছে। ঝুমুর ডেকেছে হিরণ্ময়কে।

শ্রাবণের সকালে নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছোল হিরন্ময়। ট্রেনে। মেঘলা আকাশ, নোংরা চাদরের মতো আলো ছড়িয়ে আছে স্টেশনে। হিরণ্ময়

বেরিয়ে একটা রিকশা ধরল। বহুকাল না এলেও এ জায়গা তার হাতের তালুর মতো চেনা, দেখতে দেখতে পৌঁছে গেল শ্বশুরবাড়ি।

বাড়িটা বদলে গেছে। আমূল। বেদিটা ভাঙা। ফটকের ধারে দারোয়ান থাকত, সেখান নেড়ি কুকুর ঘুমোচ্ছে। বাগানে জঙ্গল। কড়িবরগা খিলান দরজাজানলা সবেতেই কেমন দুঃখী দুঃখী ভাব। দেখেই বোঝা যায় টোটা ভরা রিভলবার আর নেই।

হিরন্ময়কে চিনতে দু-এক সেকেন্ড সময় লাগল আরতির। চমকটুকু কাটার পর হঠাৎই মুখ উদ্ভাসিত। ক্ষণ পরেই একটা ছায়া এসে ম্লান করে দিল আলোটুকু। শুকনো স্বরে আরতি বলল,—তুমি?

হিরণ্ময় হাঁ হয়ে আরতিকে দেখছিল। সময়ের অজস্র দাগে ভরে গেছে আরতি। ছোট্ট কপাল চওড়া হয়ে গেছে। বয়স ঘাঁটি গেড়েছে দেহের আনাচে-কানাচে।

থতমত মুখে হিরণ্ময় বলল,—এলাম।

আরতি বলল,—এসো।

বৈঠকখানা ঘরে বসেছে হিরণ্ময়। ঘরটাতেও প্রচুর ঝুল জমে আছে। পুরোনো সোফায় ধুলোর পরত।

সময়ের বড়ই ওলটপালট করা স্বভাব! হিরণ্ময়ের অস্বস্তি হচ্ছিল।

চারঠেঙে ঢাউস পাখাটা চালিয়ে দিয়ে আরতি বলল,—কেমন আছ?

হিরণ্ময়ের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,—ভালো। তুমি?

—ভালো। ভালোই তো।

আরতিও কি ভুল কথা বলা শিখে গেছে!

হিরণ্ময় প্রাণপণ চেষ্টা করে বলে ফেলল,—তুমি আর মুখ দেখাতে বারণ করেছিলে, তাই আসিনি।

—ও। আরতি আবার ভুল কথা বলল,—তা এতদিন পর শিলিগুড়িকে মনে পড়ল যে?

শিলিগুড়ি আমার অস্তিত্বে মিশে আছে আরতি।

বলতে গিয়েও হিরণ্ময় বলে উঠল,—মেয়ে চিঠি দিয়ে ডাকল...

—সেই চিঠি দিল! পলকে কঠিন হয়ে গেছে আরতির মুখ,—বেইমান। বেইমান। এত কাল ধরে যে একা একা মানুষ করলাম...

হিরণ্ময় গুটিয়ে গেল। আরতি কি সত্যি চায়নি হিরণ্ময় আসুক?

বেশ খানিকক্ষণ পর কথা বলল আরতি,—একেই বলে রক্তের দোষ। মেয়ে বলে যে বাপ স্বীকারই করল না, তার ওপর এত কিসের টান থাকে মেয়ের!

হিরণ্ময়ের বুক ধুকপুক করে উঠল। প্রিয়জন তবে হারায় না! ফিরে ফিরে আসে! ভিন্ন রূপে!

আরতি বলল,—মেয়ে বিয়ের কথাও জানিয়েছে নিশ্চয়ই?

—হুঁ।

—ভালোই হল। বাপের কর্তব্যটাও সেরে যাও তবে।

—পাত্র ভালো?

—ইঞ্জিনিয়ার। মেয়ে নিজেই পছন্দ করেছে।

—ও।

—বোসো। মেয়েকে ডেকে দিচ্ছি। তার মুখ থেকেই শোনো সব। উদাস মুখে আরতি চলে যাচ্ছিল, হিরণ্ময় পিছু ডাকল,—শোনো।

—কী?

—আমার আসাটা কি তোমার পছন্দ নয়?

ঠিকাদারের মেয়ে সত্যিই কথা ধরে রাখা শিখে গেছে। দরজার কাছে থমকে দাঁড়াল কয়েক মুহূর্ত। নাকি অনন্তকাল? তারপর তার ঠোঁট বলল, —আমার পছন্দ-অপছন্দে কি আসে যায়!

ভেতর বাড়িতে ঢুকে চিৎকার করে মেয়েকে ডাকছে আরতি। হিরণ্ময় শুনতে পাচ্ছিল।

হঠাৎ ভীষণ ভয় করে উঠল হিরণ্ময়ের। মেয়ে আসছে। মেয়েকেও যদি ভুল কথা বলে ফেলে হিরণ্ময়। যদি বলে? যদি বলে?

থাক। কথা নয় রয়েই যাক বুকে।

কত কথাই তো জমে মনে। কটা কথাই বা বলতে পারে মানুষ!

হিরণ্ময় পালাল। পালিয়ে বাঁচল।



নীল পাখি



বিন্দু থেকে রেখা, রেখা থেকে অবয়ব, ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছিল পাখিটা। সদাশিব টানটান হয়ে বসলেন, —এসে গেছে! এসে গেছে!

পার্কের বেঞ্চিতে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে ঝিমুনি এসে গিয়েছিল কিশলয়ের। সদাশিবের স্বর শুনে ধড়মড় করে তাকালেন—কই? কোথায়?

—আসছে। আমি দেখতে পেয়েছি।

কিশলয় চোখ থেকে কুয়াশা তাড়াচ্ছেন। শীতের ঠিক শুরুতে এ সময়ে চারদিকে বড় ধোঁয়াটে আস্তরণ। একটু দূরের কোনও কিছুই এখন ভালো মতো ঠাহর হয় না। সূর্য পুরোপুরি ওঠার আগে পর্যন্ত বৃক্ষের সারি ছায়া ছায়া থাম হয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে। রহস্যময় আড়ালের মতো। ভারী কুয়াশার চাপে তাদের বিবর্ণ পাতারা আরও মলিন এখন। শান্ত দিঘির বুকেও থম মেরে আছে হিমবাষ্প। পথঘাট ভিজে। স্যাঁতসেঁতে।

সেই ভিজে পথ বেয়ে উড়ে আসছে নীল পাখি। কুহেলি মুছে মুছে।

কিশলয় কিছুতেই দেখতে পাচ্ছিলেন না তাকে। ইদানীং চোখ দুটো তাঁর একদমই গেছে। ছানি।

বিড়বিড় করে কিশলয় প্রশ্ন করলেন,—আপনি ঠিক দেখছেন তো?

সদাশিবের চোখও কুয়াশায় স্থির,—হ্যাঁরে বাবা হ্যাঁ। ওই তো বাঁক নিল এবার।

কিশলয়ের গলায় অভিমান ফুটল,—আজ বড় দেরি করল।

সদাশিব শিশুর মতো ঠোঁট ফোলালেন,—যা বলেছেন। আজ বহুক্ষণ বসিয়ে রেখেছে আমাদের।

—আজ ওর সঙ্গে কথা বলব না।

—আমিও না।

দুই বৃদ্ধের কথার ফাঁকে আরও কাছে এসে গেছে নীল পাখি। রাস্তা টপকে ভিজে ঘাসে স্পোর্টস শু ঘষল,—হাই! গুডমর্নিং। কতক্ষণ?

কিশলয় মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। সদাশিব চোখ ফেললেন দিঘির জলে।

নীল পাখি সামনে এসে হাত ঘোরাল—ব্যাপারটা কী, অ্যাঁ? কী হয়েছে তোমাদের? এরকম শব্দজব্দ মুখে বসে আছে কেন?

মাথার ওপর কর্কশ শব্দ করে একটা কাক শিরীষ গাছ ছাড়ল। ঘাড় ঘুরিয়ে সেদিকে তাকালেন কিশলয়। সদাশিবের চোখ দিঘির পাড়ে।

—আরে, তোমরা রাগ করেছ, মনে হচ্ছে?

—করেছিই তো। সদাশিব ফস করে প্রতিজ্ঞা ভেঙে ফেললেন,—এত দেরি করার মানেটা কী?

নীল পাখি ঝিরঝির হাসল,—সরি। এক্সট্রিমলি সরি। কাল লেটনাইট মুভিটা দেখে শুতে শুতে এত রাত হয়ে গেল। দেখেছ বইটা?

—কী বই? সদাশিব কৌতূহল চাপতে পারলেন না।

—ওয়ান ফ্লু ওভার দা কুক্কুজ নেস্ট। মিলোজ ফোরম্যানের। ফ্যান্টাসটিক। দ্যাখোনি তোমরা?

কিশলয় হিংস্র রকমের টিভি-বিদ্বেষী। বাড়িতে টিভি নিয়ে রোজই তাঁর যুদ্ধ চলে। নাতিনাতনির সঙ্গে। ছেলে ছেলের বউ-এর সঙ্গে। গিন্নির সঙ্গেও। তাঁর মতে টিভি এক উদ্দণ্ড বিশৃঙ্খলা। সারা জীবন শৃঙ্খলাকে আদর্শ হিসেবে মেনে এসেছেন তিনি। রেল কোম্পানিতে কাজ করেছেন পঁয়ত্রিশ বছর, একদিনও খাতায় লাল দাগ পড়তে দেননি। কিশলয় মিত্তিরের অফিসে ঢোকা নিয়ে অফিসের ঘড়ি মেলানো হত। চিরটাকাল লাইন দিয়ে বাসে উঠেছেন, নেমেছেন, কেউ কখ্খনো তাঁকে হুড়োহুড়ি ধাক্কাধাক্কি করতে দেখেনি। বাড়িতেও নিয়ম নিয়ে তাঁর কড়া অনুশাসন। রাস্তার আলো জ্বললেই ছেলেমেয়েকে বাড়ি ঢুকতে হবে। সকাল-সন্ধে ঘড়ি ধরে তিন ঘণ্টা বই নিয়ে বসতে হবে। ঠিক সময়ে খাওয়া। ঠিক সময়ে খেলা। ঠিক সময়ে ঘুম। এত নিয়মনিষ্ঠ লোকের সংসারেই এখন শৃঙ্খলা জিরো। ওই টিভির দৌলতে। ঘরের ভেতরেই এখন দিবারাত্র নাটক-যাত্রার অবিরাম

মোচ্ছব। আটষট্টি বছরের বুড়িটা পর্যন্ত নাতিনাতনির গলা জড়িয়ে বসে সকাল-সন্ধে খ্যামটা নাচ দেখছে। কিশলয় এখন নখদন্তহীন সিংহ। সংসারের ফালতু।

তবু কিশলয় সুযোগ পেলেই গজগজ করেন,—চব্বিশ ঘণ্টা ওই ধ্যাতাং ধ্যাতাং বাক্সনাচ তোমাদের ভালো লাগে?

পঞ্চাশ বছর ঘর করা সহধর্মিণী নির্বিকার খোঁচা মেরে যান,—এত হিংসে কেন, অ্যাঁ? নিজে চোখে দ্যাখো না বলে আর কেউ দেখলে বুঝি হাড়ে লংকাবাটা লাগে?

সদাশিব আবার কিশলয়ের ঠিক উলটোটি। তিনি একদম টিভির পোকা। রঙিন পরদার সামনে বসলে নাওয়া-খাওয়া পর্যন্ত ভুলে যান। স্ত্রী গত হওয়ার পর নেশাটা আরও চড়েছে। নিরুদ্দেশ সম্পর্কে ঘোষণা, ট্রেন লেটের খবর, কোনও কিছুই তিনি দেখতে ছাড়েন না। একদা পোস্টমাস্টার ছিলেন, অবসর সময়ে তাস দাবা খেলে কাটাতে ভালোবাসতেন। খেলার সঙ্গীরা অনেকেই এখন ওপারে পাড়ি দিয়েছেন। ফলত টিভিই এখন তাঁর গয়া কাশী রোম।

সদাশিবের এই নেশা নিয়ে বহুদিন বিদ্রুপ করেছেন কিশলয়, তবু আজ তাঁর মনে কেমন যেন খেদ জাগছিল। সদাশিবটা কি জিতে গেল আজ? ওই অসামাজিক নেশার সুবাদে?

না। সদাশিবও জেতেননি। তিনি মাথা দোলাচ্ছেন,—নাগো, আমার দেখা হয়নি। আজকাল আর মোটে রাত জাগতে পারি না। হজমের গোলমাল হয়।

নীল পাখি খিলখিল হেসে উঠল,—ইশ, তোমরা একেবারে বুড়ো বনে গেছ।

কিশলয় তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন,—বুড়ো তো হয়েছিই। আমি সেভেনটি সিক্স। অ্যান্ড হি ইজ ওয়ান ইয়ার সিনিয়র টু মি—সাতাত্তর।

—মোটেই না। সদাশিব হাঁ হাঁ করে উঠলেন,—আমি পঁচাত্তর।

—কী করে হয়! আপনি কত সালে রিটায়ার করেছেন?

—সেভেনটি এইটে। আপনার এক বছর পর।

—সে তো আপনি দুবছর এক্সটেনশান ম্যানেজ করেছিলেন।

—ম্যানেজ করেছিলাম মানে? পি এম জি স্পেশালি আমার নাম এক্সটেনশানের জন্য রেকমেন্ড করেছিল। বাট ফর ইয়োর কাইন্ড ইনফরমেশান, আমি এক্সটেনশান নিইনি।

—বললেই হল? হরিসাধন নিজে আমাকে বলেছে আপনি দিনরাত আপনাদের পি এম জির অফিসে গিয়ে ঝুলোঝুলি করতেন।

—বাজে কথা। একদম বাজে কথা। হরিসাধন একের নম্বরের মিথ্যেবাদী।

দুই বৃদ্ধের গলা চড়ছে ক্রমশ, নীল পাখি চোখ পাকাল,—অ্যাই অ্যাই, তোমরা থামবে? সামান্য একটা বিষয় নিয়ে শিশুদের মতো ঝগড়া, ছিঃ! ওঠো তো?

—কোথায়?

—আমার সঙ্গে জগিং করবে না? নীল পাখি সদাশিবের দিকে তাকাল, —তোমার ওই ইলডাইজেশান ফিলডাইজেশান সব হাওয়া হয়ে যাবে। শরীরটাকে একটু নাড়াও দেখি। খাচ্ছদাচ্ছ, পড়ে পড়ে ঝিমোচ্ছ, এতে শরীর ফিট থাকে?

সদাশিব মিনমিন করলেন,—আমরা কি পারব? এই বয়সে?

—খুব পারবে। বয়স আবার একটা ফ্যাক্টর নাকি? আমি তোমাদের বলেছি না নিজেকে বুড়ো ভাবাটা একটা সংস্কার। বয়স ভাবলে আছে, না ভাবলে নেই।

কিশলয় তবু পিছু হঠতে চাইছেন,—দৌড়টা কি শুরু না করলেই নয়? আমরা তো এখন আর বেঞ্চিতে এসে চুপচাপ বসে থাকি না ভাই। যতটা পারি হাঁটি, তোমার কথামতো।

—ওই হাঁটা! ঢিকু ঢিকু করে সরকারি অফিসের ফাইলের মতো। ফুঃ! ওঠো বলছি। ওঠো। আজ থেকে জগিং স্টার্ট।

নীল পাখির হাতের টানে উঠে দাঁড়িয়েছেন দুই বৃদ্ধ। নবীন ত্বকের ছোঁয়া পেয়ে ধীরে ধীরে রক্তকণিকারা চঞ্চল যেন। শরীর জুড়ে চনমন চনমন।

কিশলয় তোতলা মুখে জিজ্ঞাসা করলেন,—লাঠিটা নিয়ে দৌড়ব?

—আজ্ঞে না। ওটা ওই শিরীষ গাছের ডালে ঝুলিয়ে দাও। আর এই যে মশাই, উলটোদিকে তাকিয়ে লাভ নেই, তুমিও ওই বাঁদুরে টুপিটা খোলো।

এখনই এমন কিছু শীত পড়েনি যে ওরকম সঙ সেজে থাকতে হবে। এসো এসো।

নীল পাখি লঘু ছন্দে দৌড় শুরু করেছে। তার পিছনে টলতে টলতে ছোটার চেষ্টা করছেন দুই বৃদ্ধ। পারছেন না। জীর্ণ হয়ে আসা স্নায়ু অস্থি মজ্জা সব একসঙ্গে বিদ্রোহ করে উঠছে। হাত ঝুলে গেল। কোমর বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে। হাঁটু ভগ্নপ্রায়। শ্বাস দ্রুত। রুগ্ণ শালিকের মতো ঘাস ভাঙছেন ছিয়াত্তর আর সাতাত্তর।

নীল পাখি তাঁদের উড়তে শেখাচ্ছে। নতুন করে।

দুই

সদাশিব আর কিশলয়ের সঙ্গে নীল পাখির আলাপ খুব বেশি দিনের নয়। মাত্র দিন দশেকের।

রোজকার মতোই সেদিনও গাঢ় কুয়াশায় ডুবে ছিল প্রথম সকাল। আধোজাগা পথঘাট নির্জন। নিঝুম। তবু হঠাৎ হঠাৎ কোত্থেকে যে ছিটকে আসে এক-একটা গাড়ি। দুর্বার গতিতে ভোরটাকে ছিঁড়ে দিয়ে চলে যায় মুহুর্মুহু।

দুই বৃদ্ধ কিছুতেই রাস্তা পার হতে পারছিলেন না। যতবার ফুটপাথ থেকে পা বাড়ান, অমনি তুফান গতিতে তেড়ে আসে যন্ত্রযান। ত্রস্ত দুই মানুষ ঝাঁ করে আবার ফুটপাথে।

তখনই যেন কোত্থেকে হঠাৎ উড়ে এল পাখিটা। দুই বৃদ্ধের একেবারে গায়ের পাশে। কানের কাছে রিনরিন সুরে বেজে উঠল,—এ মা। তোমরা কুমির-তোর-জলকে-নেমেছি খেলছ কেন?

সদাশিব বা কিশলয় কিছু বোঝার আগে দুজনকে ডানায় সাপটে ধরে রাস্তা পার করছিল নীল পাখি। তারপর পার্কের বেঞ্চিতে বসে কলকল কলকল। কত গল্প! কত গল্প! তোমরা বুঝি রোজ ভোরবেলা বেড়াতে আসো? ও, বেশিদিন আসছ না? মাত্র মাসখানেক? বাহ্। বাহ্। ঠিক করেছ। এমন সুন্দর সকাল, চিকচিক করে পাখিরা জেগে উঠছে, কোথাও একটুও পেট্রোল ডিজেলের গন্ধ নেই, চারদিকে শুধু মিষ্টি মিষ্টি আর মিষ্টি, এখন

কেউ বাড়িতে বসে থাকতে পারে? দ্যাখো দ্যাখো, আকাশটা কেমন রং বদলাচ্ছে। আমি তো বাবা একদিনও সকালটাকে মিস করি না। রোজ জগিং করতে চলে আসি। বাস্কেটবল খেলি তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভীষণ দম লাগে। ভীষণ—ভীঈঈষণ। পুরো পার্ক চক্কর মেরে তবে থামি। পুরো আট চক্কর। না না, আমাকে আগে দেখবে কী করে? আমরা তো এখানে থাকতাম না। বাবা দিল্লি থেকে বদলি হয়ে এল তো, তাই আমরাও...। উঁহু, এখানে বসে নো অফিসের গল্প, নো বাড়ির গল্প। তোমরা জানো না এখন ওই সব কথা বললে নির্মল বাতাসে পল্যুশান এসে যায়। ওমা, তাহলে কী করবে মানে? বসে বসে পাখির ডাক শোনো। জলের শব্দ শোনো। বুক ভরে নিঃশ্বাস নাও। কোথাও কোনও নতুন ফুল ফুটল কিনা তার তত্ত্বতালাশ করো। বসে থেকো না শুধু। হাঁটো। ছোটো।

সদাশিব আর কিশলয় মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলেন। শুনছিলেন আর দেখছিলেন। আহা, কী নরম তুলতুলে শরীরটা। কচি আমপাতার মতো। কোমল ত্বকে জীবনের সমস্ত রূপ রং রস গন্ধ যেন জমাট বেঁধে আছে। এর একটু স্পর্শেই বুঝি লোলচর্ম মিলিয়ে গিয়ে ফিরে আসে সুদূর যৌবনের উত্তাপ। তাজা বাতাসের ঝলকে সতেজ হয় হৃৎপিণ্ড। ফুসফুস।

সেই বাতাস বুঝি আচমকাই ফুরিয়ে আসছিল এখন। সদাশিব জিভ বার করে দাঁড়িয়ে পড়লেন,—ওফ্ দম বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি আর পারছি না।

নীল পাখি অনেকটা উড়ে গিয়েছিল, সহসা ফিরে তাকিয়েছে। চেঁচিয়ে উঠল, —কেয়া হো গিয়া ভাই? দাঁড়িয়ে পড়লে কেন?

কিশলয় আজ আর দাঁড়াতেও পারছিলেন না। স্থানকালপাত্র ভুলে ভিজে ঘাসে থেবড়ে বসে পড়লেন। তাঁর বুকের শীর্ণ খাঁচা ঠেলে ঠেলে উঠছে, আবার ঢুকে যাচ্ছে। হাপরের মতো।

নীল পাখি কাছে এসে দুহাতে টেনে তুলল কিশলয়কে। আদর করে সদাশিবের নাক টিপে দিল,—আমার মিষ্টি বন্ধুরা। তোমরা দেখছি শরীরের কলকব্জাগুলোতে একেবারে জং ধরিয়ে ফেলেছ। বলতে বলতেই নীচু হয়ে বিচিত্র কায়দায় কিশলয়ের হাঁটুতে চাপ মারল বারকয়েক, সদাশিবের কোমরে খ্যাট খ্যাট দু'তিনটে ধাক্কা। দুজনের মুখের খুব কাছে মুখ এনে

সুগন্ধী বাতাস ছড়াল কয়েক পল,—ফিলিং ওয়েল? এবারে ওঠো। আজ একটা পুরো রাউন্ড দিতেই হবে।

সদাশিব অনুনয় জুড়লেন, —আজ তো অনেকটাই এলাম। আজ এটুকুই থাক।

—উঁহু, নো ফাঁকি। গতকালও ঠিক এই কথাই বলেছিলে। তোমরা কিন্তু কথার খেলাপ করছ।

—কাল ঠিক ফুল রাউন্ড দেব। প্রমিস।

কিশলয় কায়দা করে কাঁধ ঝাঁকানোর চেষ্টা করলেন,—কাল একটা কেন, দুটো চক্কর দিয়ে দেব। ও না পারুক, আমি দেব। ওয়ার্ড অব অনার।

পালক পালক ভুরু তুলে নীল পাখি নিরীক্ষণ করল দুজনকে,— তা তো হবে না। যো কাল করো সো আজ করো, যো আজ করো সো অভি। কেউ কোনওদিন আগামী কাল দেখতে পায়? যদি আজই পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তো তোমাদের এই একটা চক্কর বাকিই থেকে যাবে।

কিশলয় হতাশ মুখে শ্বাস ফেললেন। সদাশিব মনে মনে একটু শিউরে উঠলেন যেন।

নীল পাখি দু দিক থেকে দুজনের হাত চেপে ধরেছে। খুব আস্তে আস্তে শুরু হয়েছে দৌড়। একটু একটু করে নবীন প্রাণের উল্লাস আবারও ছড়িয়ে পড়ছে দুই বৃদ্ধশরীরে। দৌড়োচ্ছেন সদাশিব। দৌড়োচ্ছেন কিশলয়। দৌড়োচ্ছে নীল পাখি। তাদের দৌড়ের ছন্দে গাছগাছালির ঝিমধরা ভাব কেটে যাচ্ছে ক্রমশ। তীব্র শীতের দাপট ম্লান হয়ে এল। টলটল শব্দে হেসে উঠল স্থির দিঘির জল।

সহসা দুজনকে ছেড়ে দিয়ে প্রভাতী পথচারীদের টপকে নীল পাখি ছুটে চলে গেছে বহু দূর। এক জারুল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ছিলে-পরানো ধনুকের মতো বাঁকাচ্ছে শরীরটাকে। মিহি সুরে ডেকে উঠল, —সদাআশিব....? কিশঅলয়...?

দুই বৃদ্ধের বুক শিরশিরিয়ে উঠল। কে ডাকে তাঁদের নাম ধরে? এত দিন পরে? এভাবে?

বিমোহিত দুই বৃদ্ধ গুটি গুটি পায়ে এগোলেন।

—অ্যাই, তোমার বয়স কত?

—বন্ধুর আবার বয়স কী? আমি এজলেস, জন্মের হিসেবে যদিও আঠেরো।

—তুমি আমাদের নাম ধরে ডাকছ যে! জানো আমরা তোমার থেকে কত বড়? ষাট বছরের।

—হাহ, ষাট বছর! মাত্র? পৃথিবীর বয়স যেখানে কোটি কোটি বছর সেখানে মাত্র ষাট বছরের তফাতে কী আসে যায়?

—যায় না?

—ভাবলে যায়, না ভাবলে যায় না। এই যে জারুল গাছটা, এর বয়স কিছু না হোক পঞ্চাশ বছর, একে কি কাকু বলে ডাকব নাকি? আর ওই দামড়া মেহগনি গাছটাকে জেঠু? এই পুকুরের জলটাকে যদি মাসি বলে ডাকি কেমন লাগবে? হিহি। হিহি। বন্ধুদের নাম হল একটা আইডেন্টিফিকেশান। ডাকারই জন্যে, বুঝলে?

দুই বৃদ্ধ দুলে গেলেন খুশিতে। তখনই সূর্য উঠল।

—একি, আজ আপনি পাজামা যে! তাও আবার রঙিন!

—এটা পাজামা নয়, ট্র্যাকস্যুট। ডোরা দেখে বুঝছেন না?

—নাতির বুঝি? চুরি করে পরলেন?

সদাশিব ধূর্তের মতো ঠোঁট টিপলেন,—কাল যে আপনি লুকিয়ে লুকিয়ে বড় নাতনির চকরাবকরা পুলওভারটা পরেছিলেন, তার বেলা? চলুন চলুন, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সদাশিব প্রায় বাড়ির সামনে থেকে দৌড় শুরু করতে যাচ্ছিলেন, কিশলয় তাঁকে পিছন থেকে টেনে ধরেছেন,—করছেনটা কী! পাড়ার লোকে দেখলে যে ঢিল ছুঁড়বে!

—ছুঁড়ুক। আমি কেয়ার করি না। কাটিয়ে বেরিয়ে যাব। কাল রাত্তিরে কটা রুটি খেয়েছি জানেন? ছটা। বউমার তো চোখ কপালে উঠে গেছিল। পাত্তা দিইনি। ঘুম থেকে উঠেই অল ক্লিয়ার। নো ইশবগুল। নাথিং।

বেরোনোর সময় ছেলে প্যাটপ্যাট করে দেখছিল, কোনও দিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে এলাম।

—ঠিক করেছেন। পাত্তা দিলেই পেয়ে বসে। কিশলয় সদাশিবকে ধরার জন্য হনহন করে রাস্তা পার হলেন,—আমারও বুঝলেন, খিদেটা খুব বেড়ে গেছে। গিন্নি বিশ্বাস করতে চায় না। বলে এটা নাকি পেটের খিদে নয়, চোখের খিদে। ছেলে আবার মায়ের ওপর আরেক কাঠি। বলে বাবাকে জোর করে ডাক্তার দেখাও। এই খিদে নাকি জিয়ার্ডিয়ার কেস। শাকসবজি ফলমূল কোনও কিছুই নাকি আমি খাচ্ছি না। খাচ্ছে আমার পেটের পোকারা। খেয়ে খেয়ে তারাই নাকি আমার পেটের ভেতর কেঁদো হচ্ছে! কাল ছেলেকে এমন দাবড়ানি দিয়েছি...

কথায় কথায় দুই বৃদ্ধ পৌঁছে গেছেন পার্কে। শীত কমে এসেছে। শেষ মাঘের হাওয়ায় তার অন্তিম কামড়টুকু লেগে আছে শুধু। এবারে ঠান্ডা খুব জাঁকিয়ে এসেছিল। শৈত্যপ্রবাহে লোকও মরেছে কিছু। শুধু এই দুই বৃদ্ধ তুড়ি মেরে পার করে দিয়েছেন হিমেল দিনগুলোকে। হাঁপানি নেই, জ্বরজারি নেই, সর্দিকাশি নেই, দুজনেই এবার ফুরফুরে। নির্ভার। দ্বিতীয় যৌবনের সুরায় বেসামাল।

বেঞ্চির কাছে এসে থমকে গেলেন কিশলয়—নীল পাখি তো আসেনি দেখছি!

সদাশিব টুক করে বসে পড়লেন,—হয়তো এসেছে। রাউন্ড মারছে।

কিশলয় সদাশিবকে ঠেললেন,—বসলেন যে বড়!

—আপনিও বসুন না। ও আসুক, তিনজনে একসঙ্গেই দৌড়োব।

—ওই ছুতোয় দম নিচ্ছেন? এটুকু এসেই টায়ার্ড?

—টায়ার্ড? আমি? তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠলেন সদাশিব,—চলুন তো, দেখি কে আগে হাঁপায়।

শরীরে দু'তিনটে মোচড় দিয়ে জগিং শুরু করলেন দুজনে। দুটো শরীর দুলে দুলে চলেছে পাশাপাশি। মুঠো করা হাত চক্রাকারে ঘুরছে। দিঘিটাকে বাঁয়ে রেখে একটার পর একটা গাছ পার হচ্ছেন ছিয়াত্তর আর সাতাত্তর।

চলন্ত সদাশিব ঘাড় ঘোরালেন,—আপনি আবার গিন্নির কাছে ব্যাক-ব্যাক করে সব বলে ফেলেননি তো?

—মাথা খারাপ!

—কী জানি, কাল আপনার গিন্নি যেরকম সন্দেহের চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন, আমি ভাবলাম হয়তো বা আপনি প্রেমের ঝোঁকে....

—ক্রস করছে না তা নয়, করছে। নিজে বুড়ি হয়ে গেছে তো, তাই আমাকে এত ফ্রেশ দেখে জ্বলেপুড়ে মরছে। আমি সেদিন শুনিয়ে দিয়েছি, তোমাদের টিভির ওই কোমরদোলানি নাচ আমিও নাচতে পারি।

—শুনে কী বললেন?

—বলবে আবার কী! চোখ ট্যারা। জগিং করতে করতেই কিশলয় একটু ঝাঁকিয়ে নিলেন নিজেকে,—যাই বলুন, আজকালকার ছেলেমেয়েগুলো কিন্তু বেড়ে নাচে।

হা হা হাসতে হাসতে এক পাক পুরো করলেন দুই বৃদ্ধ। ফাঁকা বেঞ্চির ধারে এসে মাথার ক্রিকেট ক্যাপটা খুলে ফেললেন কিশলয়,—একি! এখনও আসেনি!

সদাশিবের কপালেও চিন্তার ভাঁজ, —ব্যাপারটা কী বলুন তো? এত দেরি তো করে না বড় একটা।

—কাল বলছিল না, ওর দাদার কোন বন্ধু নাকি আসছে দিল্লি থেকে?

—বলেছিল নাকি? আমার মনে নেই।

—আমার মনে হচ্ছে যেন বলেছিল। কিশলয়ের ছানি ধরা চোখে চকিতে বিদ্যুৎ খেলে গেল,—সে ছোকরা ওর প্রেমিকটেমিক নয় তো?

সদাশিব পলকের জন্য গম্ভীর, পরক্ষণেই বাঁধানো দাঁত ছড়িয়ে হাসছেন, —বাহ, লাভার টাভার থাকলে কি আমাদের বলত না? আর সেরকম কেউ থাকলে আমাদের পাত্তা দিত নাকি?

উত্তরটা বেশ মনে ধরল কিশলয়ের। দু হাতের আঙুল চালিয়ে ঠিকঠাক সাজিয়ে নিলেন পাতলা চুলগুলোকে।

টাকমাথা সদাশিবের নজর এড়াল না দৃশ্যটা, খানিকটা ব্যঙ্গের সঙ্গেই বললেন,—আপনার চুলগুলো তো সব আবার সাদা হয়ে গেল মশাই। আরেকবার কলপ লাগাবেন না?

কিশলয় শুনেও না শোনার ভান করলেন। নীলচে কুয়াশায় তবু ভাসছে শব্দগুলো। কী কুক্ষণেই না সেদিন মাথা কালো করার শখ হয়েছিল কিশলয়ের। বাড়িসুদ্ধু লোক হেসে কুটিপাটি। গিন্নি রেগে টং।

কিশলয় বেপরোয়ার মতো বলেছিলেন,—তোমার এত শখ থাকতে পারে, আমার একবার চুলের রং বদলানোর সাধ হতে পারে না?

গিন্নি ঝামটে উঠেছিলেন,—জীবন গেল গামছা পরে, বুড়ো বয়সে ঘাগরা। একে বলে ভীমরতি, ভীমরতি! তা চুনটাই বা বাকি থাকে কেন? ওটাও দুগালে লাগিয়ে নাও, ষোলোকলা পূর্ণ হোক।

তা যার জন্য ওভাবে লাজ মান বিসর্জন দেওয়া সেও বা সেভাবে তারিফ করল কই! তোমাকে সাদা চুলেই বেশি সুন্দর দেখায় কিশলয়! মুখ ফুটে কিশলয় কি তখন বলতে পারেন কোন্ গোপন ঈর্ষায় পুড়ে তাঁর ওই মতিভ্রম? তাঁর তুলনায় সদাশিবের চেহারাটা অনেক বেশি শক্তপোক্ত। চর্বি বেশি বলে চামড়াও ফুটিফাটা হয়নি কিশলয়ের মতো। তাই না নীল পাখি অত হেসে হেসে ঢলে পড়ে সদাশিবের গায়ে।

সদাশিবও বোঝেন সে কথা। বোঝেন বলেই বুঝি আবার পিন ফোটাচ্ছেন, —গতবার ডাইটা ভালো হয়নি। এবার বিউটি পার্লার থেকে করে আসুন। দেখবেন নীল পাখি আপনাকে ছেড়ে নড়তেই চাইবে না।

—চাইবে নাই তো। কিশলয় দপ করে জ্বলে উঠলেন,—আমি তো আর আপনার মতো টেকো নই। নিজের মাথায় চুল নেই বলে জেলাসি।

—জেলাসি? হোঃ! কঠোর সত্যটাকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলেন সদাশিব। দিঘির ওপারে।

গোমড়া মুখে বসে আছেন দুজনে। আপনমনে হামা টানছে শিশুসূর্য। শুকনো পাতা ঝরছে টুপটাপ। দিঘির জল ছেয়ে যাচ্ছে গোলাপি আভায়। বেলা ফুটছিল।

বেশ খানিকক্ষণ পরে সদাশিব কথা বললেন,—আরে মশাই, এত রেগে গেলেন কেন? চলুন, আরেকটা চক্কর মেরে আসি।

কিশলয় তবু ঘাড় গোঁজ করে আছেন,—আপনি যান। আমি যাব না।

—আরে চলুন চলুন। সদাশিব টুপিটা এগিয়ে দিলেন,—নীল পাখি যদি এসে দ্যাখে আমরা বসে আছি তাহলে কী ভাববে বলুন তো?

—কী আবার ভাববে! ভাববে ওর জন্য ওয়েট করছি!

—মোটেই না। ভাববে আমরা বুড়ো হয়ে গেছি।

—অসম্ভব। ও যদি আমাদের বুড়ো ভাবে...। কিশলয় লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন, —আবার তাহলে শুরু করা যাক।

সূর্য উঠে পুরানো হয়ে গেল। দুই বৃদ্ধ ছোটার ছন্দে উন্মন তখনও। নীল পাখি সেদিন আর এল না।

চার

নীল পাখি আর এল না।

বসন্ত এসে গেল।

গাছে গাছে নতুন পাতারা হাসছে এখন। পুরোনো পাতা কখন যে ঝরে গেছে আনমনে। শীত এখন অতীতের স্মৃতি।

নীল পাখি আর এল না কোনওদিনই।

ভোরের নরম বাতাস দু হাতে সরিয়ে দৌড়োচ্ছিলেন দুই বৃদ্ধ। তাঁদের পায়ের চাপে শুকনো পাতারা মড়মড় ভাঙছিল। উঁকি দেওয়া ঘাসফুল সাক্ষী রেখে ধীর লয়ে ছুটছেন সদাশিব। দিঘির বুকে তিরতির কাঁপন জাগিয়ে পাশে পাশে ছুটছেন কিশলয়। এক পাক। দু পাক। চার পাক। প্রতিটি পাক শেষ করে শূন্য বেঞ্চির সামনে এসে থামছেন দুজনে। লম্বা বাতাস ভরে নিচ্ছেন ফুসফুসে। নতুন করে। আবারও।

নীল পাখি আসবে। নীল পাখি আসবে।



বিকেল ফুরিয়ে যায়



স্কুল থেকে বেরিয়ে মিনিট পনেরো হাঁটার পর, গলির মুখে এসে দুজনে দুদিকে। মানসী মানে মানি বাঁয়ে। আমি ডান দিকে। ডান দিকে ঘুরে বাঁ দিক, বাঁ দিক ধরে সোজা এক ছুটে বাড়ি।

বাড়ি ঢুকতেই কাঁধের ব্যাগ ছিটকে গেল খাটের ওপর। ভিতর বারান্দার চেয়ারে বসে ঝড়ের গতিতে খোলা হয়ে গেল কালো রঙের ব্যালেরিনা জুতো, নীল বর্ডার দেওয়া নাইলনের মোজা। হুড়ুদ্দুম করে হাত দুটো খুলে ফেলেছে নীল-সাদা ইউনিফর্ম। নীল কাপড়ের বেল্ট মুখ থুবড়ে পড়ল চৌকাঠের পিঠে। খোলার চেয়ে তাড়াতাড়ি পরে নিচ্ছি কুলোর কানঅলা বুলগানিন জামা। মা এসে সামনে দাঁড়ানোর আগেই পুটপুট বোতাম লাগিয়ে ফেলেছি।

—কি হচ্ছেটা কি অপু। এইভাবে জামাকাপড় ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে! এত বড় একটা ধিঙ্গি মেয়ে... ওঠা, ওঠা সব। পট করে তুলে রাখ। হিইই, দ্যাখো বেল্টটাকে কেমন ছিটকে ফেলে দিয়েছে! কাল স্কুলে যাওয়ার আগে কেঁদে দেখিস, ম্যা আমার বেল্ট পাচ্ছি না...

—আঁআঁআঁ! রতনের মা তুলে রাখবে। আমাকে চটপট খেতে দাও। জলদি। কুইক।

—কেন? কি এমন ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছ শুনি?

বলার সময় নেই। একটি শব্দও এখন সময়ের অপচয়। হাতের চঞ্চল আঙুলগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে খাবার টেবিলের গায়ে। ঢাকা বাটির বুকে নাক ঝুঁকে পড়ল,—এ কি! মাছ রাখোনি! ভাত খাবো কী দিয়ে!

—কে তোমাকে আজ ভাত দিচ্ছে? চিঁড়ে ভেজানো আছে, দই দিয়ে

আম দিয়ে মেখে খেয়ে নে। এ কি! হাত না ধুয়েই বসে পড়লি যে! তোর কি ঘেন্নাপিত্তিও নেই রে? যা, আগে হাত মুখ ধুয়ে আয়। যা বলছি।

ধমক খেয়ে দম বন্ধ করে দৌড় চানের ঘরে। হাতে পায়ে মুখে এলোপাথাড়ি জল ছিটোতে ছিটোতে মায়ের গলা শুনতে পাচ্ছি,—এখনও এত কীসের খেলার নেশা? বড় হয়ে গেছ, এবার ছুটোছুটি লাফালাফি বন্ধ করো। মেয়েরা বড় হয়ে গেলে এভাবে আর ট্যাং ট্যাং করে নেচে বেড়ায় না। লোকে কি বলবে?

ওফ্! আজকাল সারাক্ষণ ওই একটা কথা। বড় হয়েছো। বড় হয়েছো। মা যে কি না! বড় হয়েছি বলে সব সময় ঘরবন্দি থাকতে হবে নাকি। কই, দাদার বেলায় তো ও কথা বলতে শুনি না! নাকি ছেলেরা বড় হয় না! মেয়েদের বেলাতেই শুধু যত রাজ্যের সীমা টানা। শরীরে ভাঙচুর। নিয়ম করে লজ্জাজনক কষ্ট পাওয়া। ভাল্লাগে না। বিশ্রী। বিশ্রী। এভাবে মেয়েদের কেন শুধু দাগ টেনে বড় করে দেওয়া হয়।

খাবার টেবিলে ফিরে আসার পরও মা'র একঘেয়ে সুর কানের কাছে পোঁ-পোঁ,—আগেকার দিনে তেরো বছর বয়সে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেত। শ্বশুরবাড়ি গিয়ে সব ঘরকন্না করত। আর আমার এই ধাড়ি মেয়েটাকে দ্যাখো... রোজকার সুর এক কানের পরদা ভেদ করে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। চিরতা খাওয়া মুখে চিঁড়ে দই আম গিলছি।

—ইহহ্, আজ একটু লুচি করতে পারোনি?

—হ্যাঁঅ্যা, রোজ রোজ লুচি। কোনো কাজে হাত লাগানোর নামে নেই, শুধু লম্বা লম্বা হুকুম।

আমের আঁটি পিছনের উঠোনে ছুঁড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বাঁ হাতে বালতি থেকে আঁজলা করে জল নিয়ে ধুয়ে নিচ্ছি ডান হাত। ভিজে হাতেই দৌড়। এতক্ষণে নিশ্চয়ই পিছনের গলিতে চক দিয়ে দাগ পড়ে গেছে। এক্ষুনি শুরু হয়ে যাবে আমাদের লম্বি ধাস্সি খেলা। আমি কি আজও শেষে পৌঁছোব? কক্খনো না। মায়ের চিৎকার তাড়া করে চলেছে পিছনে, —একটা কথাও কানে তোলা হয় না, সাপের পাঁচ পা দেখেছ, না? আজ আসুক তোর বাবা। তোমার হবে।

কথাগুলো ফুসমন্তরে ঠিকরে গেল পাড়ার বাতাসে।

প্রায় প্রতিদিন এভাবেই শুরু হত আমার তেরো বছরের বিকেল।

পড়াশুনা, স্কুল, আবার পড়াশুনার ফাঁকে এইটুকু একরত্তি নিশ্বাস নেওয়ার সময়। একেবারে নিজের মতে করে বুকভর্তি শ্বাস টানা। এর মধ্যেই বড় জোর কোনোদিন অদলবদল হত খাওয়ার মেনুতে অথবা খেলায়। বড়জোর মায়ের গলার সুর বদলে যেত মালকোষ থেকে দরবারিতে, কাফি থেকে ইমনে, ঝিঁঝিট থেকে খাম্বাজে। তবে ব্যাপারটা ছিল মোটামুটি এই রকমই। বিকেল মানেই গাঢ় হলুদ রং। বিকেল মানেই সোনার পিরিচে সূর্যের আলো ঠিকরোচ্ছে। বিকেল মানেই মোড়ের জামরুল গাছের পাতাগুলো হলুদ মেখে কাঁপছে এলোমেলো। এক কোর্ট থেকে আরেক কোর্টে লাফ দিয়ে চলে যাচ্ছি। লম্বা দাগের শেষ প্রান্তে পৌঁছে ডাক ছাড়ছি, লম্বিইই....। কখনও এক পায়ে নুন নুন নুন অথবা আব্বা আব্বা। দু হাতের ডানা মেলে আমাকে আটকাতে চাইছে বিপরীত দলের খেলুড়েরা। মানসী কিংবা রূপা চেঁচাচ্ছে,—এই অপু, ওদিকটায় ফাঁক আছে, চলে আয়। চলে আয়। বড় বুড়িটা তো আবার কোনো দিন আমাকে অপু বলে ডাকতও না। অপরাজিতাও নয়। কি যে খালি চি দিয়ে কথা বলার অভ্যাস ছিল বড় বুড়ির। ডাকাতে গেলেই চিঅচিপু, নয়ত চিঅচিপচিরাচিজিচিতা। বাপরে, পারতও বটে। অমন একটা লম্বা নামে আমিও দিব্যি সাড়া দিয়েছি। তখন আসলে নাম নয়, ডাকও নয়, চোখ বুজে শুধু শেষ ঘরে পৌঁছোনোর দিকে মন। যেন ওই ঘরটাতেই লুকিয়ে আছে আমার প্রাণভোমরা। খেলা নিয়েই আড়ি ভাব, ঝগড়াঝাঁটি, এমনকী বন্ধুর সঙ্গে মুখ দেখাদেখিও বন্ধ।

তা সত্যি কি আর আমার প্রাণভোমরা লুকিয়ে ছিল লম্বি ধাসৃসির কোর্টে? কিংবা বুড়িবসন্তী খেলায়? উঁহু, আমার প্রাণভোমরা তো আসলে ছিল আমার বন্ধুদের হৃদয়ের কুঠুরিতে। সেটা মনেপ্রাণে টের পেলাম চোদ্দো বছর বয়সে পৌঁছে।

স্কুলে আমরা চারজন খুব বন্ধু সেই সময়। আমি মানসী দীপিকা আর অর্চনা। মানি থুড়ি মানসী কাছেই থাকে, সে আমার পাড়ারও বন্ধু। দীপিকা অর্চনা দূরে দূরে। দীপিকা ভবানীপুর, অর্চনা রাসবিহারীতে।

তো একদিন হল কি, ক্লাস এইটের হাফইয়ার্লি পরীক্ষার ঠিক আগে হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই পর পর পাঁচ দিন স্কুলে এল না দীপিকা। আমরা ভেবে আকুল। শেষে ঠিক করলাম ওর বাড়িতেই খোঁজ করতে যাব। বিকেলবেলা তিনজনে মিলে ট্রামে তো উঠে পড়লাম, ঠিক ঠিক নামলামও যদুবাজার স্টপে, তারপর? কাছে ঠিকানা নেই। আগে মাত্র একবারই গেছি ওদের বাড়ি, তবু খুঁজে খুঁজে শেষে বার করা গেল। পুরোনো দোতলা বাড়ি। বাইরের প্লাস্টার খসা। কালচে শ্যাওলার দাগ প্রাচীন বাড়ির শরীরে। দোতলায় ঝুলবারান্দার নকশা করা কাঠের রেলিং। দরজা জানলাগুলোর মাথায় অর্ধবৃত্তাকারে লাল সবুজ কাচ বসানো।

কাঠের প্রকাণ্ড সদর দরজার এপারে কয়েক সেকেন্ডের জন্য দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম তিনজন। ভরা বিকেলেও কেমন যেন থমথম করছে চারদিক। কে জানে বাবা, এই বাড়িটাই তো! দেখাই যাক না। সাহস করে মানসী আগে দরজা ঠেলল। ঠেলতেই সিংহদুয়ার খুলে গিয়ে সামনে এক শ্যাওলাধরা উঠোন, উঠোনের মাঝখানে মানুষসমান এক চৌবাচ্চা, পাশ দিয়ে লোহার রেলিং দেওয়া সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে।

ডাকব কি ডাকব না করেও অর্চনা ডেকে ফেলেছে,—দীপিকাআআ...

গোটা বাড়ি ভূতুড়ে রকমের স্তব্ধ। বার দুয়েক ডাকার পর দোতলায় খুট করে একটা শব্দ। নীচ থেকেই সোজা দেখতে পাচ্ছি কালচে সবুজ দরজা খুলে গেছে। বাদামি লুঙ্গি আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরা একজন বেরিয়ে এল। গায়ের রং তার ফ্যাকাশে রকমের ফরসা, অনেকটা চুনের দেওয়ালের মতো, মাথাজোড়া টাক, চোখের তলায় কালশিটে রঙের কালি।

মানসী কনুই দিয়ে কোমরে খোঁচা দিল,—দীপিকার বাবা।

আগে কোনো দিন দীপিকার বাবাকে দেখিনি। গুটি গুটি পায়ে আমি আগে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে প্রণাম করে ফেললাম,—আমরা দীপিকার বন্ধু।

দীপিকার বাবা হাসল না। গম্ভীর গলায় বলল,—তো?

আমরা ভয় পেয়ে গেলাম,—দীপিকা বাড়ি নেই?

—কেনো?

—না মানে ও কদিন ধরে স্কুলে যাচ্ছে না তো...

—আর যাবে না।

আমরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি। এ আবার কি কথা। দীপিকার বাবা কি পাগল নাকি!

অর্চনা সাহস করে জিজ্ঞাসা করে ফেলল,—কেন মেসোমশাই?

—কেন আবার কি! পড়তে পাঠাব না তাই। লেখাপড়া শিখে মেয়েছেলে আর দিগ্‌গজ হয়ে কাজ নেই। তোমরা আর ওর খোঁজ করতে আসবে না।

ভদ্রলোকের কথায় এমন একটা ঝাঁঝ ছিল যার তোড়ে আমরা হুড়মুড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেছি। চলে যাওয়ার জন্য উঠোনও পেরিয়েছি, হঠাৎই দোতলার কোনও ঘর থেকে ছিটকে এসেছে দীপিকা, —অ্যাই অপু, মানি, অর্চনা তোরা যাস না প্লিজ। দাঁড়া।

সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ কণ্ঠের হুঙ্কার,—খবরদার খুকু, এক পাও বেরোবে না।

—কেন, বেরোব না? নিশ্চয়ই বেরোব। আমি স্কুলে যাব। পড়াশুনো করব।

দীপিকার পরনে আধময়লা স্কার্ট ব্লাউজ, চোখমুখ ঝোলা ঝোলা, চুল দেখে মনে হয় বেশ কদিন চান করেনি। আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

দীপিকার বাবা দীপিকার হাত চেপে ধরল,—আমি তোমাকে বেরোতে বারণ করেছি খুকু। যাও। ঘরে যাও।

দীপিকা জোর করে হাত ছাড়াতে গেল, অমনি গালে সপাটে এক চড়। আমাদের সামনেই। আমাদের সামনেই ঘাড় ধরে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে দীপিকাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল ঘরে, দিয়েই দরজায় শিকল,—কী হল? তোমরা এখনও দাঁড়িয়ে আছ কেন? দীপিকার সঙ্গে দেখা হবে না। যাও।

অর্চনা আর্তনাদ করে উঠল,—আপনি ওকে ওভাবে মারলেন?

দীপিকার বাবা উত্তর দিল না। একইরকম কড়া চোখে তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে।

আমরা বেরিয়ে এলাম। রাস্তায় এসে এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছি।

—কেসটা কি বল তো? কেমন যেন মিস্টিরিয়াস না?

—এ আবার কি কথা! পড়তে দেবে না কেন? কেন ঘরে আটকে রাখবে?

—ওর মাকেও তো দেখলাম না! যা কিছু বলছে না বাবাকে!

অর্চনা বলল, —অন্য কোনো গণ্ডগোলও হয়ে থাকতে পারে। দীপিকা কারুর সঙ্গে প্রেমটেম করছে নাকি! সেটাই জানতে পেরে...

—দূর, ওর লাভার থাকলে আমরা জানতে পারতাম না!

—তাহলে দ্যাখ, ওর বাবা হয়ত কোনো মালদার অশিক্ষিত বনেদি পাত্রটাত্র জোগাড় করে ফেলেছে। ও হয়ত বিয়ে করবে না বলে জেদ ধরেছে তাই...

আমরা তিনজনই মোটামুটি শেষ সম্ভাবনাটার ব্যাপারে একমত হলাম। আবার মনটাও কেমন খুঁতখুঁত করতে লাগল। এরকমও হয়? একবার মনে

হল হতেও তো পারে। এই তো সেদিন বি সেকশনের ভারতী দিন পনেরো ডুব মেরে আচমকা এক মাথা সিঁদুর নিয়ে ভেসে উঠল স্কুলে। কী হাসিখুশি হাবভাব, কথায় কথায় গড়িয়ে পড়ছে বন্ধুদের গায়ে, শাঁখা চুড়িতে ঝমঝম আওয়াজ তুলে অসভ্য অসভ্য গল্প বলছে নিজের সম্পর্কেই।

সে যাই হোক, ভারতীর কথা ভাবতে একটুও ইচ্ছা করছিল না আমাদের। দীপিকার কথা ভেবেই সুন্দর সোনালি বিকেলটা কেমন পাঁশুটে মেরে গেছে। একটা একদম অচেনা যন্ত্রণা আমাদের তাজা ফুসফুসটাকে নিংড়ে নিচ্ছে। এক বুক মন খারাপ আমাদের। পর দিন। তার পরদিনও। লম্বি ধাস্‌সির কোর্ট হঠাৎই কেমন বিস্বাদ। আমি মানসীর বাড়িতে যাই। মানসী আমাদের বাড়িতে। কোনো কোনো দিন অর্চনাও আসে। বারান্দার ধাপিতে, সিঁড়ির কোনায় বয়ে যায় আমাদের পাঁশুটে বিকেল।

সবাইকে চমকে দিয়ে হাফইয়ার্লি পরীক্ষার দিন আচমকা হাজির দীপিকা। সাদা ব্লটিং পেপারের মতো মুখ, সেলাই করা ঠোঁট, ঘাড় নিচু করে পরীক্ষা দিয়ে গেল একের পর এক। আমরা কথা বলতে গেলেও উদাসীন চোখে শুধু জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকে।

পরীক্ষা শেষ হল। আমরা তিনজন গোলা পায়রা হয়ে উড়তে উড়তে বাড়ির কাছে হতশ্রী পার্কটায় গিয়ে বসলাম। প্রচুর কথা জমেছে বুকে। প্রচুর। ঠিক তখনই দীপিকা আমাদের খুঁজে বার করেছে পার্কটাতে।

আমরা হতবাক।

দীপিকা আমাদের পাশে বসে অন্যমনস্ক ভাবে ঘাস ছিঁড়ে দাঁত দিয়ে কাটল কিছুক্ষণ। কিছু বুঝি বলতে চায়, পারছে না। একসময়ে দুম করে অর্চনাকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। ওরকম বুকফাটা কান্না আমার আর কোনো বন্ধুকে কাঁদতে দেখিনি আগে। কখন যেন অর্চনাও কাঁদতে শুরু করেছে। মানসীও। দেখাদেখি আমিও। কেন কাঁদছি না জেনে অবিরাম কেঁদে চলেছি আমরা। তারই মধ্যে হেঁচকি তুলতে তুলতে দীপিকা বলল,—তোরা শুনলে গায়ে থুতু দিবি কিন্তু তোদের ছাড়া আর কাদেরই-বা বলব! আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না।

আমাদের কান্না ফুরোল।

—কেন রে!

—কি হয়েছে আমাদের খুলে বল।

দীপিকার কাঁধে হাত রাখল আলতো,—আগে এসব কথা তো বলিসনি কোনও দিন?

দীপিকা হাঁটুতে মুখ গুঁজল,—এ সব কথা কি বলে বেড়ানো যায়? সত্যিই তো বাবা কিছু করে না। দাদু মানে আমার মা'র বাবার রেখে যাওয়া টাকাতেই তো সংসার চলে আমাদের। বাড়িটাও তো দাদুর। বাবা তো ঘরজামাই।

ঘরজামাই শব্দটাও খট করে বেজেছে কানে। তখনও জানতাম ঘরজামাই শব্দটা প্রায় একটা গালাগাল। নিজের শব্দকোষে গালাগালির সংখ্যা তখনও বড় অপ্রতুল। শালা শব্দটাকেই কী যে নিষিদ্ধ, গর্হিত মনে হত তখন! ঘরজামাই ঠিক ততটা খারাপ না হলেও...। আমাদের বাড়ির ভোজপুরি ধোপা সুর করে গাইত, পহেলা কুত্তা পালতু কুত্তা, দুসরা কুত্তা ঘরজামাই।

আমি জিজ্ঞেস করে ফেললাম,—কেন? তোর বাবার ঘরদোর কিছু নেই?

—থাকবে না কেন? সেখান থেকে ভাইরা তাড়িয়ে দিয়েছে বহু দিন। আমার কাকা জ্যাঠারা কেউ বাবার মুখ দেখে না।

কান্নার সঙ্গে তীব্র বিষ উগরে দিচ্ছিল দীপিকা। বিষ নয়, ঘৃণা। নিজের বাবা মা'র প্রতি ঘৃণা, জীবনের প্রতি ঘৃণা, গোটা বিশ্বসংসারের ওপর ঘৃণা। সঙ্গে একই কথা, বাঁচব না, বাঁচব না। আর আমি তখন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম আমার বাবা-মার মুখ। বাবা যেমন হওয়া উচিত, অন্তত আমার তখনকার ধারণায় আমার বাবা তো তেমনই। বাবা মানে একটু গম্ভীর ধরনের এক মানুষ, বেশি কথা বলে না, সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বাজার যায়, ফিরে এসে মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়ে, তারপর চান খাওয়া সেরে মা'র হাতে তৈরি টিফিনটা নিয়ে সারাদিনের মতো অফিস চলে যায়, ফেরে সেই রাস্তার আলোগুলো জ্বলে যাওয়ার পর, সন্ধেবেলা নিয়ম করে রেডিয়োতে খবর শোনে, মাঝে মাঝে আমাদের অঙ্ক ইংরিজি দেখিয়ে দেয়, কখনও কখনও ঠোঙাভর্তি গরম জিলিপি কিনে আনে মোড়ের দোকান থেকে, কখনও-বা বচ্ছরকার আমটা, লিচুটা জামটাম, আর হঠাৎ হঠাৎ পড়া ধরে বকাঝকা করে ভীষণ। এই বাঁধাধরা সংজ্ঞার বাইরেও তবে অন্যরকম বাবা আছে! বাবা মানেই তবে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতা নয়! বাড়ি ফিরে সেদিন বার বার সন্দিগ্ধ চোখে তাকাচ্ছিলাম নিজের বাবা মা'র দিকে। মুখের ওপর কোনো মুখোশ আছে কি? হয়তো আছে, হয়তো নেই। কে জানে!

ক্লাস এইট থেকে নাইনে ওঠার পরীক্ষায় খুব খারাপ রেজাল্ট করল দীপিকা। সায়েন্স তো পেলই না, প্রোমোশনটাও অন ট্রায়াল। বড়দিনের ছুটির সময়ই খবর পেলাম ওকে অন্য কোথায় যেন পাঠিয়ে দিচ্ছে ওর রবিনকাকা আর মা, সেখানেই হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করবে। এর পর ওর আর কোনো খোঁজখবর পাইনি। দীপিকা ক্রমশ হারিয়ে গেছে আমার বিকেল থেকে। এখন বন্ধু বলতে আমরা দুজন। আমি আর মানসী। অর্চনা মাঝে মাঝে আসে বিকেলবেলায়, তবে মাঝে মাঝেই। ক্লাস নাইনে ওঠার পরই পড়াশুনা নিয়ে ও ভীষণ সিরিয়াস হয়ে উঠেছিল। রোগাসোগা মেয়ে, নানারকম অসুখেও ভুগত মাঝেমধ্যে।

স্কুল থেকে ফিরে আমি আর মানসী হেঁটে বেড়াই এদিক-ওদিক। তখন আর আমরা শিশু নেই, কেঁচো ব্যাঙের প্রজনন প্রণালি পড়তে রোমাঞ্চ বোধ করি, পুংকেশর গর্ভকেশরের মিলন কল্পনা করে পুলকিত হই। লুকিয়ে লুকিয়ে মানসীদের ছাদে বসে লেডি চ্যাটার্লিজ লাভারের অনুবাদ পড়ে শিউরে উঠি, কিছু দাগ দেওয়া পাতা বেছে বেছে পড়তে থাকি বার বার। রবিবার দুপুরে অনুরোধের আসরে শোনা কোনো গানের মোহজড়ানো বিভ্রমে আপ্লুত হই সারা সপ্তাহ। দূরের কোনো বাড়িতে গ্রামোফোন রেকর্ডে বাজতে থাকা 'গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু' শুনতে শুনতে বইয়ের অক্ষরগুলো চোখের সামনে থেকে ভোজবাজির মতো মিলিয়ে যায়। বিকেলবেলা ঘাসের লন ধরে হাঁটতে হাঁটতে নিজেদের অর্থহীন কথায় নিজেরাই হেসে কাচের মতো টুকরো টুকরো হয়ে যাই আর তখনই অনুভব করি ছায়া ছায়া অদৃশ্য অনুসরণকারীদের উপস্থিতি। হঠাৎই কোনো সাইকেল অসম্ভব ধীরগতিতে চলতে থাকে পাশে পাশে। পরিচিত গানের কলি স্বরযন্ত্রে ধাক্কা দেয়। দু-একটা চিঠিও পায়ের কাছে হুশহাশ উড়ে এসে পড়ে,—ডার্লিং, তুমি নেই তো পৃথিবী নেই। মা তোমাকে বউ হিসেবে পেলে খুব খুশি হবে। তেকোনা পার্কের সামনে কাল বিকেলে অপেক্ষা করব। চলে এসো। ইতি, তোমার পথ চেয়ে থাকা একজন। কী সাহস! কী সাহস! আমরা বিরক্ত হতে গিয়ে হেসে ফেলি। চারদিক তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সেদিন আর দেখা পাই না সেই অচেনা প্রেমিকের। চিঠি ছুঁড়েই

উধাও বীরপুঙ্গব। আমরা আবার কাঁঠালি চাঁপার গন্ধমাখা সবুজ ঘাস ধরে হাঁটতে থাকি। বিরক্তির সঙ্গে মেশে কৌতূহল। রাগের সঙ্গে অহংকারী পুলক। আমরা টের পাই প্রতিটি বিকেলে এখন নীরবে কুসুমের মতোই প্রস্ফুটিত হচ্ছে সে। আমাদের যৌবন!

তা সেই যৌবনের ডাক প্রথমে এল মানসীর কাছে। একদিন বিকেলে মানসীকে ডাকতে গেলাম, মানসী নেই। ম্যাজেনাইন ফ্লোরে সদ্য আসা তাদের পেয়িংগেস্টের কাছে কেমিস্ট্রি পড়ছে। দরজা ধাক্কা দিতে বেরিয়ে এসে বলল, —তুই যা, আমি পরে যাচ্ছি। প্রবীরদার কাছে ক'টা কেমিক্যাল ইকুয়েশান বুঝে নিচ্ছি।

নীচে নেমে অপেক্ষা করলাম, মানসী এল না।

পরদিনও একই ঘটনা। মানসী হাসি মুখে বেরিয়ে এল,—কাল বেরোতে পারলাম নারে, আজ ঠিক যাব। ট্রিগনোমেট্রির দুটো অঙ্ক করে নিয়েই.....

সেদিনও আমার বিকেলটা একা একাই কাটল।

পরদিন আবার একই ঘটনা। মানসী হি হি করে হাসছে,—মা কালীর দিব্যি, কাল পার্কের দিকে গিয়ে তোকে খুঁজেছিলাম, তুই চলে গেছিলি। আজ একটু অ্যামোনিয়ার প্রপার্টিগুলো বুঝে নিয়েই.....

সেদিন দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর খানিকক্ষণ কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভিতর থেকে মৃদু শব্দ ভেসে আসছে না? শব্দই তো। শব্দগুলোর কোনো অর্থ নেই। অন্তত সে অর্থ অ্যামোনিয়ার চ্যাপটারে তো নেইই।

নীচে নেমে আর অপেক্ষা করিনি। পরিচিত রাস্তা ধরে কৃষ্ণচূড়ার ফুল মাড়িয়ে একা একাই হেঁটেছি। দুর্বোধ্য অপমানে কান গরম। ক্ষোভে দুঃখে বন্ধুর মিথ্যাচারিতায় ক্লিষ্ট আমি একই পথ চক্কর দিয়ে ফিরছি। ধীরে ধীরে একটা চাপা কষ্ট আচ্ছন্ন করে ফেলছিল আমাকে। কষ্ট? না হিংসে? আমার একমাত্র বন্ধু মানসী প্রেমের সন্ধান পেয়ে গেছে আমার আগেই। ঠিক করলাম ওর সঙ্গে আর কথা বলব না। কিন্তু মানসী পরদিনই স্কুলে আমার হাত চেপে ধরেছে,—অপু, বিশ্বাস কর, তুই কী ভাবছিস জানি না......

—তোর কি ধারণা প্রেমে পড়লে বন্ধু টের পায় না?

মানসী মুহূর্তের জন্য লাল, —প্রবীরদার সঙ্গে তোর আলাপ নেই নারে? চল, আজ তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

—আমি আলাপ করে কী করব? তোর লাভার তুই......

—আহ অপু, ছেলেমানুষি করিস না। জানিস তোর কথা কত বলেছি প্রবীরদাকে? তোকে আজ নিয়ে যাবই।

আমি তখন অনেক উপন্যাস পড়ে ফেলেছি। জানি প্রেমের সিনে তৃতীয় ব্যক্তিকে বলে কাবাবমে হাড্ডি। তাছাড়া আমি কেন ওদের মধ্যে......?

মানসী কানের কাছে মুখ নিয়ে এল,—ভাবতে পারবি না প্রবীরদা কী ভীষণ রোম্যান্টিক। সেদিন আমার হাত ধরতে...দ্যাখ দ্যাখ ভাবতেই আমার কেমন গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে......

আমার তখন হিংসে ভেসে গেছে কৌতূহলে,—কী কথা হয় রে তোদের দুজনের?

—কত কথা। মানসী গা মুচড়োল,—এই আমি কী ভালোবাসি, ও কী ভালোবাসে, আমার মা বাবা কেমন, ওর দেশে কে কে আছে, এম. এস-সি করে ও কী করবে, বিয়েতে কারুর বাড়িতে আপত্তি হবে কি না......

—তোরা বিয়ের কথাও ভেবে ফেলেছিস?

—ভাবব না? তাড়াতাড়ি বিয়ে না করে ফেললে ওর যদি অন্য কারুর দিকে মন ঘুরে যায়?

—যাহ, প্রকৃত ভালোবাসা থাকলে লক্ষ বছর অপেক্ষা করা যায়। প্রাজ্ঞ প্রেমিকার মতো বললাম,—তুই লায়লামজনু পড়িসনি? হীররনঝা?

—তুই ঠিকই বলেছিস রে। প্রবীরদাও তাই বলে। বলে দরকার হলে দশ বছর অপেক্ষা করব, বিশ বছর অপেক্ষা করব। বলে তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করবে তো? মা কালীর দিব্যি, আমার অত ধৈর্য নেই রে।

মানসীর কথার ভঙ্গিতে হেসে গড়িয়ে পড়ছিলাম আমি। কোনোরকমে বললাম,—বালিকা, রহ ধৈর্যং, রহ ধৈর্যং......

একদিন বিকেলে অর্চনার বাড়ি থেকে একটা বই নিয়ে ফিরে দেখি মানসী আমাদের বাড়িতে বসে দিব্যি তেঁতুলের আচার খাচ্ছে। আমাকে দেখে চোখে আঙুলে ঠোঁটে এক রহস্যময় ইঙ্গিত করে বলে উঠল,—কিরে, কাল যাচ্ছিস তো?

—কোথায়!

—কেন তুই কাল স্কুল থেকে যাচ্ছিস না বেনহুর দেখতে? স্কুলে টাকা জমা করিসনি?

ভীষণ চমকেছি। মানসীর কথা মার কানেও গেছে, মা আমাকে জিজ্ঞেস করল,—তুই তো বলিসনি বাড়িতে এসে!

মানসীর রহস্যময় ইঙ্গিত তত্ক্ষণে বুঝে গেছি, বললাম—সে তো কাল টাকা দিলেও হবে। আমি ভেবেছিলাম আজ তোমাদের জিজ্ঞাসা করে.......

দাদা ভিতরের বারান্দায় বসে জলখাবার খাচ্ছিল। সদ্য তখন ফাস্ট ইয়ারে পড়ছে। বারান্দা থেকেই চেঁচিয়ে বলল,—যা যা দেখে আয়, যা একটা চ্যারিয়ট রেস আছে না!

রাস্তায় এসে মানসীকে বললাম,—ব্যাপার কিরে? গুল মারলি কেন?

মানসী আমার কাঁধ জড়িয়ে ধরল,—মা কালীর দিব্যি, প্রবীরদা এমন করে তোর সঙ্গে আলাপ করতে চাইল.......

—ইস, চাইলেই হল? আমি আলাপ করলে তো....

—প্লিজ অপু, ও তিনটে টিকিট কেটে ফেলেছে। জংলির। শাম্মিকাপুর আর সায়রাবানু।

—স্কুল থেকে বেরোবি কী করে!

—আমি কাল স্কুলে যাচ্ছি না। তুই টিফিনের সময় পেট ব্যথাট্যাথা কিছু বলে...

মিথ্যা কথা বলতে কী যে বুক টিপটিপ করেছিল স্কুলে! হলে পৌঁছেও মনে হয় জনঅরণ্যের প্রতিটি মানুষ যেন আমার ভীষণ পরিচিত, সকলেই যেন এক দৃষ্টে তাকিয়ে আমারই দিকে, যেন এখখুনি বাড়ি গিয়ে জানিয়ে আসবে মা বাবাকে। অল্পবয়সি যে কোনও ছেলে দেখলেই মনে হয় দাদার বন্ধু না! হল অন্ধকার হতে তবে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। এতো আর বাবা মার সঙ্গে শ্রীশ্রীমা, পথের পাঁচালি, লালুভুলু কি কাবুলিওয়ালা দেখা নয়, এ হল সবথেকে প্রাণের বন্ধু আর তার প্রেমিকের সঙ্গে বসে প্রায় নিষিদ্ধ এক হিন্দি সিনেমা দেখা, যার এক বর্ণ ভাষাও আমার বোধগম্য নয়। চোখের সামনে শুধু এক উদ্দাম দস্যু পুরুষ ইয়াহু চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে পদ্মের পাপড়ির মতো কোমল আর রূপসী এক প্রেমিকার ওপর। বরফের দৃশ্য দেখতে দেখতে আমারই যেন গায়ে জ্বর এসে গেল। প্রতি পলে পাশে বসা প্রেমিকযুগলের ফিশফিশানিও কানে আসছে, অন্ধকারেও টের পাচ্ছি মানসীর শরীরকে বেড় দিয়ে আছে প্রবীরদার বলিষ্ঠ হাত।

শো-এর আগেই আলাপ হয়েছিল প্রবীরদার সঙ্গে, হাফটাইমে দু একটা টুকটাক কথা, পরদায় যখন বুনো প্রেম শেষ হল তখন আর ভয় সংকোচ নেই, মুখে আমার কথার খই ফুটছে—তারপর মশাই, এই যে আমাকে পাপের ভাগী করলেন, তার শাস্তিটা পাবে কে?—প্রেমিক প্রেমিকার মাঝে ঈশ্বরও থাকতে ভয় পান, আমি তো নেহাতই এক ফচকে শয়তান।

কী করে যে বলেছিলাম ওসব কথা! তা যাই হক, হল থেকে বেরিয়েই আমি আর মানসী আলাদা, প্রবীরদা আলাদা। বাসে উঠে প্রবীরদা দূরের সিটে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক মুখ এক অচেনা তরুণ।

পাড়ায় এসে উত্তেজনায় ফেটে পড়ছিল মানসী,—এই অপু, বল না, বল না, কেমন লাগল প্রবীরদাকে?

গম্ভীর বিচারকের মুখ করে রায় দিলাম,—মন্দ নয়। বেশ উইটি। তোর টেস্ট আছে।

মানসী বিশাল লম্বা নিশ্বাস ফেলল,—যাক, আমরা যা ভাবনা হচ্ছিল।

সময়ের মনে সময় এগোয়। বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ফুরিয়ে শীত এসেছে। অ্যানুয়াল পরীক্ষা চলাকালীন বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তায় পাড়ার জুনিয়ার মেয়েদের খেলা দেখছি, সেদিন অঙ্ক পরীক্ষা ছিল, ট্রিগনোমেট্রিটা ভালো হয়নি সেজন্য মনটাও বেশ খারাপ, পর দিন বায়োলজি পরীক্ষার জন্য পড়তে বসায় তেমন উৎসাহ পাচ্ছি না, এমন সময় মানসী এল। তার চোখমুখও কেমন আনমনা, আমারই পাশে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে অথচ কোনো কিছুই যেন দেখছে না। গত ক'মাস ধরে ওর যেন কী রকম ছাড়া ছাড়া ভাব। প্রায়ই বিকেলে কোথাও না কোথাও অভিসারে নিপাত্তা হয়ে যায়, পুজোর ক'দিন একটি সন্ধেতেও ওর টিকি দেখা যায়নি।

একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, —খুব সাহস বেড়েছে দেখছি, মাসিমা যদি জানতে পারে?

—তুই কি ভাবছিস মা কিছুই আন্দাজ করে না? প্রবীরদাকে মারও খুব পছন্দ। হবে না'ই বা কেন বল? ব্রাইট স্টুডেন্ট, অত সুন্দর চেহারা, ভালো ফ্যামিলি, দেশে কত জমিজমা বাড়িঘর....

—তাই তোর এত সাহস? আজ বেলুড় দক্ষিণেশ্বর, কাল সিনেমা, পরশু লেক... খুব চালাচ্ছিস? তা এখনও কি শুধু হাত ধরাধরিই, না একটু এগিয়েছে?

—যাহ্। প্রচণ্ড জোরে চিমটি কেটেছে মানসী,—তুই বড় ফাজিল হয়েছিস! বলতে বলতে গলা নামিয়েছে,—কিস করেছে।

মিস মার্পলের মতো ওর চোখের দিকে তাকিয়েছি আমি,—কেমন লাগে রে? টকটক? মিষ্টি মিষ্টি? ভীষণ ভাল?

—ও বলে বোঝানো যায় না। তোর হোক, বুঝতে পারবি। স্বর্গসুখ রে স্বর্গসুখ। প্রবীরদার সঙ্গে এর মধ্যে দু-একবার দেখা হয়েছে এদিক-ওদিক, হেসে কথাও বলেছি এক আধটা, ভালোই লেগেছে। হিংসে এখন অতীত। মনের গভীরে ওদের প্রেম কীভাবে পূর্ণতা পাবে তাই নিয়ে ভাবি দিনরাত। যেন ওদের প্রেমের সার্থকতাকে আমারও কিছু অংশীদারি রয়ে গেছে।

পাশে দাঁড়ানো মানসীকে জিজ্ঞাসা করলাম,—কিরে মানি, পরীক্ষার সময়তেও ধ্যান চলছে?

মানসী মাথা ঝাঁকাল, নাহ্, কালকের বায়োলজি পরীক্ষার কথা ভাবছি।

—বাজে বকিস না। তোর নাকটানা দেখেই আমি বুঝতে পারি সর্দি হয়েছে কিনা। প্রবীরদার সঙ্গে ঝগড়া করেছিস।

শীতের শুকনো পত্রপুষ্পবিহীন কৃষ্ণচূড়া গাছের দিকে তাকিয়েছিল মানসী। হুট করে আমার হাত চেপে ধরেছে,—ও কেমন বদলে যাচ্ছে রে অপু।

—কেন? কী বলেছে তোকে?

—বলবে আবার কি। দুচার মিনিট কথা বলেই আমাকে আজকাল কাটাতে চায়। বেরোতে বললে পড়াশুনোর ছুতো দেখায়।

—বারে, পড়াশুনো করবে না? রেজাল্ট ভালো হলে তো তোরই লাভ। সে'ও তো তোরই জন্যে।

—হুঁহ্, আমার জন্যে না হাতি। মেয়েদের চোখ ঠিক বুঝতে পারে। তুই একবার ওর সঙ্গে কথা বলবি?

—আমি! আমি কী বলব। সদ্যপড়া উপন্যাস উগরে দিলাম মানসীকে, —দ্যাখ মানি, প্রেম হল এক ধরনের সাধনা, ব্রত। দুজন নারীপুরুষের মধ্যে চিরন্তন সম্পর্কের ইমারত গড়ে ওঠার শক্ত ভিত। প্রবীরদাকেও তো দেখেছি, মিথ্যে ভাবিস না, প্রবীরদা খুবই ভালোবাসে তোকে।

মানসী হঠাৎ খেপে গেল,—থাক, তোকে আর লেকচার মারতে হবে না। যদি কোনো দিন মরে যাই....

আমি ওর মুখ চেপে ধরলাম,—তুই তো লায়লাকেও হার মানালি রে। অল রাইট, কাল পরীক্ষা শেষ হোক, ধরছি প্রবীরদাকে।

পরীক্ষার পর মানসীর ঘ্যানঘ্যানানি এড়াতে না পেরে শেষ পর্যন্ত এক বিকেলে গেলাম প্রবীরদার ঘরে। আমাকে দেখে প্রবীরদা প্রথমটা খুব অবাক। শুধু অবাক নয়, কেমন যেন মনে হল খুশিও।

সরাসরি কথা পাড়লাম,—অ্যাই মশাই, আমার সুন্দর বন্ধুটাকে আপনি এত কষ্ট দিচ্ছেন কেন?

প্রবীরদা অল্প থমকাল,—কষ্ট দিয়েছি? কই নাতো!

—বাজে কথা বলবেন না। ওর সঙ্গে আপনি ভালো করে কথা বলেন না, বাইরে বেরোতে চান না, কথা বলতে গিয়ে হাই তোলেন, ব্যাপারখানা কি?

আমার আক্রমণে বিন্দুমাত্র বিচলিত নয় প্রবীরদা, মিটিমিটি হেসেই চলেছে,—তোমার বন্ধুর কথা ছাড়ো। নিজের কথা বলো। তোমাকে যে কী সুন্দর দেখতে লাগছে আজ। এখ্খুনি যদি সুচিত্রা সেন তোমাকে দেখত...

একটা শিরশিরে চোরা স্রোত বয়ে গেল আমার শরীর বেয়ে। জীবনে প্রথম কোনো পুরুষের মুখে আমার রূপের স্তুতি।

—ইস, ফাজলামি হচ্ছে? দেব মানিকে বলে তখন টেরটি পাবেন।

হঠাৎই প্রবীরদা এগিয়ে এল আমার দিকে,—তোমার মনে হচ্ছে আমি ফাজলামি করছি? তুমি জানো তুমি কত সুন্দর? আয়নায় ভালো করে দেখেছ নিজেকে?

প্রবীরদার চোখ ক্রমশ ঘোলাটে, অস্বচ্ছ। আমি সরে আসার আগেই আমার হাত চেপে ধরেছে,—বিশ্বাস করো অপরাজিতা, তোমাকে দেখার পর থেকে, তোমার সঙ্গে কথা বলার পর থেকে, মানসী অসহ্য হয়ে গেছে। ম্যাড়মেড়ে। জোর করে ওর সঙ্গে বেরিয়েছি, এদিক ওদিক গেছি কিন্তু সে প্রায় বাধ্য হয়ে। তুমি ছাড়া...

কেউ যেন সিসে গলিয়ে ঢেলে দিচ্ছে আমার কানে। সজোরে নিজেকে ছাড়িয়ে দু'হাতে কান চেপে ধরলাম,—কী পাগলের মতো যা তা বলছেন! এ তো চ্রৈচারি, চিটিং, ছি ছি ছি....ছিঃ।

পলকে আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল প্রবীরদা। দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে আমার কোমর। এক ধাক্কায় ফেলে দিয়ে ছিটকে এসেছি ভেজানো দরজার কাছে। নিচু স্বরে হিসহিস করে উঠলাম, —জানোয়ার। জানোয়ার কোথাকার। মানি একটা জানোয়ারকে ভালোবেসেছিল।

নীচে উদ্বিগ্ন মানসীর সামনে এসে দাঁড়ানোর সময়েও হৃৎপিণ্ড পাগলা ঘণ্টি বাজাচ্ছে। মুঠো শক্ত করে চোয়ালে চোয়াল ঘষলাম। মানসী যেন কিছু আঁচ করতে না পারে।

—কী বলল রে?

—কিছুই না, এমনি হাসিঠাট্টা করছিল। শক্ত রাখতে গিয়েও আমার গলা কেঁপে গেল,—তুই ওকে ভুলে যা মানি। ও বোধহয় অন্য কাউকে...

মানসী অন্ধের মতো আঁকড়ে ধরল আমাকে, বলল? বলল সে কথা? বলল আমাকে ভালোবাসে না?

—বলেনি। কথা শুনে মনে হল। আমি ঢোঁক গিললাম, —হয়তো ইউনিভার্সিটিতে কাউকে...হয়তো নিজের দেশেরই কেউ....

মানসী এক ছুটে দোতলার সিঁড়ির কাছে গিয়ে ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল। দু'হাঁটুতে মুখ গুঁজে ভেঙে পড়েছে শব্দহীন কান্নায়, কান্নার দমকে ফুলে ফুলে উঠছে। আমারও চোখ ফেটে যাচ্ছিল। নিজেকে প্রাণপণে সামলানোর চেষ্টা করছি,—কাঁদিস না মানি। একটা নোংরা বাজে লোকের জন্য তুই কাঁদবি কেন? ও তোর মতো মেয়ের কান্নার যোগ্য নয়।

বলতে গিয়ে বমি এসে যাচ্ছে। তখনও যেন আমার শরীরটাকে চাটছে ওই পুরুষ নেকড়েটা। নেকড়ে নয়, শেয়াল।

এই তবে প্রেম? ঘেন্না। ঘেন্না। ঘেন্না।

এর পর বেশ কিছুদিন কেমন যেন থম মেরে গিয়েছিলাম আমরা। মানসী তো পুরোপুরি বিধ্বস্ত। মানসিকভাবে, শারীরিকভাবেও। নিয়মমতো স্কুলে যায়, একেক দিন বিকেলবেলা জোর করে ওকে টেনে বাইরে বার করি, কখনও নিজেই বাড়িতে বসে থাকি চুপচাপ। চোখে জমে থাকে বিষাদের বরফ। তবে সময় তো সম্মোহনের মন্ত্রমাখা একমুখী ধাবমান তির, সেই সম্মোহনেই বিষাদ মুছে যায়, নিরাময় হয় শোকের ক্ষত। সেই সম্মোহনেই প্রথম পুরুষের দেওয়া অপমান ভুলি আমরা। আবার নতুন করে হাঁটতে শুরু করি হলুদ বিকেলে। ঘুমন্ত রিকশওলার কাঁধের গামছা চুরি করে হাসিতে গড়িয়ে পড়ি, পাড়ার ছোট মেয়েদের সঙ্গে দাগবসন্তী খেলায় মেতে উঠি এক আধদিন, দাদার কাছে বাধ্য ছাত্রীর মতো বসে অ্যালজেব্রা করি দুজনে। আমরা দুজনেই ঠিক করেছি হায়ার সেকেন্ডারির পরে ডাক্তারি পড়ব। হাজার হাজার রোগী আসবে আমাদের কাছে, তাদের কাছে আমরাই ঈশ্বর, ভাবলেই কী যে শিহরন জাগে। তার জন্য অবশ্য ভালো রেজাল্ট করা দরকার। অর্চনার চিন্তা নেই, ও যা লেখাপড়ায় ভালো, ডাক্তারিতে চান্স পাবেই। তবে ইদানীং মেয়েটা একটা বিশ্রী মাথার যন্ত্রণায় মাঝে মাঝেই বড় কষ্ট পাচ্ছে। ইলেভেনে ওঠার পর থেকে তো প্রায়ই

কামাই করছে। প্রিটেস্টের আগে পাক্কা কুড়ি দিন দেখা নেই। এখন আর অর্চনার সঙ্গে তেমন যোগাযোগ না থাকলেও পুরোনো একটা টান তো আছেই। সেই টানেই আমি আর মানসী ওকে একদিন দেখতে গেলাম।

অর্চনাদের বাড়িটা আগে একতলা ছিল। এখন দোতলা তিনতলা উঠে গেছে। লোহার ব্যবসায়ে অর্চনার বাবা জ্যাঠার নাকি এখন দারুণ রমরমা। বাড়ির সামনে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে সুন্দর বাগান, বাগানের ঠিক মাঝখানে একটা গন্ধরাজ ফুলের গাছ। সাজানো বাগানের মাঝে আলটপকা গাছটা কেমন যেন বেমানান।

অর্চনা দোতলার ঘরে শুয়ে ছিল, আমাদের দেখে উঠে বসেছে। খুবই রোগা হয়ে গেছে কদিনে, চোখের তলায় নীলচে ছোপ। ক্ষীণ স্বরে ডাকল, —আয়। এতদিন পরে খোঁজ নিতে এলি?

মানসী বলল,—রোজই ভাবি আসব, হয়ে ওঠে না রে। এত পড়ার চাপ...

আমি ঢোঁক গিললাম। শুধুই কি পড়ার চাপ? যোগাযোগের অসুবিধে? নাকি অন্য কারণও আছে? নিজেদের তৈরি করা জগতে ডুবে আমি আর মানসী একটু স্বার্থ সচেতন হয়ে যাইনি কি? নিজেদের নিয়েই নিজেরা মগ্ন আছি? দীপিকার কথাও তো আজকাল মনে পড়ে না আমাদের? অপরাধী মুখে প্রশ্ন করলাম, —এখন কেমন আছিস?

অর্চনার মা ঘরেই ছিল, করুণ মুখে বলে উঠল,—দ্যাখো না, এত ডাক্তার দেখানো হল, এবার আর মাথাব্যথাটা কিছুতেই যেতে চাইছে না। হঠাৎ হঠাৎ বেড়ে যায়। তখন কী হয়ে যায় ওর! হাত পা ছুঁড়তে থাকে, চোখ উলটে যায়, গোঁ গোঁ শব্দ ওঠে গলা থেকে, দেওয়ালে পাগলের মতো মাথা ঠোকে তখন।

—ডাক্তাররা কী বলছে?

—একেক ডাক্তারের একেক মত। মাথার ছবিও তো তোলা হল, কিছুই পাওয়া গেল না। কেউ বলছে এ এক ধরনের হিস্টিরিয়া, কেউ বলছে নার্ভের দোষ, কেউ বলছে ব্রেনে কোথাও কিছু হয়েছে...। অর্চনার মা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, —কী যে হল।

অর্চনা চোখ বুজে ফেলল, ঠোঁট দুটো কেমন সাদাটে হয়ে গেছে, কাঁপা গলায় বলল,—কবে যে আবার স্কুল যেতে পারব!

মানসী বলল, —ওষুধ পড়ছে তো দ্যাখ না, দু চার দিনের মধ্যেই ভালো হয়ে উঠবি।

আমাদের কথাবার্তার মাঝে অর্চনার জেঠিমা আমাদের জন্য সিঙ্গাড়া মিষ্টি নিয়ে এসেছেন। অর্চনার মা'র মতো এঁর কপালেও এক ধ্যাবড়া সিঁদুর, সিঁথি জবজবে লাল, ঘরেও এঁরা খুব দামি দামি তাঁতের শাড়ি পরেন। অর্চনার জেঠিমার চেহারা বেশ দশাসই, অর্চনার মা'র মতো রোগাসোগা, ছোটখাটো নয়, চোখ দুটো জগদ্ধাত্রী ঠাকুরের মতো বড় বড়, টানা টানা। তিনি বললেন, —আর গুচ্ছের ওষুধ খাইয়ে কাজ নেই। ডাক্তারদের কেরামতি বোঝা গেছে। পরশু গুরুদেব এসে পড়ছেন, তাঁর ছোঁওয়াতেই অনু আমাদের ঠিক সেরে উঠবে।

রাস্তায় এসে মানসীকে বললাম,—কী হয়েছে ডাক্তাররা ধরতে পারছে না কেন বল তো?

—কে জানে, ডাক্তাররা তো আর ধন্বন্তরি নয়। অনেক অসুখই তো আছে ধরা পড়ে না। বড় বড় ডাক্তাররাও...

—তার মানে ডাক্তার হলে আমরাও অনেক রোগ ধরতে পারব না! রুগি মরে যাবে!

মানসী হেসে ফেলল,—আগে থেকে এত ঘাবড়ে যাচ্ছিস কেন? হয়তো ওরা যাদের দেখিয়েছে তারা ধরতে পারেনি। বিজ্ঞান এখন অনেক উন্নতি করছে, কত সব জটিল রোগের ওষুধ বেরিয়ে গেছে...

আমি বললাম,—তাছাড়া মাথার ওপর ভগবান আছেন। অর্চনাকে ভগবানই ঠিক ভালো করে দেবেন।

মানসী অল্প উত্তেজিত হল,—ওষুধ না খাওয়ালে ভগবানের বাবারও সাধ্যি নেই ওকে ভালো করার। শুনলি না ওর জেঠিমা কী বলল?

—দূর, ওটা কথার কথা। নিজের ছেলেমেয়েকে কেউ ওষুধ না খাইয়ে থাকতে পারে! দ্যাখ হয়তো গুরুদেবই কিছু ওষুধ বিষুধ জানেন... তাঁর ওষুধেই হয়তো ভালো হয়ে যাবে অর্চনা।

তখনও আমাদের মনে এরকমই অনেক সাদামাটা সরল বিশ্বাস। জীবনের প্রতি। মানুষের প্রতি। ঈশ্বরের প্রতি। বাড়ি ফিরেও তাই ঠাকুর প্রণাম করতে গিয়ে মনে মনে বলছি,—হে ঠাকুর, অর্চনাকে তুমি ভালো করে দিয়ো। যে করে হোক।

এর পর ক'দিন প্রিটেস্টের চাপে অর্চনাকে আর দেখতে যাওয়া হয়নি। পরীক্ষা শেষ হওয়ার ঠিক পরেই একদিন স্কুলে গিয়ে দেখি আমাদের ক্লাসের মেয়েরা এক জায়গায় জটলা বেঁধে দাঁড়িয়ে কী যেন বলাবলি করছে, তখনও প্রেয়ারের সময় হয়নি। অন্যদের মতো আমি আর মানসীও ভিড়ে ঢুকে পড়লাম,—কী হয়েছে রে?

—ওমা, তোদের সঙ্গে এত ভাব তোরা জানিস না? অর্চনা মা কালী হয়ে গেছে। ওদের গুরুদেব নাকি বলেছেন...

পুরোটা শোনার আগেই প্রার্থনার ঘণ্টা পড়ে গেল। খোলা আকাশের নীচে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আমরা হাতজোড় করে গাইছি,—তোমারই গেহে পালিছ স্নেহে, তুমি ধন্য ধন্য হে...

ক্লাসে ফিরে আবার সেই জটলা। আবার সেই রোমহর্ষক আলোচনা।

মানসী জিজ্ঞাসা করল,—তোরা কেউ নিজের চোখে দেখেছিস?

কেয়া চোখ ঘোরাল,—দেখে কাজ নেই, যা শুনছি তাই যথেষ্ট। দুনিয়াসুদ্ধ লোক সবাই জেনে গেছে। প্রত্যেক শনি মঙ্গলবারে নাকি ভর হচ্ছে অর্চনার, মা কালী আসছেন ওর শরীরে।

মানসী অবিশ্বাসী গলায় বলল,—যাহ্ এই সেদিন আমরা গিয়ে দেখে এলাম...

—আমিও তো প্রথমে বিশ্বাস করিনি। ওরা নাকি আর ডাক্তার দেখাচ্ছে না। গুরুদেব কিসব শেকড়বাকড় খাওয়াচ্ছে, তাই খেয়ে নাকি মড়ার মতো পড়ে থাকে সারাদিন। বিশ্বাস না হয়, আজ তো মঙ্গলবার, গিয়ে দেখে আয় না।

ছুটির পর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছি।

অর্চনা দোতলার সেই ঘরেই চোখ বুজে শুয়ে। পরনে চওড়া লালপাড় সাদা তাঁতের শাড়ি, শীর্ণ প্যাকাটির মতো চেহারা। শুধু মেঘলা বিকেলের শেষ আলো এসে ওর ফ্যাকাশে মুখটাকে যা একটু উজ্জ্বল করে রেখেছে। আমাদের দেখে অনেক কষ্টে চোখ খোলার চেষ্টা করল, পারল না, আপনা থেকেই চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। জড়ানো স্বর শুধু বলতে পারল, —স্কুল হচ্ছে? পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল নারে? অনেক পড়া এগিয়ে গেছে?

মানসী অর্চনার অস্থিসার হাতে হাত রাখল, —তেমন কিছু না, তুই সেরে ওঠ, ঠিক ধরে নিতে পারবি।

অর্চনার বন্ধ চোখের কোলে দুফোঁটা জল টিলটিল, —ফিজিক্সটা এখনও কত বাকি রয়ে গেছে আমার...

কথা শেষ হওয়ার আগেই অর্চনার মা ঘরে ঢুকে আঁতকে উঠেছে,

—একি! তুমি ওকে ছুঁয়েছ কেন! শনি মঙ্গলে ওকে ছোঁওয়া একদম বারণ।

মানসী ভয়ে ভয়ে হাত ছেড়ে দিল, —কেন মাসিমা?

—গুরুদেব বলেছেন যে যেদিন ওর শরীরে মা অধিষ্ঠান করবেন, সেদিন ওকে বাইরের লোক স্পর্শ করতে পারবে না। তোমরা এক কাজ করো, নীচের ঘরে গিয়ে বোসো, একটু পরে ওর আরতি আরম্ভ হবে, প্রসাদ নিয়ে যেয়ো।

ভদ্রমহিলার স্বরে এমন কিছু ছিল, আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো নীচে নেমে এলাম। বড় হলঘরটায় এর মধ্যেই ধূপধুনো দেওয়া শুরু হয়ে গেছে। অর্চনার জেঠিমা গরদের শাড়ি পরে গঙ্গাজল ছিটোচ্ছেন গোটা ঘরে। ফাঁকা ঘর আমাদের চোখের সামনেই ভিড়ে ভিড়। আরও খানিকক্ষণ পর, লাল, পোশাকপরা, বাবরিচুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো, সৌম্যদর্শন এক উজ্জ্বলচোখ সন্ন্যাসী খড়ম খটখটিয়ে নেমে এলেন ওপর থেকে। মুহূর্তে দিব্য গন্ধে চতুর্দিক মাতোয়ারা। সকলে ভক্তিভরে উঠে দাঁড়িয়েছে। দেখাদেখি আমরাও। অজান্তেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, —কী অলৌকিক গন্ধ রে মানি!

মানসী জোরে জোরে নাক টানল, —গন্ধটা খুব চেনা চেনা লাগছে রে আমার! কোথায় যেন... কোথায় যেন....! বড়মাইমার ফ্রেঞ্চ পারফিউমটা কি...?

ভক্তদের বাবা বাবা রবে মানসীর গলা ঢাকা পড়ে গেল। তিনি সযত্নে পাতা অজিনাসনে বসলেন। মন্দ্র কণ্ঠে সকলকে বললেন, —বোসো। বলেই অর্চনার বাবার দিকে তাকিয়েছেন, —কই, আমার বেটি কোথায়? আমার খ্যাপা মা?

অর্চনার বাবা আর জ্যাঠতুতো দাদা প্রায় কোলপাঁজা করে নিয়ে এল আধা অচেতন অর্চনাকে। জ্যাঠা তাকে স্থাপন করলেন লাল শাটিনমোড়া বেদির ওপর। অর্চনার দুই বোন দ্রুত এসে তিনদিকে তিনখানা তাকিয়া দিয়ে দিল। সেই তাকিয়ার ঠেকাতে আধশোয়া অর্চনা কেমন নির্জীব নিষ্প্রাণভাবে ঝুলছে। টকটকে লাল একটা শাড়ি তার শরীর ঘিরে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো, গায়ে ব্লাউজ নেই, মাথার চুল খোলা, কপালে অ্যাত্তো বড় একটা রক্তচন্দনের ফোঁটা। গুরুদেব তার গলায় পঞ্চমুখী জবার মালা পরিয়ে জলদগম্ভীর গলায় হুঙ্কার ছাড়লেন, —মা মাগো করালবদনী তারা ব্রহ্মময়ী, একবার বুকে চেপে বোস মা, বদরক্ত সব বেরিয়ে যাক... মা... মাগো...

চিৎকারের জন্য কি না জানি না অর্চনার স্থির শরীর একটু নড়েচড়ে উঠল।

তারপর আচমকাই গলা থেকে ছিটকে এসেছে গোঁগোঁ শব্দ, ঠোঁট বেয়ে কষ গড়াচ্ছে, এক মাথা চুল ঝপাং করে নেমে আসছে মুখের ওপর, আবার ঝাঁকুনি খেয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। ঘর জুড়ে অস্ফুট মা মা ধ্বনি। আচমকা কে যেন কাঁসর বাজাতে শুরু করল, অর্চনার মা শাঁখ বাজাচ্ছে, বাবা জ্যাঠা-জেঠিরা সাষ্টাঙ্গে প্রণত মেয়ের পায়ের কাছে। গুরুদেব একটু করে ফুল ছিঁড়ে ভক্তদের হাত দিচ্ছেন আর প্রশ্ন করছেন, —বলো, তোমার কী জিজ্ঞাস্য আছে? মা'র কাছে কী জানতে চাও তুমি? এক এক করে মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে সামনে, মাকে প্রণামী দিয়ে জানতে চাইছে নিজের ভূত ভবিষ্যৎ, আর গুরুদেব মায়ের থরথর ঠোঁটের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে শুনে নিচ্ছেন উত্তর।

আমার কী রকম গা ছমছম করছিল, সুগন্ধী ধোঁয়ায় সব আবছা হয়ে আসছে। হঠাৎ দেখি নীলসাদা স্কুল ইউনিফর্ম পরা মানসী এগিয়ে যাচ্ছে বেদির দিকে। একেবারে সামনে গিয়ে প্রশ্ন করছে, —মা, আমাদের অর্চনা কবে ভালো হবে মা?

এবার আর গুরুদেব অর্চনার দিকে ফিরলেন না, মানসীকে কাছে টেনে নিয়েছেন, মণিমুক্তোখচিত আঙুলগুলো মানসীর মাথার ওপর, —ভালো হবে কী রে বেটি, তোর বন্ধু তো ভালো হয়ে গেছে।

বাড়ি ফিরে সবিস্তারে সকলকে বর্ণনা দিলাম পুরো ঘটনাটার। মা তো শুনে গদগদ,—আমাকে সামনের শনিবার একবার নিয়ে চল তো।

বাবা ধমকে উঠল, —খবরদার না। যত সব বুজরুকি। ভণ্ডামি।

দাদা বলল,—পুলিশে খবর দেওয়া উচিত। গুরুদেবটাকে ইমিডিয়েটলি অ্যারেস্ট করুক।

আমি তর্ক করে উঠলাম,—কেন? তিনি কী দোষ করলেন? তাঁর ওষুধ খেয়ে মাথার যন্ত্রণা আর একটুও নেই অর্চনার, সেটা জানিস? তাছাড়া আমরা নিজের চোখে দেখে এসেছি ওর ভেতরে সত্যি সত্যি মা কালী...

দাদা রেগে গেল, —হায়ার সেকেন্ডারি দিবি, এখনও এত গাধার মতো কথা বলিস কী করে রে অপু?

আমি দাদার ওপর খুব রেগে গেলাম। তর্ক করলাম না বটে তবে বাবার কথাও মানতে পারলাম না মনে মনে। বিশ্বাসেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। আমি জানি। ঠিক করলাম এর পরদিন মা কালীর কাছে গিয়ে পরীক্ষার রেজাল্টটা কী হবে জেনে আসব। অর্চনার বোন বলছিল ওর বাবা জ্যাঠারা

নাকি একটা মন্দির করে দেবেন গুরুদেবকে, সেখানে মায়ের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলেই মা কালী অর্চনার শরীর থেকে বেরিয়ে আসবেন, তখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে অর্চনা।

অর্চনাটা অবশ্য তার আগেই মরে গেল।

সেদিন ছিল রাখিপূর্ণিমা। সকাল থেকেই টিপটিপ বৃষ্টি। কেয়ার মুখে খবর পেয়ে আমি আর মানসী পড়িমরি করে ছুটেছি। গিয়ে দেখি ক্লাশের প্রায় অর্ধেক মেয়ে পৌঁছে গেছে। কয়েকজন দিদিমণিও। ভেঙে পড়েছে গোটা অঞ্চল। অত লোক, তবু কারুর মুখে একটা শব্দ নেই।

উঠোনের ফুলে ভরা গন্ধরাজ গাছটার নীচে বিশাল এক বোম্বাই খাটে শুয়ে আছে অর্চনা। রক্তলাল শাড়ির আড়ালে শুকনো সরু কাঁঠালিচাঁপা ডালের মতো শরীর প্রায় দেখাই যায় না, ছোট্ট কপালে টিপ যেন শেষ বিকেলের সূর্য, গলায় জবাফুলের মোটা মালা।

আমার সমস্ত শরীর ঝনঝন করে উঠল। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি অর্চনা চোখ খোলার চেষ্টা করছে, পারছে না... স্কুল হচ্ছে অপু? অনেক দূর পড়া হয়ে গেল নারে? ফিজিক্সটা এখনও কত বাকি রয়ে গেছে আমার...!

দু' হাতে মুখ ঢেকে ফেললাম। চারদিকে এ কী ভয়ানক ভাঙচুর চলছে! ভাঙছে। ভাঙনে সব ভেসে গেল। শ্রদ্ধা। প্রেম। সমর্পণ। ভক্তি। বিশ্বাস। আমার ভেজা চোখ মাড়িয়ে অর্চনা চলে গেল। দীপিকা চলে গেল। প্রবীরদারাও। বিকেল বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল। আমাদের সুন্দর বিকেল। আমাদের হলুদ বিকেল।

এখন শুধু সামনে এক যুদ্ধের প্রস্তুতি। শরতের বাতাস কাঁপিয়ে মাঝে মাঝেই সাইরেন বেজে ওঠে। এয়াররেড। অল ক্লিয়ার। এয়াররেড। ছদ্ম মহড়ায় স্কুলে খোঁড়া ট্রেঞ্চে অথবা বালির বস্তার আড়ালে লুকোই আমরা। সন্ধে হতেই রাস্তার বাতিগুলো মুখ ঢাকে কালো ঠুলিতে, রুদ্ধ জানলাদরজার কাচে আড়াআড়িভাবে সাঁটা হয় কাগজের ফালি। পুজোর আগে শহর জুড়ে প্রতিরোধের সাজসাজ রব। আমার মনের ভিতরও এক যুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে থাকে অবিরাম। ক্রমশ বড় হয়ে উঠি আমি। সত্যিকারের বড়।

রাবংলা

আলুপরোটা ছিঁড়তে ছিঁড়তে সুখেন্দু বলল, রাবংলা নামটা ভারি সুন্দর, না?

সপ্তমীর সকাল। বাইরে ঝলমল করছে পিতলরঙা রোদ। কালও আকাশে একটু একটু মেঘ ছিল, আজ আর তাদের ছিটেফোঁটাও নেই। ঝকঝক করছে ঘন নীল। বাতাসে নিয়ম মতোই পুজো পুজো গন্ধ।

কস্তুরী মেয়ের প্লেটে সস ঢালছিল। ফিক করে হেসে ফেলল, এসব অদ্ভুত জায়গা কোথা থেকে জোটাও বলো তো? সেবার মুসৌরি বেড়াতে গিয়ে কোথায় যেন নিয়ে গিয়েছিলে?...ধনৌলটি।... হ্যাঁ হ্যাঁ, ধনৌলটি।

—জায়গাটা দারুণ ছিল না?

—ছাই দারুণ। শুধু কুয়াশা আর বৃষ্টি। ভালো করে হিমালয় দেখাই গেল না।

—তোমার দেখার চোখ নেই। কী সিরিন নিস্তব্ধ জায়গা...যেন এই পৃথিবীর বাইরে। রাবংলা ওর চেয়েও ভালো।

—কেন? তোমার অফিসের দীপ্তেশবাবু বলেছে বলে?

—দীপ্তেশ রায় দুনিয়াচষা লোক। তার চোখ ভুল বলে না। নীল হিমালয়, সবুজ অরণ্য, হাত বাড়ালেই নাকি কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ায় সোনা পিছলোচ্ছে আর রাত্তিরবেলা লুকোচুরি খেলছে রুপোলি জ্যোৎস্না। উফ, কী এক্সাইটিং।

—দেখো, গিয়ে যেন আবার নিরাশ হোয়ো না।

মিক্সড পিকল জিভে ঠেকিয়ে চুক চুক আওয়াজ করছে বুবলি। তার এবার ক্লাস নাইন। সদ্য চশমা নিয়েছে সে। চশমার মর্যাদা বাড়ানোর জন্য

সব সময়ই মুখখানাকে প্রাজ্ঞ প্রাজ্ঞ করে রাখে বুবলি। বাবা-মার কথোপকথনে সে বিশেষ আগ্রহী নয়। এখনও তার মধ্যে তেমন একটা নিসর্গপ্রেম জাগেনি।

উদাসীন স্বরে সে বলল, আমি কিন্তু ওয়াকম্যানটা নিয়ে যাব বাপি।

কস্তুরী চোখ পাকাল,—কেন? বেড়াতে গিয়েও গান না শুনলে চলবে না?

—বা রে, আমরা কি সর্বক্ষণ বাইরে ঘুরব নাকি? হোটেলে থাকব না? বুবলি ঘাড় বেঁকাল, সন্ধেবেলা হোটেলে বসে বসে করবটা কী? তারপর ধরো, ট্রেন তো যাবে টিকিটিকি। ওয়াকম্যান থাকলে ট্রেনে তাও বোর হব না।

কথাটা ভুল বলেনি বুবলি। চতুর্দিকে যা বন্যা হয়েছে এবার। দক্ষিণবঙ্গের ন-নটা জেলা একেবারে জলের তলায়। ট্রেন-ফেন বন্ধ হয়ে একাকার কাণ্ড। প্রথমটা তো সুখেন্দু ভেবেছিল এবার বুঝি আর বেরোনোই হল না। রোজ কোনও না কোনও ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ছে, একের পর এক জায়গা ডুবে যাচ্ছে, এখানে রেললাইন ভাঙছে, ওখানে ব্রিজ চুরমার... যাকে বলে অকহতব্য অবস্থা। উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন।

আস্তে আস্তে অনেকটা সামলেছে পরিস্থিতি। অন্তত ট্রেন-ফেনগুলো চলা শুরু করেছে। প্রথম ক'দিন ঘুরপথে শিলিগুড়ি যাচ্ছিল, সেই কিউল ভাগলপুর কহলগাঁও হয়ে। এখন অবশ্য ঠিক রুটেই যাচ্ছে। তবে সময় নিচ্ছে খানিকটা। কালও খবর নিয়েছে সুখেন্দু, কামরূপ এক্সপ্রেস সাত ঘন্টা লেট ছিল।

তা হোক, যাচ্ছে এই না কত। বেড়াতে বেরিয়ে অত ঘড়ি মেপে চলার প্রয়োজনটাই বা কী?

রান্নাঘরে গিয়ে চা চড়িয়ে এসেছে কস্তুরী। বুবলি পরোটা শেষ করে এখন খুব সস খাচ্ছে। বোতলটা সরিয়ে রাখতে রাখতে বলল, রাবংলায় আমাদের হোটেলটার লোকেশান ভালো তো?

—বলল তো। ...যারা এখান থেকে বুকিং নিচ্ছে তাদের কাছে হোটেলের একটা ছবি আছে। দেখে মনে হল পাহাড়ের এজে।

—ইশ, নর্থ ফেসিং হলে খুব ভালো হয়।

—ফায়ারপ্লেস আছে বাপি?

—আছে নিশ্চয়ই। পার ডে নশো টাকা স্যুটভাড়া নিচ্ছে কি এমনি এমনি?

পুজো প্যান্ডেলে ঢাক বেজে উঠল। আওয়াজটা শুনতে শুনতে মুখটা কেমন কুঁচকে গেল কস্তুরীর। বলল, এ মা, কী ক্যারকার করছে!

সুখেন্দুর চোখে রাবংলা দুলছিল। ছবিটা মুছতে মুছতে অন্যমনস্কভাবে বলল, টেপ রেকর্ডারে বাজাচ্ছে তো...

—সত্যি ওরা ঢাকি পেল না? নাকি পয়সা বাঁচাচ্ছে?

—কী করে বলব? শুনলাম তো কালও পাড়ার ছেলেগুলো শেয়ালদায় গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সুখেন্দু কাঁধ ঝাঁকাল, তবে হ্যাঁ, ঢাকির এ বছর খুব আকাল। বেশিরভাগই তো আসে মুর্শিদাবাদ নদিয়া থেকে, নয় বাঁকুড়া বীরভূম। সেখানে এখনও কত জায়গা যে জলের তলায়।

—বাপি, আমরা ট্রেনে যেতে যেতে ফ্লাড দেখতে পাব?

—কিছু কিছু তো পাবিই। সুখেন্দু হাসতে গিয়েও গম্ভীর হল, তবে ফ্লাড এমন কিছু দেখার জিনিস নয় বুবলি। এবার বন্যায় কত মানুষ অ্যাফেক্টেড হয়েছে জানো? দেড় কোটি। কত লোকের ঘরবাড়ি ভেসে গেছে, কত লোক মারা গেল, খাবার নেই, জল নেই, কী কষ্ট করে সব বেঁচে আছে...

এই সব গুরুগম্ভীর কথা শুনলে বুবলির একটু একটু হাই ওঠে। গা মোচড়াতে মোচড়াতে সুড়ুৎ করে সরে গেল। এবার সে প্যান্ডেলে বেরোবে এবং এখন তাকে সকালে পরার পোশাক চুজ করতে হবে, এও কম হ্যাপা নয়। কস্তুরীও চলে গেছে রান্নাঘরে, চা ঢালতে।

উঠে গিয়ে কাগজ কলম নিয়ে সোফায় বসল সুখেন্দু। কালই তাদের যাত্রা, টুকটাকি কিছু জিনিস কিনতে হবে, একটা লিস্ট বানিয়ে নেওয়া ভালো। পেস্ট, সাবান, তিন চার রকমের ওষুধ, একটা পেইন বাম, টর্চের ব্যাটারি...। ফিল্মের রোল কটা নেবে? দুটো, হ্যাঁ দুটো তো লাগবেই। এখান থেকেই কিনে নেওয়া ভালো, টুরিস্ট প্লেসে নির্ঘাত দেড়া দাম হাঁকবে। ব্র্যান্ডি সঙ্গে নেবে একটা? গ্যাংটক তেমন ঠান্ডা হবে না, কিন্তু ছাঙ্গু, রাবংলা...। ধুৎ সিকিমেই ওসব জিনিস ভালো মিলবে। আর কী? আর কী? মোমবাতি হাফ ডজন, মসকিউটো, কয়েল...

ভাবনার মাঝেই কলিংবেল।

এ বাড়িতে দরজা খোলা নিয়ে অলিখিত আলসেমির প্রতিযোগিতা

চলে। একটুক্ষণ অপেক্ষা করল সুখেন্দু, দ্বিতীয়বার বেল বাজতে বিরস মুখে গিয়ে দরজা খুলছে।

সঙ্গে সঙ্গে যেন হাজার ভোল্টের শক। সামনে এ কারা? রথীনকাকা আর কাকিমা! এ কী হাল হয়েছে দু'জনের? রথীনকাকার মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ি, চুল উশকো-খুশকো, পরনে খেঁটো ধুতি আর নোংরা বুশশার্ট। আটপৌরে করে পরা কাকিমার শাড়িটাও অসম্ভব নোংরা, ফরসা মুখে যেন কালি লেপে দিয়েছে কেউ। দু'জনেরই দৃষ্টি কেমন ঘোলাটে, গর্তে ঢুকে আছে চোখ। বড়ো বড়ো করে শ্বাস ফেলছেন রথীনকাকা। মাত্র দোতলা উঠেই জিভ বার করে হাঁপাচ্ছেন।

সুখেন্দু তুতলে গেল,— তো তো তো... তোমরা?

রথীন দু'পা এগিয়ে এসে খপ করে সুখেন্দুর হাত চেপে ধরলেন। ডুকরে উঠেছেন হঠাৎ,—আমাদের সর্বস্ব গেছে রে বাবলু। রাক্ষুসি ইছামতি আমাদের সব খেয়ে নিয়েছে। ভিখিরি ভিখিরি... আমরা এখন পথের ভিখিরি।

খুবই নাটুকে ডায়লগ, তবে এতক্ষণে ব্যাপারটা সুখেন্দুর বোধগম্য হল। বন্যা। আশ্চর্য, এ যেন রঙ্গমঞ্চে রথীনকাকাদের নাটুকে আবির্ভাব! এই মাত্র সে বন্যার্তদের কথা বলছিল, অমনি বন্যার্ত একেবারে তাদের দোরগোড়ায়!

অপ্রস্তুত মুখে সুখেন্দু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, —এ কী, তোমরা বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? এসো এসো, ভেতরে এসো।

সুষমার হাতে একটা চটের থলি। সেটিকে বুকে চেপে তিনি ঢুকলেন আগে, সসংকোচে। পিছু পিছু রথীন। দু'জনেই তাকাচ্ছেন ফ্যাল ফ্যাল। মুখে কোনও কথা নেই।

তাড়াতাড়ি তাঁদের হাত ধরে সোফায় এনে বসাল সুখেন্দু। নিজে উলটো দিকে বসে বলল, হ্যাঁ, বলো কী হয়েছে?

রথীন অস্ফুটে বললেন, একটু জল।

সুখেন্দু বেশ লজ্জা পেয়ে গেল। ছি ছি, এই কি প্রশ্ন করার সময়! অবশ্য জল তাকে আনতে হল না। কস্তুরী চায়ের কাপ প্লেট হাতে বিমূঢ় মুখে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, সে প্রায় ছুটে রান্নাঘর থেকে দু'গ্লাস জল এনেছে।

জলে চুমুক দিতে গিয়ে কেঁপে উঠলেন সুষমা। ঝরঝর কেঁদে ফেলেছেন,— আমরা তিনদিন কিছু খাইনি বউমা।

একটি মাত্র বাক্যে গোটা সকালটা যেন আমূল বদলে গেল। একটু আগের মনোরম উজ্জ্বল পরিবেশ পলকে উধাও। বুবলিও বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। তারও ন যযৌ না তস্থৌ অবস্থা। সেজেগুজেও নড়তে পারছে না। কস্তুরী তাকে চোখের ইশারা করল, মা মেয়ে দ্রুত চলে গেছে খাবার টেবিলে। ক্যাসারোলে পড়ে থাকা গোটা চারেক আলুপরোটা প্লেটে সাজিয়ে ধরে দিল রথীনদের। গোগ্রাসে খাচ্ছেন স্বামী-স্ত্রী, দুর্ভিক্ষপীড়িতের মতো। কস্তুরী চটপট খানিকটা মুড়িও মেখে আনল, সঙ্গে ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা দরবেশ। সুখেন্দুর সঙ্গে চোখ চাওয়াচাওয়ি করছে, আরও কিছু দেবে কিনা।

সুখেন্দুর ভীষণ খারাপ লাগছিল। রথীন তার আপন কাকা নন, তবে তেমন দূর সম্পর্কেরও তো নন। বাবার আপন জাড়তুতো ভাই। থাকেন দেশে, বাগদা থেকে মাইল খানেক দূরে, কমলপুরে। ওদিকে এখনও জল থই থই করছে, টিভিতে কাগজে রোজই এখন বনগাঁ বাগদা বসিরহাট লিড নিউজ, অথচ সেভাবে রথীনকাকাদের কথা মনে আসেনি কেন? হ্যাঁ, একদিন কস্তুরীর সঙ্গে কথায় কথায় বাগদার কথা উঠেছিল বটে, প্রসঙ্গক্রমে রথীনকাকার কথাও উঠেছিল। কিন্তু কেন যেন মনে হয়েছিল রথীনকাকারা তো মোটামুটি অবস্থাপন্ন লোক, নিজস্ব পাকা বাড়ি, বনগাঁ রোডের ওপর অত বড়ো স্টেশনারি দোকান আছে, জমিজমাও খুব কম নেই, সুতরাং তাঁরা হয়তো নিরাপদেই আছেন। কিন্তু প্রকৃতি যে ধনবানদেরও রেয়াত করে না, এ সহজ সত্যটা মাথায় আসেনি।

ক্ষুন্নিবৃত্তি হওয়ার পর মোটামুটি ধাতস্থ হয়েছেন স্বামী-স্ত্রী। একটু একটু করে তাঁদের মুখ থেকে শোনা গেল সব। কী ভয়ঙ্করভাবে কামান দাগতে দাগতে জনপদের ওপর আছড়ে পড়েছিল ইছামতি, কীভাবে হুড়মুড় করে জল বেড়ে গেল, স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছে মানুষ, চিৎকার কান্না হাহাকার....। রথীনকাকা প্রথমটা ভেবেছিলেন তাঁদের বাড়ি অনেকটা উঁচু, হয়তো বা এযাত্রা পার পেয়ে যাবেন। সতর্কবার্তা পেয়েও বাড়ি ছেড়ে নড়েননি, মালপত্র নিয়ে ছাদে গিয়ে বসে ছিলেন। কিন্তু দেখতে দেখতে তাঁর ছাদ অবধি....। শেষে উদ্ধার পার্টি এসে নৌকো করে স্কুলবাড়িতে নিয়ে যায় সকলকে। প্রাণ যায়নি ঠিকই, তবে সেখানে এক কণা খাবার জোটেনি। মাঝে একদিন চিড়েগুড় এসেছিল, তারপর আর....। দোতলার

একটা বারান্দার ধনী দরিদ্র, হিন্দু মুসলমান, নারী পুরুষ সব একত্রে ঘেঁষাঘেঁষি করে রয়েছে....।

চোখে মুছতে মুছতে রথীন বললেন,— এর মধ্যে লুঠপাটও চলছে, বুঝলি। একদিন মাঝরাত্তিরে নৌকো করে এক দল লোক এল, আমরা ভাবলাম রিলিফপার্টি, তারা ছুরি বন্দুক দেখিয়ে যার কাছ থেকে যা পারে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। তোর কাকিমার হাতের বালা চুড়ি, বউমার গলার হার, কানের দুল, এমনকী সোনা বাঁধানো নোয়াটাও।

সুখেন্দু জিজ্ঞেস করল,— ভোম্বল, ভোম্বলের বউ কোথায়?

—ওখানেই আছে। পড়ে আছে দাঁতে দাঁত কামড়ে।... ভোম্বলই তো আমাদের জোর করল। বলল যেমনভাবে পারো, যার কাছে হোক চলে যাও। বাড়ি দোকান ভেসে গেছে বটে, তবে জল নামলে তো দেখতে হবে কিছু বাঁচল কিনা। সামনে না থাকলে তো সব সাফ হয়ে যাবে।... স্কুলবাড়িতে যাওয়ার সময় যতটুকু পারি সঙ্গে নিয়েছিলাম, লুটপাট হয়ে যাওয়ার পরে যেটুকু পড়ে আছে ভোম্বল আর ভোম্বলের বউ সামলাচ্ছে।... আমরাও আর পারলাম না রে। রথীন ফুঁপিয়ে উঠলেন, মরিয়া হয়ে শেষে নৌকো করে, হেঁটে, আবার নৌকো করে... কীভাবে দমদম পৌঁছেছি এখন আর বলতে পারব না রে বাবলু।...

—চুপ করুন তো। কস্তুরী নরম গলায় বাধা দিল,— এখন জিরোন একটু। চানটান করুন ভালো করে। তারপর খেয়ে দেয়ে একটু ঘুমোলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

—বলছ বউমা?

—হ্যাঁ, উঠে পড়ুন। আপনারা বুবলির ঘরে চলে যান, আমি ততক্ষণে একটু চালে ডালে চড়িয়ে দিই। বলতে বলতে সুখেন্দুর দিকে ফিরল কস্তুরী, এই, তুমি বুবলির ঘরটা একটু ঠিকঠাক করে দাও না।

সুখেন্দু বুবলিকে ডাকল,— আয়, আমার সঙ্গে একটু হাত লাগা।

বুবলির প্যান্ডেলে যাওয়ার উৎসাহ কমে গেছে। ট্রেন থেকে বন্যা দেখার আগেই দু-দুটো জলজ্যান্ত বন্যার্ত একেবারে বাড়িতে হাজির, এতে যেন সে বেশ রোমাঞ্চিত। পটাপট নিজের জামাকাপড়গুলো সরিয়ে আনল বাবা মার ঘরে। নিজে থেকেই প্রায় অচেনা দাদু দিদার সঙ্গে কথা বলছে টুকটাক।

ঘর গোছাতে গোছাতে সুখেন্দুর মনটা কেমন যেন খচখচ করছিল।

কালকেই তাদের ট্রেনের টিকিট, আজই রথীনকাকারা....। এ মুহূর্তে তার কী করা উচিত? যেতে তো হবে কাল, কিন্তু এদের ফেলে কেমন করে যাবে?

চিন্তাটাকে মাথায় নিয়ে রান্নাঘরে এল সুখেন্দু। ফিসফিস করে বলল, কী গো, কী করব?

কস্তুরী আলু কুটছিল। ঘাড় না ঘুরিয়েই বলল, কীসের কী?

—এরা তো বড়ি ফেলে দিল। আমাদের যাওয়ার কী হবে?

—কপাল খারাপ। হবে না। কস্তুরীর যেন একটা ছোট্ট শ্বাস পড়ল, যাও টিকিটগুলো ক্যানসেল করে এসো।

আবছাভাবে রাবংলা দুলে গেল সুখেন্দুর চোখে। নীল নীল পাহাড়, সবুজ অরণ্য, রুপোলি জ্যোৎস্না...

অসহিষ্ণু মুখে বলল,—যাহ্, তা হয় নাকি?

—আর কী হয় তাহলে?

—সাফ সাফ বলে দিই কাল আমরা চলে যাচ্ছি।.... মিথ্যে তো নয়।

—বলা যায়?... দুটো মানুষ অমন বিপদে পড়ে এসেছে...

সুখেন্দু একটু চুপ থেকে বলল,— তাহলে এক কাজ করা যাক। ওরা নয় এখানে থাকুক, আমরা বেরিয়ে পড়ি। মাত্র তো সাতদিনের প্রোগ্রাম।

—তা হয় না।

—কেন হয় না শুনি?

—খারাপ দেখায়।

—খারাপ দেখানোর কী আছে? চাল ডাল আলু কিনে দিয়ে যাব, ফ্রিজ রইল, টিভি রইল.... ওদের অসুবিধেটা কী হবে শুনি?

—তবু হয় না। তবু খারাপ দেখায়। লোকে কী বলবে? বানভাসি কাকা-কাকিমা আশ্রয় নিতে এসেছিল, তাদের ফেলে রেখে আমরা....

আর কথা এগোল না, সুষমা এসেছেন দরজায়। স্নান সেরে ফেলেছেন। বুবলি একটা তাঁতের শাড়ি বার করে দিয়েছে, অনেকটা তাজা দেখাচ্ছে তাঁকে।

সঙ্কুচিত মুখে বললেন,— তোমার সঙ্গে একটু হাত লাগাব বউমা?

—না না, কিছু দরকার নেই। আপনি বিশ্রাম নিন।

তবু শুনলেন না সুষমা, রান্নাঘরে ঢুকেই পড়েছেন। সুখেন্দু সরে এল সেখান থেকে। শোওয়ার ঘরে গিয়ে চিৎপাত হয়ে সিগারেট ধরিয়েছে।

দুপুর পর্যন্ত কস্তুরীর সঙ্গে একান্তে কথা বলার আর সুযোগই হল না। পরিতৃপ্তি সহকারে আহার সারলেন রথীন। তার মধ্যে মাঝে মাঝে চোখ মুছছেন আর শোনাচ্ছেন ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা। এক মা নাকি বাচ্চা নিয়ে গাছের ওপর বসেছিল, সেই বাচ্চা পড়ে গেছে কোল থেকে, সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দিয়েছে মা, প্রবল তোড়ে দুজনেই নিশ্চিহ্ন! জলে নাকি কোথায় তক্তপোশ ভেসে যাচ্ছিল, সেখানে পড়ে ছিল এক বৃদ্ধের লাশ। প্রাণভয়ে মানুষের সঙ্গে একত্রে আশ্রয় নিয়েছে সাপ, কিন্তু কামড়াচ্ছে না....

বুবলির বোধহয় আর শুনতে ভালো লাগছিল না। হয়তো বা সহ্য হচ্ছিল না আর। টিভি চালিয়ে দিল বুবলি। আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে রথীন সুষমার চোখও পরদায়। পেট ভর্তি হয়ে গেলে বোধহয় বিনোদনের নেশা অজান্তেই মাথাচাড়া দেয়। তবে শরীরে আর দিচ্ছে না দু'জনেরই, দু-চার মিনিটের মধ্যেই ঢুলতে শুরু করেছেন স্বামী-স্ত্রী।

কস্তুরীকে ব্যালকনিতে ডেকে আনল সুখেন্দু। গোমড়া মুখে বলল, কী হল, কী ঠিক করলে?

—তুমি এখনও ওই কথা ভাবছ? ডিসিশান তো হয়ে গেছে।

—না মানে.... ওদের অন্য কোথাও চালান করে দিলে হয় না? ধরো, দিদির বাড়িতে যদি পাঠিয়ে দিই? ফোন করব একবার দিদিকে?

—তোমার কি ঘটে একটুও বুদ্ধি নেই? দিদির শ্বশুরবাড়িতে জ্ঞাতিকাকাকে পাচার করে বেড়াতে চলে যাবে? তারা কী ভাববে?

—আমাদের কাছে এসেছে বলে আমরা কি চোরের দায়ে ধরা পড়ে গেলাম? সুখেন্দুর স্বর তেতো হয়ে গেল, আরও তো অনেকে ছিল। নাকতলায় পল্টু আছে, ব্যারাকপুরে নাড়ুদের অত বড়ো বাড়ি..... সবারই তো সম্পর্কে কাকা।

—কী করা যাবে, এখানেই যখন এসে পড়েছে। কস্তুরী এবার একটা বড়ো শ্বাস ফেলল, —এ বছরটা নয় রুটিন বেড়ানোয় ছেদই পড়ল।

ভারী করুণ চোখে একটুক্ষণ স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সুখেন্দু, তারপর প্যান্টশার্ট চড়িয়ে বেরিয়েই পড়েছে। সোজা কয়লাঘাটে গিয়ে ক্যানসেল করল টিকিটগুলো। উদাস মুখে গঙ্গার ধারে পায়চারি করল খানিকক্ষণ। ভাল্লাগছে না। কিছু ভাল্লাগছে না। ভরাগঙ্গায় টলটল করছে

জল, ক্রুর চোখে নদীকে দেখছে বার বার। কী করবে এখন? বাড়ি ফিরবে? ধুস!

পুরোনো পাড়ায় আড্ডা মেরে প্রায় রাত বারোটায় বাড়ি ফিরল সুখেন্দু। কলকাতায় আজ এক অন্য বন্যা হানা দিয়েছে। মানুষের বন্যা। দশ হাত অন্তর অন্তর পুজো, হই চই, গান রোশনাই। কে বলবে এই শহর থেকে অল্প দূরেই থই থই করছে জল। রাস্তায় কী জ্যাম, বাপ্স!

কস্তুরী দরজা খুলেছে,—কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

—এমনি ঘুরছিলাম।.... বুবলি এসেছে?

—ঘুমোচ্ছে।

—ওরা?

—ওঁরা তো শুয়েই আছেন। মাঝে এক দু'ঘন্টার জন্য জেগেছিলেন, খেয়ে দেয়েই আবার...। কস্তুরী ছোট্ট হাই তুলল, তুমি খাবে তো?

—হুঁ।

টুকরো টুকরো সংলাপ? না টুকরো টুকরো হতাশা?

পোশাক পালটে বাথরুমে ঢুকল সুখেন্দু। মুখে চোখে জল ছেটালো ভালো করে। বেরিয়ে খাবার টেবিলের দিকেই আসছিল, হঠাৎই চোখ গেছে বুবলির ঘরে।

কী ভেবে পায়ে পায়ে এল ঘরটায়। নীল রাতবাতি জ্বলছে। পাখা ঘুরছে মাঝারি স্পিডে। পাশবালিশ আঁকড়ে ঘুমোচ্ছেন রথীন সুষমা।

সুখেন্দু স্থির দাঁড়িয়ে। দেখছিল দুই আশ্রিতকে। কী নিশ্চিন্ত নিঃশঙ্ক ঘুম। রথীনকাকার নাক ডাকছে ফরর ফরর। কাকিমা একটু কুঁকড়ে মুকড়ে আছেন। এখন আর কারুর মুখে আতঙ্কের ছায়াও নেই। সেখানে এখন নীলাভ জ্যোৎস্না।

খেতে দিয়ে ডাকতে এসেছে কস্তুরী,—কী দেখছ হাঁ করে?

সুখেন্দু বুক ভরে শ্বাস টানল। ছাড়ছে আস্তে আস্তে। মৃদু গলায় বলল, —রাবণ্ডলা।



মানুষ যেমন



জনমঅন্ধ ছেলেটা একই জায়গায় বসে থাকে দিনভর। ওই যে ভাঙাচোরা প্ল্যাটফর্মখানা, তার গায়ে ওই যে গরিবমতন স্টেশনচাতাল, তার কোলে ওই যে কংকালসার গোটা তিনেক সিঁড়ি, তারই একেবারে শেষ ধাপিতে কোনাটুকুন জায়গা নিয়ে বসে থাকে হাঁটু মুড়ে। হাড়লিকলিক হ্যাংলাপানা চেহারা, গায়ের রং সবজে বরন, একমাথা রুখাশুখা চুল। জন্মকালে নাম ছিল বারীন না হারীন কি যেন একটা। তা সে নামে এখন নিজের ঠাকুমাও ডাকে না তাকে। নামটা ভারী অপয়া যে। নাম দেওয়ার পরপরই হঠাৎ একদিন আলটপকা জ্বরে মরে গেল ছেলের বাপটা। তারপর ক'টা বছর না যেতে, সেই যখন সবে বুলি ফুটছে তার ঠোঁটে, তখন একদিন দুম করে পালাল তার মা'টাও। দালালপুর হাটের এক কাপড় ব্যাপারীর সঙ্গে। সেই থেকে বুড়ি ঠাকুমাই অন্ধের যষ্টি হয়ে আছে। আর আছে রেবতী বৈরাগী। যার কাছে মনপ্রাণের সব কথা উজাড় করে দেয় বালক। অন্ধকার চোখ অন্ধকারে ভাসিয়ে রোজ একবার সাঁঝবেলায় প্রশ্ন করে, —আজ তার দেখা পেলে গো? ও ঠাকুর?

রেবতী বৈরাগী তখন হয়তো সবে এসে বসেছে তাদের দাওয়ায়। প্রশ্ন শুনে রোজ একবার তার ডানামেলা চোখদুটো দুঃখব্যথায় ঝটফট করে ওঠে। ছেলেটাকে মিথ্যে বলতে প্রাণ চায় না। আবার সত্যি বলতেও হৃদয় কাঁদে। ভাঙা স্বরে উত্তর দেয়,—পেলাম গো বটে।

—কী দেখলে?

—আজ দেখি সে পদ্ম হয়ে ফুটে আছে। হরিণদিঘির জলে।

কোনোদিন বলে,—গাঙের জলে ঢেউ হয়ে দুলছিল আজ। যেই না জোয়ার এল...

—আমার কথা বললে তাকে?

—বলিনি আবার। দেখা হতেই বললাম, ছেলে তোমার পথ চেয়ে আছে গো বউঠান। একবার গিয়ে দেখে এসো তাকে। বললে, যাব গো যাব। তাকে ছেড়ে থাকতে আমারও কি মন কাঁদে না!

—বললে এ কথা! অন্ধ ছেলের চোখদুটো টিপটিপ করে ওঠে। ছাইবরন দুই মণি ওড়াউড়ি করে খাঁচাবন্দি পাখির মতো,—কবে যে আসবে!

—আসবে। আসবে। না এসে যাবে কোথায়। মায়ার কাঁদে পৃথিবীটাই ধরা পড়ে আছে যে। রেবতী বৈরাগী ছেলেটার মাথায় হাত রেখে কথা ঘোরাতে চায়,—এসো, আজ নতুন গান শেখাই তোমাকে।

ছেলেটার চোখ তবু ছটফট করে মরে। ঘরবিবাগী বৈরাগীরও চোখ জ্বালা করে তাই দেখে। এমন একটা ছেলে ফেলে কী করে যে পালায় মানুষ! ভাবতে ভাবতে ধরা গলায় গান ধরে,

—ও সুখ কোথায় উড়ে যাস,
নিজের বুকে খোঁজ করে দ্যাখ....

হেঁশেল থেকে ছেলের ঠাকুমা ডাকে,—ও শতদল... শতুরে, ভাত বেড়েছি। খাবি আয়।

হ্যাঁ গো হ্যাঁ। বারীন নয়, সুরেন নয়, ছেলের এখন নাম হয়েছে শতদল। বৈরাগী ঠাকুরই নতুন করে রেখেছে সে নাম। শতদল থেকে শত, শতু।

তা ছেলেটা শতদলের মতোই ফুটে থাকে বটে। সারাটা দিন। অমন একটা ভাঙাফাটা ইটবালির জমিনটাতেও। বসে থাকে একভাবে। কানের কাছে যখন তখন ভ্যানরিক্শা ভেঁপু বাজায়, মানুষজন কিচমিচ করে, হঠাৎ হঠাৎ কান ফাটিয়ে ডাক ছাড়ে আপ ডাউনের ট্রেনগাড়িগুলো। স্টেশনের ভেতর থেকে।

ভাঙা সিঁড়ির একটু তফাতে, এক ফালি মেঠো ভূমিতে দাঁড়িয়ে এক বৃদ্ধ পিপুল। শাখাপ্রশাখা তার এই যদি ছায়া পাঠাল, তো এই ঝনঝন রোদ। অন্ধ বালক সেই রোদ-ছায়াতেই বসে থাকে একলা মনে। বসে থাকে আর সুরের মনে সুর ভাসায় ধুলো বাতাসে। আহা, কী ভাব সে সব গানে! যেমন তার

কলি, তেমনি হৃদয়ের তারছেঁড়া সুর। অংশুপতি কুণ্ডুর মতো ঘোর বিষয়ী মানুষটারও বুক কেঁপে ওঠে মাঝে মাঝে। বুকের দোলায় গোটা অঙ্গ দুলতে থাকে। তালপাতার পাখা থেমে যায় হাতের মুঠিতে। দাঁড়িপাল্লার আড়াল থেকে কখনও-বা হাঁক দিয়ে ওঠে,

—আরেকবার ধর দিকিনি সুরটা। ওরে ও শতদল...

অন্ধ ছেলে থমকায় দু-এক পলক। পোঁটলায় বাঁধা পান্তার বাটিখানা হয়তো-বা খুলতে গিয়েও সরিয়ে রাখে পাশে,—কোন্ গানটার কথা বলছ গো জ্যাঠা?

—আরে এই তো গাইলি একটু আগে।

—ও। থমকানো মুখে হাসি ফোটে ধীরে ধীরে। ফুল ফোটার মতো। সরু গলার লম্বা শিরাদুটো নেচে ওঠে সেই সঙ্গে,

—বুকের গাঙে আআসছে তুফান,
ও মন নৌকো বাঁধবি চল....

আহা হা হা। রেবন্তী বৈরাগী এক একখানা গানও বাঁধে বটে। ও মন নৌকো বাঁধবি চল। অংশুপতি মাথা দোলায়। ছন্নছাড়া বৈরাগীটা নিজেই যেন এক সুরের আকর। নিজের তালে গান বাঁধে, নিজেই সুর বোনে তাতে। তারপর সে গান যত্ন করে বিছিয়ে দেয় কানা ছেলের কণ্ঠে। অংশুপতির বুকের মাঝখানটা কেমন গুড়গুড় করতে থাকে। কোনোদিন পাল্লায় মাল তুলে বাটখারা দিতে ভুলে যায়, বাটখারা চাপায় তো মালের কথা মনে থাকে না। খদ্দের তাগাদা দেয়,

—কি হল কুণ্ডুর পো, মাল মাপো।

অংশুপতি সম্বিতে ফেরে ঝটপট। খদ্দেরের হাতে মাল দেবার সময় সে তিনবার করে পয়সা গুনে নেয়। ভাবের ঝোঁকেও বিষয়বুদ্ধি হারায় না কখনও। খদ্দেরের শিশি থেকে গড়িয়ে আসা তেলটুকুও কাঁচিয়ে তোলে নিজের তেলের টিনে। বাইরে সাইনবোর্ডে খড়িমাটি দিয়ে লিখে রেখেছে, —আজ নগদ, কাল ধার।

তা এ হেন অংশুপতিকে কাজ ভোলায় আরেকজনও। সে হল গিয়ে রাজকুমারী। উঁহু, রাজার কন্যে নয়, একেবারেই আধবুড়ি, আধপাগলি মেয়েমানুষ একটা। থাকে নাকি সেই গঞ্জের বাজারের পিছনদিকে। দু'হাত সমান এক হোগলার চালার নিচে। একসময় নাকি বাঁধা ঘর ছিল তার মহকুমা শহরে। নিত্যদিন খদ্দের আসত সেখানে। বড় বড় চাঁই সব। দারোগা, মহাজন, আড়তদার। সন্ধে নামলেই ঘরের বাতি জ্বালিয়ে, সেজেগুজে শুধু বসে থাকো রানির মতো, আর রাত পোহালে পয়সা গুনে বাক্সে তোলো। সে সব ভরা বাক্সগুলো কী করে যে শূন্য হয়ে গেল একে একে! রোগেই গেল সে সব? নাকি ভোগে? না। রাজকুমারী অতশত ভাবতে পারে না আজকাল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মাথাটাও তার বুড়িয়ে গেছে একেবারে। হ্যাঁ। রোগে একটা তাকে ধরেছিল বটে। কবে যেন ধরেছিল? কত যুগ আগে? কে জানে! তখন থেকেই বুঝি মানুষ আসা বন্ধ হয়েছে তার ঘরে। কোন্ মানুষটাই-বা অমন কালরোগ দিয়ে গেল শরীরে? মাছের বাজারের আড়তদার? নাকি গাঙপারের সেই ফরসাপানা মহাজন? নাকি গঞ্জের বাজারের সবজিওলাগুলো? নাকি আর কেউ? রাজকুমারী জানে না সে সব। দুনিয়ার মানুষের মুখ কবে থেকে সব এক রকম হয়ে গেছে তার কাছে। শুধু একটা মুখ ছাড়া। তাও কেমন ঝাপসামতন। সেই যে, যার নাম ছিল অষ্ট। অষ্ট? না বিষ্টু? নাহ্, তার নামটাও আর ঠিক ঠিক মনে নেই রাজকুমারীর। মনে আছে একটা শুধু মুখের আদল। লম্বাপানা। বড় বড় চোখ। মহকুমার গলিটাতে এক বুড়ি মেয়েমানুষের কাছে রেখে দিয়ে মুখটা তাকে বলেছিল,—ভয় নেই রে কুসমি। মাসির কাছে টুকুনখানিক থাক। আমি এই গেছি আর এসছি।

নাম তার মনে নেই, মুখ আবছা, শেষ কথাকটাই শুধু স্পষ্ট আজও আধাপাগল মেয়েমানুষটার কাছে। কথাকটা মনে পড়লেই বুক কেমন হু হু করতে থাকে। এতদিন পরেও। গলগলিয়ে কান্না আসে কুসমির। থুড়ি। কুসমি না, রাজকুমারীর। কান্না ক্রমে গান হয়ে যায় গলায়। মেয়েমানুষটা তখন কাঠির মতো শরীর দুলিয়ে নিজেকেই যেন ভেংচায়,

—নাগর আমার কাঁচা পিরীত
পাকতে দিল না,
সে আসবে বলে কথা দিয়েও
কেন এল না........

অংশুপতি কুণ্ডু অবশ্য এত বৃত্তান্ত জানে না কিছুই। যেমন জানে না চায়ের দোকানি হারু পাত্র কিম্বা ভ্যানরিকশাওলা বংশী বিশুর দল। মেয়েছেলেটাকে নিয়ে বিনি পয়সায় মজা লোটে তারা সকলেই। যখন

তখন, যেমন খুশি কোনো একটা স্টেশনে নেমে পড়ে রাজকুমারী। নামলেই হল আর কি! এত্তটুকুন হাকুচ কালো ক্ষয়াটে শরীর। খসখসে খড়িওঠা গায়ের চামড়া। মাথার চুল সন্নিসীদের জটার মতো। তাতে আবার পুরোনো এক টুকরো লাল ফিতের ফুল। কবেকার এক রঙজ্বলা ডেকরন শাড়ি কুঁচি দিয়ে পরা। তোবড়ানো গালে লাল রং। ঠোঁট রাঙায় তেলাকুচোর ফল দিয়ে। কোটরবসা চোখে ধ্যাবড়া করে কাজল টানে। কাজল টানে? নাকি চোখ দুটো ওমনিই মসী লেপা? অবশ্য ওইটুকুনি না সাজলে লোকে দু'দণ্ড তাকাবে কেন তার দিকে? না সাজলে নাচ জমবে কীভাবে? না নাচলে পয়সা নেই। পয়সা না পেলে...। ভাবতে গেলেই পেটের নাড়িগুলো খিদেতে দাপাদাপি করতে থাকে রাজকুমারীর। হুটপাট বেরিয়ে পড়ে ধুলোকাদামাখা ঝুপড়ি থেকে। তারপর এখান থেকে সেখান। এ স্টেশন থেকে ও স্টেশন। পেটে যেদিন দানাপানি পড়ল দুটো, তো সেদিন সেই মুখটাকেই খুঁজে মরে ঘোলাটে চোখে। আজও। এতকাল পরেও। অভ্যেস।

লোকে শুধোয়,—কী দেখিস রে মুখের দিকে আমার? ফ্যালফ্যাল করে?

বুড়ো ভেড়ার মতো হলদেটে চোখের মণিদুটো তখন চিকচিক করতে থাকে,

—তোরেই খুঁজি নাগর আমার,
জেবন গেল তোরেই খুঁজে....

বলেই নাচতে শুরু করে। ডানহাতে কাপড়টাকে ঘাগরার মতো ফুলিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচে।

তবে তেমনভাবে আর নাচতে পারে কটা দিনই বা! উপোসী পেটে নাচ জমে না যে! নাচতে গেলে হাঁপিয়ে পড়ে। কালোকুলো শরীরটা হাঁপায় তখন হাপরের মতো। খিদেতে চোখ ঝিম মেরে আসে।

—এবার একটা ডবলরুটি দাও। দাও নাগো।

অংশুপতি হ্যা হ্যা হাসে তাই দেখে,—দেব। দেব। তার আগে আরেকখানা নাচ দেখা। সেই যে রে সেই নাচটা....

হারু চ্যাঁচায় চায়ের দোকান থেকে,—রুটি কি মাগনা আসে, অ্যাঁ? নাচ হোক। চা'ও দেব তাহলে।

বংশী দূর থেকে সিটি বাজায়,—নাচ মেরি জান, ফটাফট...

নিত্য অংশুপতিকে চোখ টেপে,—মাগির সাজের বাহার কেমন দিনকে দিন খুলছে দেখেছ অংশুদা? কপালে আবার কাচপোকা টিপ সেঁটেছে।

—মানায় নি? বলো নাগো। রাজকুমারী কোমরখানা বেঁকাতে গিয়েও পারে না। মাজা খচখচ করে ওঠে। দিনভর কোথার থেকে যে কোথায় হেঁটে মরতে হয়। হাঁটাই সার। আজকালকার মানুষজন বড় সেয়ানা। দুদণ্ড দাঁড়িয়ে নাচ দেখে বটে অনেকেই, তারপর পেছন ঘুরে টিপ্পনী কেটে চলে যায় যে যার মতো। হাত উলটে আধলাটাও দিতে চায় না ঝট করে।

অংশুপতি কুণ্ডুই শুধু দিয়ে ফেলে মাঝে মাঝে। নাচ দেখে মনটা খুশি হলেই দরাজ গলায় দোকানের ছোকরাটাকে বলে,

—দে। দিয়ে দে কোয়ার্টার একখানা।

—সঙ্গে তবে ভেলিগুড় দাও টুকুনখানিক। রাজকুমারী আঁকা ভুরু এদিক ওদিক ওড়াবার চেষ্টা করে। ঠিক ঠিক আর ওড়ে না। কেমন ভাঁজ পড়ে। রংমাখা গাল তুবড়ে মুবড়ে ঢুকে যায় মুখগহ্বরে।

এসব দেখেই অংশুপতির রসেবশে দিন কাটে। কারবারের ফাঁকে ফাঁকে মাপমতো রস টেনে নেয় বুকে। রস নিয়ে খেলা করে। আর মাঝে মাঝে দোকানের ছেলেটাকে ধমকে ওঠে,—ঠিকভাবে মাপ। ঠিকভাবে মাপ। আহ্ অতখানি চিনি ফেলে দিলি!

সকাল গড়িয়ে দুপুর আসে। দুপুর গেলে বিকেল। তখনও হয়তো বসে বসে গান গেয়ে চলেছে অন্ধ শতদল। ঠাকুমাবুড়িটা তাকে নিতে আসে তারও পরে। একেবারে সেই সাঁঝের মুখে। ঘরের মানুষ ঘরে ফেরে যখন। স্টেশনবাতিরা টিপটিপ জ্বলে ওঠে। স্টেশনের ওপারে সন্ধ্যাবাজার বসে। লাইন পারের চোলাইখানায় আসর জমতে শুরু করে।

ঠাকুমাবুড়ি এসে নাতি তোলার আগে পয়সা তোলে। পাঁচ পয়সা, দশ পয়সা, বিশ, পঁচিশ। কোনোদিন পাঁচ ছ টাকা অব্দি পৌঁছে যায়। তবে তা কোনো কোনো দিনই। যেসব দিনে হাট বসে দালালপুরে, বড় বড় ব্যাপারী আসে, সে সব দিনে। বাকি দিন দুই, আড়াই, তিনি, মেরে কেটে চার। গুনে গুনে পয়সা তুলে বুড়ি আঁচলে বাঁধে। সেই আঁচলে ঘাম মুছে নেয় নাতির মুখের। সোহাগমাখা গলায় বলে,

—ও দাদু, পান্তাটুকুন সব খেয়েছিলি তো?

জিজ্ঞেস করার কারণও আছে। অংশুপতির মুখে শুনেছে নাতি নাকি প্রায়ই তার পাত্তার ভাগ দেয় আধবুড়ি বেবুশ্যেটাকে। মাসি-বোনপো হয়েছে নাকি দুজনে। ঘুরে ফিরে তাই রোজই এক জেরা।

শান্ত নাতি ঘাড় নাড়ে। ডবকা মতন টিফিন বাটিটা হাতড়ে হাতড়ে তুলে নেয় বগলের কাছে। হলুদ ছোপ দাঁতে হাসি ফোটে,

—কাল আমাকে বাদামনাড়ু কিনে দিবি দুটো?

—কেন?

—রাজকুমারী মাসিকে দোব।

—খবরদার। বুড়ি ঝনঝনিয়ে ওঠে,—তোকে না বারণ করিচি তার সঙ্গে কথা বলতে?

নাতি তবু বলে,—মাসি বড় ভালো গায় রে ঠাক্‌মা। হ্যাঁরে।

—গাক গিয়ে। আর মা মাসি পাতাতে হবে নি। অনেক মা মাসি তো দেখলাম।

ছেলেটা তখন চুপ মেরে যায়। মুখখানা থমথম করে।

ঠাকুমাবুড়ি আদর করে কাছে টানে তখন,—চল, তোকে কাঠি আশকি কিনে দোব চল।

কোনোদিন বলে,—তোর জন্য কেমন কুচো চিংড়ির ঝোল বেঁদে রেকেচি দেখবি চল। আর গরম গরম ভাত।

ঠাকুমার কাঁধে হাত রেখে নাতি উঠে পড়ে একসময়। পা ঘসে ঘসে এগোয় মেঠো পথ ধরে। যতদূর চোখ যায়, দু-ধারে শুধু ধানভূমি আর খোলা আকাশ আর ছড়িয়ে থাকা গাছগাছালি। সে সব পেরিয়ে মাইল দেড়েক হাঁটলে তবে দুধকুমড়ো গাঁ। গাঁয়ের পুব কোনে বুড়ির ছোটখাটো ভিটে। রেবতী বৈরাগীর চালা তার কিছুটা আগে। গাঁয়ের একটু বাইরে। একেবারে ফাঁকা ধানবাদার মধ্যিখানে। যেতে যেতে ঠাকুমা নাতি ক্ষণিক দাঁড়াবে বৈরাগীর দুয়োরধারে। দাঁড়াবেই।

—ও বোরেগীঠাকুর, ঘরে ফিরেছ নাকি?

বৈরাগী এক ছুটে দালান ধারে এসে দাঁড়াবে সেসময়,

—এসেছি ভাই শতদল। এই তো এলাম।

—কদ্দূর গিয়েছিলে গো আজ?

—সে অনেক দূর। নদী পেরিয়ে, নৌকো বেয়ে সোনাবাঁধ। সেখান থেকে গাজির গা, ইচ্ছেপুর...

বুড়ি হিসেবি প্রশ্ন তুলবে,—কত মিলল?

—এই মিলল। প্রাণপাখিটার পেট ভরাতে যতটুকুন খুঁদ লাগে আর কি।

বুড়ি সাবধানে চারদিক দেখে নেবে তখন। না, ধারে কাছে কেউ তেমন নেই। ভাঙা ঘরের চাল উড়িয়ে উদোম বাতাস ঘুরছে শুধু। সেই বাতাসে স্বর মিলিয়ে প্রায়দিনই ফিসফিস করে উঠবে বুড়ির গলা,—শতু আজ মোটে দু'টাকা রোজগার করেছে গো ঠাকুর। দুমুঠ চাল যদি ধার দাও....

বৈরাগী নির্মল হাসবে তখন। তার চাল বিনা বুড়ির যেন জল ফোটে না। হাসতে হাসতে বলবে,—ঘরে যাও গো মাসি। আমি আসছি।

শতদল এত কথা শুনেও শোনে না যেন। বৈরাগীকে দেখলেই মন তার ডানা ঝাপটাতে শুরু করে দেয়। আজও কি তার মাকে দেখতে পেয়েছে ঠাকুর? কী হয়েছিল আজ মা? সোনাবাঁধের মাছরাঙা? না গাজিপুরের রোদ্দুর? ভাবতে ভাবতে আঁধার নামা আকাশে পাঠিয়ে দেবে জ্যোতিহীন চোখদুটোকে। তারারা তখনও সব ফুটেছে, কি ফোটে নি। ঝিম ঝিম বাতাস দুলছে নিম সজনের ডালে। পৃথিবীর চোখে ঘুম নামছে। সেই তন্দ্রা তন্দ্রা ভাবটুকু ছিঁড়ে তখনই হয়তো হঠাৎ উড়ে যাবে কোনও একলা পাখি। ঘরে ফিরতে দেরি হয়ে গেছে যার। পাখিটাকে শতদল দেখতে পাবে না। শুধু শুনবে তার ডানার শব্দ। শব্দটুকু বুকে নিয়ে ঘরে ফিরবে চুপচাপ। বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে নিঝুম বসে থাকবে। অপেক্ষা করবে আরেকটা শব্দের। বৈরাগী ঠাকুরের পায়ের শব্দ।

তারও পরে, রাত আরও গভীর হলে, অংশুপতি কুণ্ডু ঘরে ফেরার পথে রোজ একবার শুনতে পাবে দুই গায়কের গলা। গায়ক নয়, দুই ভাবের ভাবুক ভাবের রসে মজে আছে। যেদিন অংশুপতি লাইনের ধার থেকে দু এক পাত্র চড়িয়ে আসে গলায়, সেদিন একবার করে দাঁড়ায় শতদলের ঘরের সামনে। মাতাল গলায় সুর আনতে চেষ্টা করে। পারে না। রাত গড়িয়ে চলে।

দিন তো আসে রোজই। নিয়ম করে। রোজই চলে যায়। তবু তার মধ্যেও এক একটা দিন কেমন অন্যরকম হয়ে যায়। আচমকাই। আচমকা

আশ্চর্য কোনো ঘটনা ঘটে যায় এক একদিন। যেমন আজই হল। কাজ ভুলে অংশুপতি হতবাক চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। কথা ফুটল তারও অনেক পরে,

—তুমি নয়ন বউঠান না!

—চিনতে পেরেছ তাহলে? নয়নতারা আলগাভাবে ঘোমটা সরাল কপাল থেকে। একমাথা মেটে সিঁদুরে জ্বলজ্বল করছে সিঁথি। টকটকে লাল এতখানি চাকতি টিপ কপালে। প্রথমটা চিনে উঠতে অসুবিধে হয় বইকী। কী ছিল কী হয়েছে এই ক'বছরে। ক'বছর যেন? চার? না ছয়? সেই রোগাভোগা চেহারাই আর নেই নয়নতারার। ভরাট স্বাস্থ্যে টসটস করছে শরীর। গায়ের রঙ ফরসা আগের চেয়ে। দেখলেই বোঝা যায় দিব্যি সচ্ছলতায় আছে। থাকবে নাই-বা কেন? নতুন সোয়ামি দোকান দিয়েছে মহকুমা শহরে। হাটে ঘাটে আর ঘুরে বেড়ায় না। শাড়ি ধুতির সঙ্গে জামাপ্যান্টের কাপড়ও নাকি রাখছে আজকাল দোকানে। এত খবর অংশুপতি পায় গঞ্জের নটবর হাজরার কাছ থেকে। নিজের দোকানের মাল তুলতে গিয়ে। তার কাছেই শোনা নয়নতারা নাকি আরও দুটো ছেলের মা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। তারা কেউই কানা খোঁড়া নয়।

কথাটা মনে পড়তেই অংশুপতি আড়চোখে একবার দেখে নিল সিঁড়িতে বসা দুঃখী ছেলেটাকে। দড়িবাঁধা সস্তা দামের একটা প্যান্টুলুন মাত্র পরনে। খোলা গায়ে প্রকট বুকের খাঁচা। তেলবিহীন চুল রুক্ষ, কাঙাল। অংশুপতির দুই ভুরু জড়ো হল,

—এতদিন পর এদিকে কী মনে করে?

কেউ যেন শুনতে না পায় এমনভাবে ফিসফিস করল নয়নতারা,

—ওদিকে পানে আসো তো বলি।

ভরাবেলায় দোকানে এখন খদ্দের গজগজ। এ যদি চাল চাইছে তো ও চাইছে কেরোসিন। দোকান ছেড়ে ওঠা মুশকিল। অংশুপতি তবু ঝপ করে না বলতে পারল না। কৌতূহল হামা টানছে মাথায়। নীচু স্বরে বলল,—ঠিক আছে। বোসো একটু।

ডাউনে গাড়ি ঢুকেছে স্টেশনে। ভোঁ বাজিয়ে ছেড়েও গেল। নয়নতারা সরে দাঁড়াল একধারে। চওড়াপেড়ে তাঁতশাড়িতে আরও ভালো করে ঢেকে নিল মুখ, যেন কেউ চিনে না ফেলে। ভিড় একটু কমতে মেঠো পথের দিকে গেল দু'চার পা। কী ভেবে ফিরল আবার। স্থির হয়ে কয়েক পল দেখল অভাগা ছেলেটাকে। এগোতে গিয়েও এগোল না। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে অস্থির চোখে অংশুপতিকে দেখছে।

অংশুপতিও আরেঠারে দেখে নিচ্ছে মেয়েমানুষটাকে। কী মতলবে এসেছে এখানে? এতদিন পর? ট্রেন থেকে নেমে ছেলের সঙ্গেই কথা বলছিল প্রথমে। কী বলেছে কে জানে! ছেলেটা গান টান থামিয়ে বসে আছে তখন থেকেই। শূন্য চোখে কী যেন ভাবছে। অন্ধ চোখে মনের ভাষাও ছাই ফোটে না। অংশুপতি ক্রমে অধৈর্য হল। নয়নতারা ফের যাচ্ছে ছেলের দিকে। অংশুপতি এক লাফে নেমে এল দোকান থেকে। একেবারে নয়নতারার পথ আগলে দাঁড়িয়েছে,

—কী বলতে চাও চটপট বলে ফ্যালো।

আশপাশের লোকজনের কৌতূহলী দৃষ্টি দুজনের দিকে। তবে নয়নতারাকে দেখলে ঝপ করে চিনতে পারবে না কেউ। দুধকুমড়োর মানুষও এদিকে এখন নেই বিশেষ। তবু নয়নতারা ঘোমটা সরাল না একটুও। কালামুখ দেখাতে বুঝি লজ্জা পাচ্ছে। কাপড়ের ফাঁক দিয়ে মৃদু গলায় বলল,—ছেলেটাকে নিয়ে যেতে এসেছি ঠাকুরপো।

দুধকুমড়োর অংশুপতি চকিতে গোটা গাঁয়ের মাতব্বর বনে গেল যেন। কড়া গলায় জেরা শুরু করল,—কেন?

—বারে, নিজের ছেলেকে নিজে নিয়ে যাব...

—না। অংশুপতির গলা কঠিন হল আরও,—কিসের ছেলে তোমার? কে ছেলে? ফেলে পালানোর সময় মনে ছিল না?

নয়নতারা মাথা নামাল।

—দ্যাখো বাপু, এতদিন পর তোমার এখানে আসা ঠিক হয়নি। তোমার শাশুড়ি জানলে পরে.... বলেই খেয়াল হল আরে, নয়নতারা তো বিয়ে করেছে ফের। আগের শ্বশুরঘর ত্যাগ করে। বিধবা কপালে সিঁদুর এঁকে....কথাটাকে গপ করে গিলে নিল অংশুপতি,—মানে তোমার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক নেই তার, বুঝলে। কেউ না দেখুক, আমরা তো দেখেছি অন্ধ ছেলেটাকে কী কষ্টেই না মানুষ করছে বুড়িটা। কত দুঃখে, শোকে তাপে...

সহসা নয়নতারা কেঁদে উঠল ফোঁচ ফোঁচ করে। কাঁদতে কাঁদতে অংশুপতির পায়ের গোড়ায় পড়ে যায় আর কি!

অংশুপতি সামান্য নরম হল,—ফোঁপানোর কী আছে? যাও না ছেলেকে গিয়ে বলে দ্যাখো.... সে যদি নিজে থেকে যেতে চায়....

—তুমি একটু তাকে বলে দাও তবে। নয়নতারা নাক টানল,—বলে দাও যে আমিই তার মা।

—আমি কেন? তুমি তাকে বলোনি?

—বলেছিলাম। ঘোমটা দিয়ে চোখ মুছল নয়নতারা,—কতবার করে বললাম। সে মোটে বিশ্বাসই করতে চায় না। বলে মা নাকি তার পাখি হয়ে বাসা বেঁধে আছে ইচ্ছেপুরের কোন্ শিমুল ডালে। বলতে বলতে আবার ঝুঁকেছে,—তোমার পায়ে পড়ি ঠাকুরপো, তুমি বললে সে বিশ্বাস করবে।

অংশুপতি কয়েক পা পিছোল এবার। বিষয়বুদ্ধি চিড়িক চিড়িক টোকা দিচ্ছে মাথায়। ভেবে নিতে কয়েক মুহূর্তের বেশি সময় লাগল না। বুড়িটার সঙ্গে একটু বেইমানি করা হয়, তা হোক। এ সুযোগ ছাড়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আর এমন কিই-বা বেইমানি? মা যদি সত্যি সত্যি ছেলে নিতে আসে, তাহলে তাকে তার কাছে ফিরিয়ে দেওয়াই তো ধর্মের কাজ। ছেলেটাও কবে থেকে পথ চেয়ে বসে আছে। তবু মা যে অন্যায়টা করেছে তার মাশুল দেবে না? মূল্য ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না দুনিয়ায়। অংশুপতি গলার সঙ্গে বিবেকটাকেও ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিল,

—বলতে পারি, তার বদলে কিছু টাকা দিতে হবে।

প্রস্তাবটার জন্য আদৌ তৈরি ছিল না নয়নতারা। হুট করে তাই জবাব করতে পারল না কোনো। ঘোমটার জন্য মুখের ভাবও তার বোঝা যাচ্ছে না। অংশুপতি আরও ভালো করে গলা ঝাড়ল,

—ভাবো। ভেবে দ্যাখো। আমি ছাড়া এ চত্বরে আর কেউ চেনে না তোমাকে। তোমার নিজের পেটের ছেলেও না। যারা চেনে তাদের কাছে যদি যেতে চাও, যেতে পারো। দ্যাখো গিয়ে গাঁয়ে, তারা যদি তোমায় পুজোআচ্চা করে ছেলে কোলে তুলে দেয়....

অংশুপতি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ঘোমটার দিকে। ঘোমটা? না ফাতনা? নড়ে না, চড়ে না। অংশুপতির চোখ জ্বলজ্বল করছে আশায়। শেষে ফাতনা ডুবল,

—কত দিতে হবে?

অংশুপতি ঢোক গিলল,—পাঁচশো।

—পাঁআআচ শো? নয়নতারার গলা কেঁপে গেল।

—ঠিক আছে। অনন্ত তিনশো দাও...

নয়নতারা মাথা দোলাল। খুব বেশি চিন্তার অবকাশ নেই। আজ সে ছেলে নিয়ে যেতেই এসেছে। এ কটা বছর গুমরে গুমরে মরেছে শুধু। সাহস করে আসতে পারেনি কিছুতেই। শেষে ঘরের মানুষটা ভরসা দিতে.....। ডান হাতে ঘোমটা ধরে অংশুপতির দিকে সোজাসুজি তাকাল,—অত তো কাছে নেই।

—কত আছে?

—কত আর। এই পঞ্চাশ মতন।

—মাত্র? তোমার তো এখন রমরমা গো। অংশুপতি ঠোঁট বাঁকাল,—অত কমে হবে না। ছেলে ফেরত নেবে....পাপ কাজ করাবে আমাকে দিয়ে....

—ঠিক আছে। নয়নতারার মুখ ঘুরল অন্ধ ছেলে দিকে,—দুচার দিন পরে এসে বাকিটা দিয়ে যাব।

—তাহলে তখনই ছেলে নিয়ে যেয়ো। দোকানের সাইনবোর্ডটার দিকে তাকাল অংশুপতি,—মনে রেখো, এখান থেকে ছেলে নিয়ে যেতে হলে ওই তিনশোই শেষ কথা।

নয়নতারা তবু নিথর দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ পর মন্থর পায়ে হাঁটতে লাগল স্টেশনের দিকে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময়ে ছেলের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। উবু হয়ে বসে খানিক আদর করল ছেলেকে। নিচু গলায় বললও কিছু। তারপর আশপাশের লোকের চোখ বাঁচিয়ে পঞ্চাশ টাকার নোটখানা গুঁজে দিল ছেলের ছেঁড়া কাঁথার নিচে।

সাঁঝবেলাতে নাতিকে নিতে এসে হাউমাউ করে উঠল ঠাকুমাবুড়ি,—ওরে ও অংশুপতি....অংশুপতি রে.....দেখে যা কী সব্বোনাশ হয়েছে।

অংশুপতি দোকান থেকে নিতান্ত নিরীহ মুখে নেমে এল,—কী হয়েছে মাসি? চিল্লাচ্ছ কেন?

—চিল্লোব না? এই দ্যাখ কী হয়েছে। শতু বলছে তার মা হারামজাদি আজ নাকি এসছিল! এই দ্যাখ গোটা একটা পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়ে গেছে তাকে।

—তাই নাকি? অংশুপতি আরও অবাক ভাব আনল মুখে—কখন এসেছিল? কই, আমার চোখে তো পড়েনি।

—আমি দেখেছি। আমি। হরু দমকা হাওয়ার মতো চিৎকার করে উঠল চা-দোকান থেকে,—তুমিও তো কতক্ষণ গুজ গুজ করলে তার সঙ্গে।

—তুই চুপ কর তো। অংশুপতি জোরে ধমকে উঠল,—সে কেন শতুর মা হতে যাবে? তাকে তো আমি চিনি। সে হল ওই দালালপুরের মণ্ডলদের নতুন বউ। ওর দাদা ছিল আমার ন্যাংটোবেলার বন্ধু।

—হ্যাঁ গো মাসি। বংশী সায় দিল,—খুব বড়লোকের বউ বলে মনে হল।

—ওমা গো? বুড়ি কপালে তুলল চোখ,—সেই এত বড় টাকাটা দিয়ে গেল শতুকে! কেন দিল!

—কেন আবার। মায়া জেগেছে বোধহয়। তোমার নাতিকে দেখলে কার না মায়া জাগবে! নিখুঁত অভিনয়ে দিব্যি বুড়িকে ভুলিয়ে ফেলল অংশুপতি। ধুলো ছিটোল আর পাঁচটা চোখেও। সঙ্গে সঙ্গে মনে আপসোসও আসছে বড়। তার চোখ এড়িয়ে নয়নতারা কখন চালান করল টাকাটা? শতদলের দিকে চোখ কুঁচকে তাকাল। এত কথার মাঝেও চুপ করে বসে আছে ছেলেটা। একসময় ঠাকুমার কাঁধ আঁকড়ে উঠে দাঁড়াল। অন্ধ চোখ দুটো কষ্টব্যথায় ছলছল করছে কি? নাতিঠাকুমা গাঁয়ের পথে অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে অংশুপতি মনে মনে বলল,—মাপ করে দে বাপধন। মন খারাপ করে থাকিস না। তোর মনের ইচ্ছে আমিই পূরণ করে দেব। সবুর কর। আর দুটো দিন সবুর কর।

হ্যাঁ। সবুর করা। এ পৃথিবীতে সবুর তো করছে সবাই। শতদল যদি করে তার মায়ের অপেক্ষা, অংশুপতি করে টাকার। শতদলের ঠাকুমা যদি পথ চেয়ে থাকে সুখের, তো রেবতী বৈরাগী দিন গুনছে সুন্দরে। অমন যে ন্যালাখ্যাপা আধবুড়ি বেশ্যাটা, সেও দ্যাখো জীবনভর খুঁজে বেড়াল সেই নাগরটাকে। অষ্ট, না বিষ্টু যার নাম। আসবে বলে কথা দিয়েও যে আর ফেরে নি কোনোদিন। এভাবেই জীবনের জন্যে প্রতীক্ষা ফুরোলে তবেই কি মৃত্যু আসে? নাকি মৃত্যুতেই শেষ হয় প্রতীক্ষা? কে জানে! একেবারে শেষ কালে আধপাগলি রাজকুমারী নাকি দেখা পেয়েছিল তার নাগরের। সত্যি

কি পেয়েছিল? ঘটনা যাই হক, গল্পটা কিন্তু মুখে মুখে রটে গেছে অনেকদূর পর্যন্ত। এ স্টেশন থেকে সে স্টেশন। এ গাঁ থেকে সে গাঁ।

হরু বলে,—বুঝলে অংশুদা, আমার এক বন্ধু নিজের চোখে দেখেছে। শম্পানগর ইস্টিশনে দাঁড়িয়ে ছিলে রাজকুমারী। বোধহয় এদিকপানেই আসছিল।

—নারে, এদিকপানে নয়। বংশী চোখ ঘোরায়,—শহরের দিকেই যাওয়ার মন ছিল। তা হল কি, একটা এই ছোকরামতন মানুষ দাঁড়িয়ে ছিল অন্যপারে, রেলিং-এর ধারে। একটু বুঝি রোগামতন গড়ন, বড় বড় চোখ। ইচ্ছেপুরের দিকে না কোথায় থাকে। তাকেই দেখে মেয়েছেলেটা...

—ছোকরা মতো....? অংশুপতি বারবার জিজ্ঞাসা করা প্রশ্নটা আবারও ছোঁড়ে ছেলেগুলোর দিকে। হিসেবটা মেলাতে পারে না কিছুতেই। ছোকরাই যদি হয় তবে সে আধবুড়িটার নাগর হয় কি করে?

—ওই তো হল কথা। হরু মাথা নাড়ে,—এই না হলে বলে পাগলের বেরেন। পাগল বলেই না ছেলের বয়সি ছেলেটাকে জাপটে ধরল অমন করে। সঙ্গে সেকি কান ফাটানো চিৎকার,—পেয়েছি গো। এতদিনে খুঁজে পেয়েছি।

অংশুপতি বলে,—শুনলাম ছেলেটা নাকি ছাড়িয়েও নিয়েছিল নিজেকে?

নিত্য ফোড়ন কাটে,—সে তো খানিক ধস্তাধস্তির পরে গো। প্রথমটা সেও তো ঘাবড়ে মাবড়ে একশা। বলে,—করো কী মাসি? করো কী? রাজকুমারীর রং কাদা সবই নাকি তার গায়ে তখন ল্যাবড়ালেবড়ি।

—এ হে হে!

—এহেই বটে। ছেলেটা তো নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে লাইন টপকে ওপার চলে গেছে, রাজকুমারীও তাকে তাড়া করতে করতে একেবারে রেললাইনের মধ্যিখানে।

—কিসে কাটা পড়ল? আপে? না ডাউনে?

—আপেই বুঝি।

—না, না, ডাউনের গাড়ি ছিল।

অংশুপতি মুখটাকে করুণ করে,—মেয়েমানুষটা বড় মজা দিত গো এসে। রুটিটা গুড়টা চাইত। বলতে বলতে হয়তো-বা কোনো খদ্দেরের

কাছ থেকে পয়সা নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সন্ধের মুখে এখন রোজই একবার করে শোকসভা বসছে রাজকুমারীর জন্য। অংশুপতির আমকাঠের তক্তাটাতে এসে জড়ো হয় সকলে। টাটকা টাটকা মারা গেলে মানুষ তাকে স্মরণ করবে না দুটো দিন? টাটকাই তো। সেই যে সেদিন নয়নতারা এল, তার পরের পরের দিনই তো মরল রাজকুমারী। তারপর আর কটা দিনই বা গেছে! শুক্কুরটা বাদ দিলে শনি রবি সোম তিনদিন। সভা করতে করতে অংশুপতি মাঝে মাঝে ভাঙা সিঁড়িটার দিকে তাকিয়ে বড় শ্বাস ফেলে। কদিন ধরে শতদলটাও আর আসছে না। সেই যে সেদিন কানে কানে কী বলে গেলে নয়নতারা, তারপর থেকে ছেলের ধুম জ্বর। কালকে দালালপুরের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল রেবতী বৈরাগী। বৈরাগীকে এখন একটু আধটু এড়িয়েই চলছে অংশুপতি। যে যাই বলুক, লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে মিথ্যে বলতে পারা কঠিন।

পাঁচজনের পাঁচ কথার মাঝেও অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে অংশুপতি। নয়নতারা পরদিনই সন্ধের সময় এসেছিল আবার। গোপনে। ওই পিপুল গাছতলায়।

—দু'শো এনেছি ঠাকুরপো। বাকিটা সামনে হপ্তায় দেব।

এদিক ওদিক দেখে নিয়ে অংশুপতি ট্যাঁকে গুঁজেছে সেই টাকা। ছেলের জ্বরের খবরটা সেদিন বলেনি নয়নতারাকে। ইচ্ছে করেই বলেনি। বললে আবার কী অনর্থ হয়! অংশুপতি ভেবে পায় না যাকে ফেলে চলে যেতে একদিন বুক কাঁপেনি একটুও, তাকেই আবার ফিরে পেতে কেন এমন উতলা হয় মানুষ! মানুষের মন কখন যে কোন বাগে যায়!

অংশুপতি দোকান ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। নিজের মনটাও কদিন ধরে কেমন যেন তালবেতাল দুলতে শুরু করেছে। কিছুতেই বাগে রাখা যাচ্ছে না। কোমর চেপে অংশুপতি আড় ভাঙল শরীরের। দেখাদেখি হরুও উঠে দাঁড়িয়েছে,

—আরে অংশুদা, আজ এত তাড়াতাড়ি ঝাঁপ নামাচ্ছ?

—ভাল্লাগছে না। অংশুপতি হাই তুলল বড় করে,—গা'টা কেমন ম্যাজম্যাজ করছে।

—বুঝেছি। এখন বুঝি লাইনের ধারে যাবে?

অংশুপতি জবাব দিল না। কাজের ছোঁড়াটাকে দোকান বন্ধ করতে বলে এগোতে থাকল পায়ে পায়ে। গলাটা সত্যিই সুড়সুড় করতে শুরু করেছে। প্রায় তিনদিন হল একদম গলা ভেজানো হয়নি। কেন যে হয়নি!

গভীর রাতে টইটুম্বুর মাতাল অংশুপতির গলা শোনা গেল মেঠো রাস্তায়। চুরচুর হয়ে ঘরে ফিরছে। যেতে যেতে রেবতী বৈরাগীর দুয়োর ধারে দাঁড়াল কয়েক মুহূর্ত। আধবোজা চোখে তাকাল অন্ধকার কুঁড়েটার দিকে। বৈরাগী ঠাকুরের সঙ্গে দুটো কথা বলার দরকার। টলমল পা আবার এগোল। শতদলদের বেড়ার ধারে পৌঁছেও কী ভেবে দাঁড়িয়ে গেল চুপচাপ। মাটির দাওয়া থেকে বৈরাগী ঠাকুরের গলা ভেসে আসছে। সেই গলার সঙ্গে তাল রেখে সরসর শব্দ তুলছে খেজুর পাতা। অন্ধকার বহে যাচ্ছে স্রোতের মতো। একটু ঝুঁকে অংশুপতি উঁকি দিল ভেতরে। তালপাতার চাটাই এর ওপর শুয়ে আছে অভাগা ছেলেটা। মাথার ধারে রেবতী বৈরাগী। পায়ের কাছে বুড়ি ঠাকুমা। টিমটিম এক টেমি জ্বলছে তিনজনার মাঝখানে। ক্ষীণ আলোতে তিনজনই কেমন ছায়া ছায়া।

অংশুপতি দুহাতে চোখ ঘসল। নয়নহীন ছেলে জ্বরে বেহুঁশ। এই বেলা কথাটা সেরে ফেলা যায়। গলা খাঁকারি দিল জোরে।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে তাকিয়েছে বৈরাগী,—কে? কে ওখানে?

অংশুপতি পা বাড়াতে গিয়ে মাড়িয়ে ফেলল একখানা শুকনো পাতার স্তূপ। মচমচ শব্দ উঠল,—আমি। আমি বটে। অংশুপতি।

—আরে, আরে, ভেতরে এস।

—নাহ্। ঘরে ফিরছি। তুমি এট্টু বাইরে এসো দেখি।

বৈরাগী উঠে বেড়ার ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। খানিক তফাতে অংশুপতি। মাঝখানে চাকা চাকা আঁধার। অংশুপতির মাতাল হাত সেই অন্ধকার সরানোর চেষ্টা করল প্রাণপণে।

—সেদিন শতুর মা এসেছিল আমার কাছে।

—আস্তে। আস্তে বলো। বৈরাগী নিজেই অন্ধকার ভাঙল,—ওরা শুনতে পাবে।

—পাক গে। তাতে আমার কী?

—তোমাকে বলতে হবে না। বৈরাগী মাথা দোলাল,—আমি সব খবর রাখি। নয়ন বউঠানের সঙ্গে আমার পেরায়ই দেখা হয়।

—তাহলে? অংশুপতির গলা চড়ল সামান্য,—তাহলে ছেলেটাকে মিছে কথা বলো কেন? পদ্ম হয়ে ফুটে আছে... পাখি হয়ে গাছে আছে... গাছে দোলে... দোল দোল... বলতে বলতে টলে প্রায় পড়ে যাচ্ছে, বৈরাগী তাড়াতাড়ি ধরে ফেলেছে তাকে। নরম চোখে হাসছে,

—ছেলেটাকে মেরে ফেলতে চাও অংশুভাই?

—কেন? মরার কী আছে? মায়ের ছেলে মায়ের কাছে যাবে...

—স্বপ্ন চলে গেলে ছেলেটার আর রইল কী? বৈরাগী একদম নীচু গলায় ফিসফিস করে উঠল, —স্বপ্ন নিয়ে যে ক'দিন বাঁচে মানুষ, সে-কদিনই তো সত্যিকারের বেঁচে থাকা গো।

কথাটা গিয়ে কোথায় যেন ধাক্কা মারছে। নেশা ছুটে যাচ্ছে অংশুপতির। বৈরাগীর হাত ছাড়িয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করল। অন্ধকার ডিঙিয়ে হাঁটছে থপথপ। কথাটা মন্দ বলেনি বৈরাগী। থাক তবে। নয়নতারাও অপেক্ষায় থাক। ছেলের মতো। ছেলের স্বপ্নের মতো। টাকাটা তাকে ফিরিয়ে দিলেই হবে।

সাপুইদের পুকুরপাড় অব্দি গিয়ে ধপ করে বসে পড়ল পাঁড় মাতাল মানুষটা। জলের গায়ে ওটা কার মুখ? রাজকুমারীর না? ভেসে উঠছে। মিলিয়ে যাচ্ছে। কাল কী হবে কে জানে, তবে এখন হঠাৎ গান আসছে অংশুপতির বুকে। আশ্চর্য! ঘাসের ওপর থেবড়ে বসে মানুষটা হেঁড়ে গলায় গান ধরেছে,

বুকের গাঙে আসছে তুফান...

গাইতে গাইতে হু হু করে জল নেমেছে ঘোর বিষয়ীর ঘোলাটে চোখ বেয়ে।

আকাশ থেকে জলের বুকে ঝুঁকে পড়ে রাতের তারাগুলো তখন মন দিয়ে শুনছে সেই গান।
